সায়েন্স ফিকশন সমগ্র।৩

হুমায়ূন আহমেদ

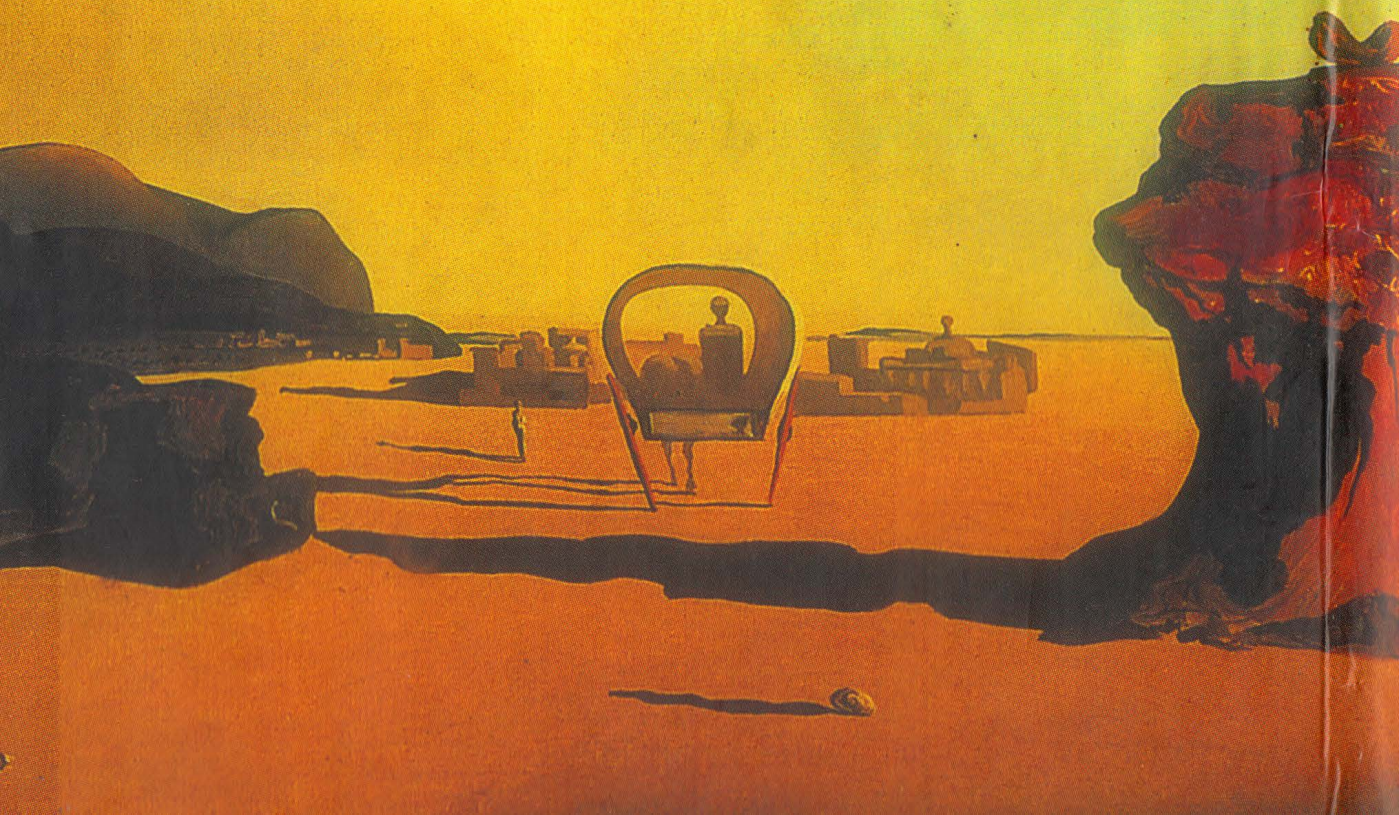

সায়েন্স ফিকশন সমগ্র | ৩ • হুমায়ূন আহমেদ

প্রতিশ্রুতি

প্রচ্ছদের পেইন্টিং । দ্য মোমেন্ট অব ট্রানজিশন । সালভাদর দালি

- ওমেগা পয়েন্ট
- ইমা
- দ্বিতীয় মানব
- অঁহক
- জাদুকর
- কুদ্দুসের একদিন
- সম্পর্ক

ছবি ■ নাসির আলী মামুন

বাংলা কথাসাহিত্যাঙ্গনে একজন প্রবাদ পুরুষ। সববয়েসী পাঠকের নিকট তাঁর সমান জনপ্রিয়তা। এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপক। হঠাৎ অধ্যাপনা ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ; নির্মাণ করেন একাধিক দর্শকনন্দিত চলচ্চিত্র। সেই সাথে নির্মাণ করেন জনপ্রিয় টিভিনাটক।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। দেশে ও দেশের বাইরে তাঁকে নিয়ে সীমাহীন আগ্রহ।

বাংলা সায়েন্স ফিকশন রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান একটা কৌণিক দূরত্বে। বিজ্ঞান আর মানবিকতা– দুটোকে একই পাদপ্রদীপের আলোকে তিনি আলোকিত করেন যা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; পাঠকের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চান বিজ্ঞানের রহস্যময়তা আর তাঁর বিজ্ঞানদর্শন।

সায়েন্স ফিকশন সমগ্র-৩

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতিভা

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

বর্ণ বিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটারস

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : দুইশত টাকা

SCIENCE FICTION SAMAGRA-3 by Humayun Ahmed. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication February 2005.

Website : www.oitijjhya.com

Price : 200.00 US $ 8.00

ISBN 984-776-353-4

প্র কা শ কে র ক থা

'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ' ছিলো একটি রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ; রাতের ট্রেনে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে যেতে গল্পটি পরপর তিন তিনবার পড়ে ফেলেন তিনি—যা তাঁকে একই সাথে করে তুলেছিলো বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ। সেই থেকে নেশার শুরু ; যা এখনো সজীব অটুট। এখনো তাঁর প্রিয়পাঠতালিকার গোড়াতেই আছে সায়েন্স ফিকশন। উনিশ শ পঁয়ষট্টি সাল থেকে সায়েন্স ফিকশনের প্রতি তাঁর সেই যে ভালোবাসা তা এখনো তীব্র গাঢ় প্রবহমান।

বাংলা সায়েন্স ফিকশন রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান একটা কৌণিক দূরত্বে। তত্ত্বীয় বিজ্ঞান যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে আনতে পারেন কিন্তু এটাকেই প্রধান করে তোলেন না ; তথ্য থাকে কিন্তু কোনো তত্ত্বকে মেনে সাহিত্য করেন না। বিজ্ঞান—পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান হলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের একটি চিত্র তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেন যা সায়েন্স ফিকশনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও বিজ্ঞান কোনো মানবিক গুণাবলির ধার ধারে না ; তাঁর সায়েন্স ফিকশনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রধান দিকটি মানবিকতা। তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত কিন্তু প্রথম সায়েন্স ফিকশন 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' থেকে সর্বশেষ সায়েন্স ফিকশনের মধ্যেও এই মানবিকবোধ প্রখরভাবে প্রতীয় ও প্রত্যয়দীপ্ত। বিজ্ঞান ও মানবিকতা—দুটোকে তিনি এমন একটি জায়গায় এনে সম্মিলিত করেন যা তাঁর পাঠককে কৌতূহলোদ্দীপক ও আবেগাপ্লুত করে। সায়েন্স ফিকশন লেখালেখির মাধ্যমে কোনো পাঠকের মনে যদি বিজ্ঞানের রহস্যময়তার কোনো ছবি আঁকতে পারেন তাতেই তিনি ধন্য। কারো কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু হুমায়ূন আহমেদের চাইবার নেই। *সায়েন্স ফিকশন সমগ্র*-৩ এর প্রকাশ লগ্নে তাঁর চাওয়ার সাথে আমাদের ঐক্যটা প্রবহমান থাকুক।

আরিফুর রহমান নাইম
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

সূচিপত্র

ওমেগা পয়েন্ট	১১
ইমা	১১৭
দ্বিতীয় মানব	২০১
অঁহক	২৫৫
জাদুকর	২৬৫
কুন্দুসের একদিন	২৭৩
সম্পর্ক	২৮৯

ওমেগা পয়েন্ট

ইয়াসিন সাহেব বারান্দায় অজু করতে এসে দেখেন শশা-মাচার নিচে লাল শাড়ি পরা বউ মত কে যেন ঘুরঘুর করছে। শশা-মাচা তো বেড়ানোর জায়গা না। কে ওখানে ? শশা তুলছে নাকি ? তাই তো, শশাই তো তুলছে। কোঁচড়ভর্তি শশা। সূর্য ডোবার পর ফলবতী গাছের ফল ছেঁড়া যায় না—এই সত্যটা কি লাল শাড়ি পরা মেয়েটা জানে না। ইয়াসিন সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। একবার ভাবলেন অজু বন্ধ রেখে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসেন ব্যাপারটা কী ? কিন্তু এটা ঠিক না। গুরুতর কোন ঘটনা না ঘটলে নামাজ ছেড়ে যেমন ওঠা যায় না, তেমনি অজু ছেড়েও ওঠা যায় না। লাল শাড়ি পরা মেয়ের শশা তোলা কোন গুরুতর ঘটনা না।

তিনি অজু শেষ করে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ঘরে পালংকের মাথায় ভাঁজ করা জায়নামাজ থাকে, সেই জায়নামাজ নিয়ে মসজিদে যাবেন। যদিও আজ আলসি লাগছে। মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামাজ পড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে। সমস্যা হয়েছে মসজিদটা তিনি নিজে দিয়েছেন। পাকা মসজিদ। মুসুল্লিদের অজুর জন্যে চাপকল, একটা সেনিটারি লেট্রিন সবই করা হয়েছে। আজানের মিনার ছাড়া মসজিদের যাবতীয় কাজ শেষ। এই মাসের আট তারিখ থেকে উলা পাস একজন মাওলানাও রাখা হয়েছে। রোজা আসছে খতমে তারাবি পড়ানোর মানুষ দরকার। মাওলানার থাকা-খাওয়া এবং মাসিক পাঁচশ সত্তুর টাকা বেতনও তিনিই দিচ্ছেন। সেই মানুষ যদি নিজের মসজিদে নামাজ না পড়ে তাহলে অন্যরা কেন নামাজ পড়বে ?

ইয়াসিন সাহেব জায়নামাজ হাতে নিলেন। বিরক্ত গলায় ডাকলেন, শেফার মা কই ? এদিকে শুনে যাও।

আমেনা বেগম স্বামীর গলা শুনে ছুটে এলেন। এ বাড়ির সবাই ইয়াসিন সাহেবকে যমের মত ভয় করে। আমেনা বেগম তার ব্যতিক্রম না।

ইয়াসিন সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—শশা-মাচার নিচে কাকে যেন দেখলাম, লাল শাড়ি পরা। মেয়েটা কে ?

আমেনা বেগম ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, নিজের মেয়েরে চিনেন না ? শেফা।

'লাল শাড়ি পরেছে কেন ?'

'শখ করে পরেছে। এই শাড়ি তো ঢাকা থেকে আপনিই এনে দিয়েছেন।'

'সন্ধ্যাবেলা শশা তুলতেছে। এটা কেমন কথা ? সন্ধ্যাকালে নামাজ আদায় করবে তারপর বই নিয়ে বসবে। মেট্রিক পরীক্ষার দুইমাসও বাকি নাই। আমি মসজিদ থেকে এসে যেন দেখি সে বই নিয়ে বসেছে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তার মাস্টার কই, রফিক ? তাকে তো দেখি না। জুম্মাবার ছাড়া কোনদিন তাকে মসজিদেও দেখলাম না। তাকে বলে দিবে—আমার বাড়িতে যারা যারা জায়গির থাকে তাদের প্রত্যেকের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হবে না। তুমি দেখ রফিক ঘরে আছে কিনা। আমি নিজেই আজ তারে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাব।'

আমেনা বেগম বললেন, রফিক ঘরে নাই।

'গেছে কোথায় ?'

'ময়মনসিংহ গিয়েছে। সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসবে।'

'ময়মনসিংহ গেল কখন ?'

'আজ সকালে গিয়েছে।'

'আমি কিছু জানলাম না কেন ? শেফার মা শোন আমার এই বাড়িতে যারা থাকে তাদের সবার সব বিষয় আমাকে জানাবে। কোন কিছু গোপন রাখবে না।'

'নামাজের সময় পার হইয়া যাইতেছে। আপনে মসজিদে যান।'

ইয়াসিন সাহেব বিরক্ত মুখে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। মসজিদের জন্যে যে মাওলানা রাখা হয়েছে তাকে তাঁর একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। পছন্দ না হওয়ার প্রধান কারণ মাওলানা নামাজের সময় বেছে বেছে সবচে' লম্বা সুরাগুলি বের করে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে খিল ধরে যায় তারপরেও সুরা শেষ হয় না। দোয়ার সময় হাত যে তোলে সেই হাত আর নামায় না—দোয়া কিছুক্ষণ চলে উর্দুতে, কিছুক্ষণ আরবিতে তারপর শুরু হয় বাংলায়। বাংলা দোয়ার একপর্যায়ে 'আমরা বড়ই গুনাহগার আমরা বড়ই গুনাহগার' বলতে বলতে হাউমাউ করে কান্নাকাটিও শুরু হয়।

ইয়াসিন সাহেবের ধারণা মাওলানা মিথ্যা কথাও বলেন। চাকরি পাওয়ার চার দিনের দিন মাওলানা তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আজ শেষরাতে ফজরের নামাজের আজানের ঠিক আগে আপনাকে নিয়ে একটা খোয়াব দেখেছি। খোয়াবে দেখলাম আরব দেশের লেবাস পরা একজনকে—সফেদ দাড়ি, একটা শাদা চাদর এক প্যাঁচ দিয়ে পরা। চোখে সুর্মা। আমি উনাকে চিনলাম না। উনি আমাকে বললেন—তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি যার আশ্রয়ে আছ সে নেকবান, তাঁর অন্তরে আছে আসল নুরানি। এই নুরানির কারণে সে নিজ খরচায় মসজিদ দিয়েছে। এখন তোমার দায়িত্ব এই মানুষটার পাশে পাশে থাকা। তার দেখভাল করা। মসজিদের দায়িত্ব পালনের চেয়ে এই মানুষটার দেখভাল তোমার জন্যে অতি জরুরি। এই বলে তিনি

আমার ডান হাতের বুড়া আঙুলে আতর লাগায়ে দিলেন। তারপরেই আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

ইয়াসিন সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ও।

মাওলানা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আল্লাহপাকের কি কুদরতি সেই আতরের গন্ধ এখনো আঙুলে আছে। একটু শুঁকে দেখেন।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, শুঁকে লাভ নেই। আমার সর্দি—গন্ধ পাই না।

'খোয়াবটা দেখার পরে বড়ই অবাক হয়েছি।'

ইয়াসিন সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন— অবাক হওয়ারই কথা। আরব দেশের মানুষকে স্বপ্নে দেখলেন—সে কথা বলতেছে বাংলায়। যাই হোক স্বপ্ন বেশি না দেখা ভাল। স্বপ্ন কম দেখবেন।

'আপনে বোধহয় আমার খোয়াবের ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না।'

ইয়াসিন সাহেব বললেন—করেছি। বিশ্বাস করব না কেন ? আপনি এত বড় মাওলানা, আপনে তো আর মিথ্যা কথা বলবেন না। আজানের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙেছে, এটা শুনে অবাক হয়েছি। কারণ আজান তো দেন আপনি।

'আজানের শব্দটাও খোয়াবে শুনেছি।'

'ও।'

'যাকে স্বপ্ন দেখেছি তার পরিচয় দিলে আপনে চমকে উঠবেন।'

'তাহলে পরিচয় না দেওয়াই ভাল। এই বয়সে ঘনঘন চমকানো ভাল না। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।'

ইয়াসিন সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। টাকাপয়সা খরচ করে মসজিদের জন্যে ইমাম রাখা হল। সে চোখের পাতি না ফেলে মিথ্যা কথা বলে। তিনি ধর্মকর্মের জন্যে মসজিদ দেন নাই। মসজিদ দিয়েছেন আগামী ইলেকশনের কথা চিন্তা করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি দুই পার্টিতে দেন-দরবার শুরু করেছেন। একজন কেউ নমিনেশন দিলেই হল। না দিলে স্বতন্ত্র দাঁড়াবেন। তার মত ফালতু যে মানুষ তার বিষয়ে স্বপ্নে কথা বলল সফেদ পোশাকের লোক ? স্বপ্নে আবার আতরও মাখিয়ে দিল ? আতরের গন্ধ স্বপ্ন শেষ হবার পরেও যায় নাই। এখনো বুড়ো আঙুলে লেগে আছে। মিথ্যা কথারও তো সীমা থাকা দরকার। একে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় করতে হবে। যার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয় তার প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে নামাজ হবার কথা না।

ইয়াসিন সাহেব মাগরেবের নামাজে দাঁড়া হয়েছেন। তিন রাকাত নামাজ দেখতে দেখতে শেষ হবার কথা। অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে—এই মাওলানা

কতক্ষণ লাগাবে কে জানে ? ইয়াসিন সাহেবের মন এখন বিক্ষিপ্ত। নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন সব কথাবার্তা মনে আসতে শুরু করেছে। যেমন—রফিক ময়মনসিংহ গিয়েছে, সে ময়মনসিংহ যাবে জানলে তিনি দু'টা ইলিশ মাছ আনার টাকা দিয়ে দিতেন। গ্রাম-গঞ্জের বাজারে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহ ছাড়া গতি নেই। এই বছর ইলিশ মাছ খাওয়াই হয় নাই। নতুন সরিষা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোলের কাছে জগতের কোন খাদ্যই খাদ্য না। বেহেশতের খানা-খাদ্যের মধ্যে পক্ষীর মাংসের কথা উল্লেখ আছে, ইলিশ মাছের ঝোলের কথার উল্লেখ আছে কিনা মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মাওলানা যে রকম মিথ্যাবাদী লোক না থাকলেও হয়ত বলবে আছে। তাকে খুশি করার জন্যে বলবে।

ইয়াসিন সাহেবের মনে হল নামাজে দাঁড়িয়ে তিনি সোয়াবের পরিবর্তে পাপ করে যাচ্ছেন। যতই সময় যাচ্ছে ততই পাপ বাড়ছে। তিনি আল্লাহপাক বা বেহেশত-দোজখের কথা চিন্তা না করে চিন্তা করছেন অতি তুচ্ছ ইলিশ মাছের কথা। ইয়াসিন সাহেব মাথা থেকে দুষ্ট চিন্তা দূর করার চেষ্টা করলেন—চিন্তাটা আরো খারাপ দিকে চলে গেল। মাথায় ঘুরতে লাগল যাত্রাপার্টির কথা। গ্রামের মানুষজন যাত্রা দেখলে খুশি হয়। এই শীতে যাত্রার আয়োজন করলে দল বেঁধে সবাই যাত্রা দেখতে আসবে। তিনিও সবার সঙ্গে যাত্রা দেখবেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। মাঝরাতে চায়ের ব্যবস্থা থাকল। সবাই এককাপ করে চা খেল। কত আর খরচ হবে। লাভ হবে তিন ডাবল। হিন্দু-ভোট হয়ত কিছু পাওয়া যাবে। গতবার ইলেকশনে হেরেছেন হিন্দু-ভোট না পাওয়ার কারণে। মসজিদ দেবার কারণে হিন্দু-ভোট আরো কমে যাবে কিনা কে জানে।

রাতে খেতে বসে ইয়াসিন সাহেব চমৎকৃত হলেন। ইলিশ মাছের ভাজা এবং ঝোল। সাধারণ কোন ঝোল না, সরিষার ঝোল। বাটি থেকেই সরিষার ঝাঁঝ নাকে এসে লাগছে। ইয়াসিন সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন—শেফার মা, ইলিশ মাছ, ব্যাপার কি ?

'রফিক এনেছে।'

'নিজ থেকে এনেছে নাকি তুমি আনতে বলেছিলে ?'

'নিজ থেকে এনেছে। একজোড়া মাছ নিয়ে এসেছে।'

'মাছের দাম দিয়া দিবা।'

জ্বি আচ্ছা।'

'তারে ডাক দাও। কথা বলব। আচ্ছা থাক, এখন না। মাছটা ভাল হয়েছে। ঝাল কিঞ্চিৎ বেশি হয়েছে—তার জন্যে স্বাদের কোন কমতি হয় নাই।'

'আরেক টুকরা মাছ নেন।'

ইয়াসিন সাহেব আরেকটা মাছ নিলেন। আলাদা করে পিরিচে ইলিশ মাছের দু'টা মাথা রাখা হয়েছে। ইয়াসিন সাহেবের হিসাবে এই জগতে যত সুখাদ্য আছে ইলিশ মাছের মাথা তার মধ্যে একটি। বেশির-ভাগ মানুষ এই তথ্য জানে না।

'শেফা খেয়েছে?'

'না।'

'একটা মাথা শেফার জন্যে রেখে দাও।'

'আপনে খান। শেফা মাছের মাথা খেতে পারে না।'

'খাওয়া শিখতে হবে না। সব কিছু শিখতে হয়। খাওয়া শিখতে হয়। না খেলে খাওয়া শিখবে কিভাবে?'

আমেনা বেগম বললেন, মেয়েমানুষের অত খাওয়া শিখার দরকার নাই। মেয়েমানুষ যত কম খাওয়া শিখে তত ভাল। কার না কার ঘরে যেতে হয়।

ইয়াসিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন—বাপ-মায়ের সঙ্গে যতদিন আছে ততদিন খাওয়া-খাদ্য যেন ঠিক মত খায় এটা দেখা বাবা-মায়ের কর্তব্য। মেয়েকে ডাক, ইলিশ মাছের মাথাটা আমার সামনে খেতে বল।

'সে খাবে না।'

'খাবে না আবার কি? অবশ্যই খাবে। ডাক দাও দেখি।'

আমেনা বেগম মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন—পড়তে বসেছে। পড়া থেকে উঠানো ঠিক না। এম্নিতেই পড়তে চায় না। আর আপনে আমার একটা কথা রাখেন, এই মাথাটাও খান। আমি শেফারে ইলিশ মাছের মাথা এনে খাওয়াব।

ইয়াসিন সাহেব দ্বিতীয় মাথাটাও পাতে উঠিয়ে নিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর পান খাওয়া এবং পান খেতে খেতে হুক্কায় টান দেয়া ইয়াসিন সাহেবের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এই সময় তাঁর পায়ের কাছে ফজলু বসে থাকে। সে পায়ে ইলিবিলি কেটে দেয়। ইয়াসিন সাহেবের তখন তন্দ্রা-তন্দ্রা ভাব হয়। তিনি এই ঘোর ঘোর অবস্থায় তাঁর কাছে দেন-দরবার নিয়ে আসা লোকজনের কথাবার্তা শোনেন। এর একটা ভাল দিক হচ্ছে কারো কোন কথাই মন দিয়ে শুনতে হয় না। মন দিয়ে মানুষের কথা শুনার মত কষ্টকর কিছু এই দুনিয়াতে নেই।

আজ রাতে তিনি শুনছেন রফিকের কথা। তবে রফিক নিজ থেকে কথা বলতে আসে নি। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। দু'দিন পর পর সে হুট করে ময়মনসিংহ যায়, ঢাকা যায়, এটা ঠিক না। শেফার মেট্রিক পরীক্ষার বেশি বাকি নাই। এই সময় তার সার্বক্ষণিক থাকা দরকার। মেয়ে যদি মনোযোগী ছাত্রী হত তাহলে কোন কথা ছিল না। মেয়ের পড়াশোনার প্রতি কোন মনোযোগই নাই।

'রফিক শুনলাম ময়মনসিংহ গিয়েছিলে ব্যাপার কি ?'

'চশমার দোকানে গিয়েছিলাম।'

'চোখ খারাপ হয়েছে ?'

'জ্বি না। দু'টা লেন্স কিনলাম, আগে একবার গিয়ে অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম, এরা ঢাকা থেকে আনায়ে দিয়েছে।'

'জিনিসটা কি বললে ?'

'লেন্স। চশমার কাচ।'

'করবা কি ?'

'একটা টেলিস্কোপ বানাব। দুরবিন। দূরের জিনিস কাছে দেখার যন্ত্র।'

'দূরের জিনিস কি দেখবা ?'

'তারা দেখা যাবে, চাঁদ দেখা যাবে। খুব কাছে দেখা যাবে।'

'কাছে দেখা যাবার প্রয়োজনটা কি ?'

রফিক চুপ করে গেল। ইয়াসিন সাহেব ঘুম-ঘুম গলায় বললেন, বাজে কাজে সময় নষ্ট করবা না। আমি লক্ষ করেছি তুমি বাজে কাজে বেশি সময় নষ্ট কর। সময়ের দাম আছে বুঝলে ?

'জ্বি চাচা।'

'টেলিস্কোপ জিনিসটা কিভাবে বানায় ?'

'বুঝায়ে বলব ?'

'যে ভাবেই বল, আমি বুঝব না। তারপরেও বলতে চাইলে বল শুনি।'

'দু'টা লেন্স দিয়ে টেলিস্কোপ বানাতে হয়। একটা হল অবজেকটিভ। চাঁদের আলো এই লেন্সের উপর পড়বে। তার ইমেজ তৈরি হবে লেন্সের ফোকাল লেংথে। সেই ইমেজটা যে জায়গায় পড়বে সেটা হবে দ্বিতীয় লেন্সটার ফোকাল প্লেন। প্রথম লেন্সটার ফোকাল লেংথ হতে হবে বেশি। দ্বিতীয় লেন্সের ফোকাল লেংথ হতে হবে অনেক কম। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল টেলিস্কোপ। অবজেকটিভের ফোকাল লেংথ কত বেশি তার উপর নির্ভর করবে জিনিসটা কত কাছে দেখা যাবে। আমি যে টেলিস্কোপটা তৈরি করব সেটা দিয়ে ইনশাল্লাহ শনিগ্রহ দেখা যাবে।'

'কি দেখা যাবে ?'

'শনিগ্রহ। শনির বলয়।'

'শনিগ্রহ দেখা ঠিক না। শনি থেকে যত দূরে থাকা যায় তত ভাল। বুঝলে তো ?'

'জ্বি।'

'তোমার যন্ত্রটা তৈরি হবে কখন ?'

'যন্ত্র প্রায় তৈরি। কাঠের চোঙের মধ্যে দু'টা লেন্স শুধু ফিট করা। আর ঘণ্টা খানিক লাগবে। ধরেন আজ রাত দু'টা নাগাদ চাঁদ দেখতে পারব।'

'আজ পূর্ণিমা না ?'

'জ্বি পূর্ণিমা। টেলিস্কোপটা তৈরি হলে কি চাচা আপনাকে ডাক দিব ?'

'আমাকে ডাকাডাকি করার কোন দরকার নাই। আমার সমস্যা আছে। রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম হয় না। ঠিক আছে এখন যাও। আর শোন বাজে কাজে সময় নষ্ট করবা না। চশমার কাচ দু'টা যে কিনলা কত দাম পড়ল ?'

'এগারোশ' টাকা নিয়েছে।'

'এগারোশ' টাকা একেবারে যে পানির মধ্যে পড়েছে এটা বুঝতে পেরেছ ? চাঁদ কাছে এনে দেখার কোন দরকার নাই। কাছে আনলেই যে জিনিস ভাল দেখা যায় তা না। আল্লাহপাক যে জিনিসরে যেখানে রেখেছেন সেখানেই তারে ভাল লাগে। আল্লাহপাক যদি ভাবতেন চাঁদকে কাছে আনলে ভাল দেখা যাবে তাহলে তিনি হাতের কাছে চাঁদ এনে দিতেন। হাত দিয়া চাঁদরে দেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি কি সেটা দিয়েছেন ?'

'জ্বি না।'

'আচ্ছা যাও। টাকাপয়সা বাজে খরচ করবা না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। এইটা মনে রাখবা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করতেছে ?'

'জ্বি ভাল।'

'মোটেই ভাল না। পড়াশোনার দিকে তার মন নাই। তার মন সাজনে। গতমাসে ঢাকায় যাব সে আমার হাতে কি কি আনতে হবে তার লিস্ট ধরায়ে দিয়েছে। লিস্টে আছে লিপস্টিক, পাউডার এইসব হাবিজাবি। তোমাকে বাড়িতে কি কারণে রেখেছি সেটা মনে রাখবা। মেয়েমানুষ একবার মেট্রিক ফেল করলে আর পাস করতে পারে না। সে যেন এক চান্সে পাস করে এটা দেখতে হবে। শুধু চাঁদ দেখলে হবে না। আচ্ছা এখন যাও।'

ফজলু পায়ে ইলিবিলি কাটছে। বাইরের আবহাওয়া মনোরম। কার্তিক মাসের শুরু। অতি আরামদায়ক বাতাস বইছে। চারদিকে প্রবল জোছনা। ইয়াসিন সাহেব হাতে হুক্কার নল নিয়ে গভীর তন্দ্রায় ডুবে গেলেন। মাঝে মাঝে ঘুম কাটলে তিনি দেখতে পান উঠানে রফিক কাঠের টুকরা, হাতুড়ি, করাত নিয়ে কি যেন করছে। সে পাটি পেতে বসেছে। তার পাশে কাঠের চেয়ার। চেয়ারে ছোট্ট বাক্স। ইয়াসিন সাহেব তন্দ্রার মধ্যে ভাবেন—করছে কি ? তারপরেই মনে হয় রফিক চাঁদ দেখার যন্ত্র বানাচ্ছে। তিনি খানিকটা বিরক্ত হন। বিরক্তি নিয়েই হুক্কার নলে দু'তিনটা টান দেন। তারপর আবারো গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হাতুড়ির টুকটাক শব্দে তন্দ্রা কাটে, তিনি ভাবেন—চাঁদের আলোতে বসে রফিক করছেটা কি ? হাতুড়ি, পেরেক, করাতের ঘষাঘষি। হচ্ছেটা কি ?

আমেনা বেগম রাতে শেফার সঙ্গে ঘুমুতে যান। মেয়ে বড় হলে তাকে কখনো একা শুতে দিতে নেই। হয় সে ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে ঘুমুবে নয়তো দাদি নানির সঙ্গে ঘুমুবে। এটাই সাধারণ নিয়ম। শেফার কোন ভাইবোন নেই। দাদি মারা গেছেন। নানি এখানে থাকেন না। কাজেই বাধ্য হয়েই আমেনা বেগমকে মেয়ের সঙ্গে ঘুমুতে হয়। তিনি জানেন কাজটা ঠিক হচ্ছে না। স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রথম, স্বামী দ্বিতীয় এবং স্বামী তৃতীয়...তারপর অন্যরা। সেই স্বামীকে একা ফেলে রেখে মেয়ের সঙ্গে ঘুমুতে আসা খুবই অন্যায়। মানুষটার রাতের বেলা কতকিছুর দরকার হতে পারে—হয়ত একগ্লাস পানি খাবে, ঘুম আসছে না, মাথার যন্ত্রণা—মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া দরকার, মশারির ভেতর মশা ঢুকেছে। কানের কাছে পিনপিন করে বিরক্ত করছে। সেই মশা মারা দরকার। তিনি তার কিছুই করতে পারছে না। এটা ভেবে তার খুবই খারাপ লাগে। আবার ঘুমুতে যাবার আগে আগে মেয়ের সঙ্গে গুটুর-গুটুর করে যে অনেক কথা বলেন সেটা তার খুবই ভাল লাগে। তবে ইদানিং মেয়ের কথাবার্তা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সে ঘুরেফিরে তার স্যারের কথা বলছে। যে মেয়ে বড় হয়েছে তার মুখে ঘনঘন একজন মানুষের কথা আসা খুবই ভয়ের কথা। তিনি এখনো এই বিষয়ে মেয়েকে কিছু বলছেন না। তবে যে-কোন এক রাতে বলবেন। সেটা আজ রাতেও হতে পারে। না আজ রাতে কিছু বলবেন না। আজ মেয়েটার শরীর ভাল না। জ্বর এসেছে। গা গরম। এটা একটা দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে গেল। মেয়েটার অসুখবিসুখ লেগেই আছে। ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কোন ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার।

আমেনা বেগম ঘুমন্ত শেফার গায়ে চাদর দিয়ে দিলেন। শেফা সঙ্গে সঙ্গে সেই চাদর ফেলে দিল। আমেনা বেগম বললেন, তুই জেগে আছিস?

শেফা বলল, হ্যাঁ।

'শরীর বেশি খারাপ লাগছে?'

'না শরীর অল্প খারাপ, মন বেশি খারাপ।'

'মন খারাপ কি জন্যে?'

'রফিক স্যারকে একটা জিনিস ময়মনসিংহ থেকে আনতে বলেছিলাম। আনে নাই।'

'কি জিনিস?'

'রবারের চুড়ি।'

'রবারের আবার চুড়ি হয় নাকি?'

'হয়, রবারের চুড়ি হয়। নতুন বের হয়েছে।'

'তারে তুই চুড়ি আনতে বলছিলি কি জন্যে? সে মাস্টার মানুষ।'

'মাস্টার মানুষ চুড়ি আনতে পারবে না? নাকি আনলে সেটা বিরাট দোষ। জেল-জরিমানা হবে।'

আমেনা বেগম মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—মাথার যন্ত্রণা আছে? টিপে দেই?

শেফা বিছানায় উঠে বসল। আমেনা বেগম বললেন, কি হয়েছে?

শেফা বলল, দেখে আসি।

'কি দেখে আসবি?'

'দুরবিন কতদূর হয়েছে দেখে আসি।'

আমেনা বেগমের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মেয়েটা বলে কি। গভীর রাতে সে কার কাছে যেতে চায়?

শেফা বলল, স্যার বলেছেন দুরবিন তৈরি হয়ে গেলে সেই দুরবিনে প্রথম চাঁদ দেখব আমি।

'তুই প্রথম কেন দেখবি? তোর প্রথম দেখার দরকার কি?'

'সেটা তো মা আমি জানি না। কে প্রথম দেখবে কে দুই নম্বরে দেখবে সেটা আমি ঠিক করি নাই। স্যার ঠিক করেছেন। তুমি উনাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

আমেনা বেগম অবাক হয়ে দেখলেন শেফা তড়তড় করে বিছানা থেকে নামছে। এই মেয়েকে এখন আটকানো যাবেই না। কাজেই এখন যা করতে হবে তা হল—তাকে সঙ্গে যেতে হবে। মেয়ের সঙ্গে মা থাকলে আর কোন দোষ থাকে না। কোন কারণে যদি ইয়াসিন সাহেবের ঘুম ভেঙেও যায় এবং তিনি

জানালা দিয়ে দেখেন গভীর রাতে মা-মেয়ে রফিকের সঙ্গে কথা বলেছে তিনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু তিনি যদি দেখেন মেয়ে একা কথা বলছে—তাহলে বাড়িতে গজব হয়ে যাবে। বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গর্ত করে মেয়েকে জীবন্ত পুঁতেও ফেলতে পারেন।

'স্যার দুরবিন তৈরি হয়েছে?'

'প্রায়।'

'প্রায় কেন, বাকি আছে কি?'

'চোঙটা আরো বড় করতে হবে। বেশি না সামান্য করলেই হবে।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'ধর ঘন্টা খানিক।'

আমেনা বেগম বললেন, এখন রেখে দাও। ঘুমুতে যাও। যা করার সকালে করবে।

রফিক নিচু গলায় বলল, এখন ঘুমাতে গেলে ঘুম আসবে না। মনটা এখানে পড়ে আছে।

শেফা বলল, স্যার আপনার কিছু লাগবে? রফিক বলল, না কিছু লাগবে না।

'এককাপ চা বানায় এনে দিব?'

'না লাগবে না।'

'কোন সাহায্য লাগবে। করাত দিয়ে কাঠ কাটা, কিংবা শিরিষ কাগজ ঘষা। আমি করাত দিয়ে খুব ভাল কাঠ কাটতে পারি। কোন্ কাঠটা কাটতে হবে আপনি দেখায় দেন, আমি চোখের নিমিষে কেটে দেব।'

'কাঠ কাঠতে হবে না। কাটাকাটির কাজ শেষ। এখন শুধু জোড়া দেয়া।'

আমেনা বেগমের বুক ধড়ফড় করছে। মেয়ে এভাবে কথা বলছে কেন? তার গলার স্বর কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়েও আছে রফিকের দিকে। একবারও চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। তিনি মেয়ের হাত ধরে তাকে নিয়ে ঘরে চলে এলেন। ব্যবস্থা নিতে হবে। খুব সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে এমন ব্যবস্থা। রফিককে এ বাড়িতে রাখা যাবে না। অসম্ভব।

শেফা বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমেনা বেগমের ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। সেই ঘুমও ভাল হল না। একটু পর পর ঘুম ভেঙে যায়। যতবার ঘুম ভাঙে তিনি জানালার কাছে যান এবং দেখতে পান রফিক চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। এই ছেলের কি ক্লান্তি বলে কিছু নাই?

শেষবার জানালা থেকে ফিরে বিছানায় উঠতে যাবেন, শেফা বলল, মা স্যার কি এখনো চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন ?

আমেনা বেগম চাপা গলায় বললেন, তুই জানলি কিভাবে ?

'তুমি যেমন একটু পরপর দেখে আসছ আমিও দেখে আসছি। আমি যখন দেখতে যাই তুমি তখন গভীর ঘুমে থাক বলে কিছু বুঝতে পার না।'

আমেনা বেগম লক্ষ করলেন মেয়ে কাঁদছে। কান্নার কোন শব্দ হচ্ছে না, তবে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মেয়ের এই কান্নার ভঙ্গি তার চেনা।

'তুই কাঁদতেছিস কি জন্যে ?'

'স্যার বলেছিল আমি প্রথম দেখব। এখন সে নিজে দেখতেছে। আমার কথা তার মনেই নাই। মা স্যারকে তুমি বলবা সে যেন আমাদের বাড়িতে আর না থাকে, অন্য কোথাও চলে যায়। আমি এই স্যারের কাছে পড়ব না। এই স্যার কেন, আমি কোন স্যারের কাছেই পড়ব না।'

শেফা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমেনা বেগম মনে মনে বলছেন—কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

সর্বনাশ তো বটেই। নাম-পরিচয় নেই এক ছেলে। বড় হয়েছে এতিমখানায়। সেই ছেলের কথা ভেবে তার মেয়ে চোখের পানি ফেলছে। এমন ভয়ংকর কথা তো কাউকে বলাও যাবে না। কেউ জানতে পারলেও সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ছেলেকে এই বাড়িতে থাকতে দেয়াই ভুল হয়েছে। সাধারণ ভুল না, বড় ভুল। মানুষ যখন ছোটখাটো ভুল করে তখন বুঝতে পারে। বড় ভুল করার সময় কিছু বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলে মানুষ বড় ভুল করতে পারত না।

শেফার বাবা যখন বললেন, শেফার জন্যে একটা ভাল ছেলের সন্ধান পেয়েছি। তখন আমেনা বেগম আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, পাত্র কি করে ? এতে শেফার বাবা খুবই রেগে গিয়ে বললেন—পাত্র কি করে মানে ? পাত্রের কথা আসছে কেন ? শেফাকে পড়াবে এমন একজনের কথা বলতেছি। শেফাকে তো মেট্রিক পাস করা লাগবে।

আমেনা বেগম খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন। রফিক প্রথম যেদিন এ বাড়িতে থাকতে এল তখনও লজ্জা পেলেন। ভিন্ন কারণে লজ্জা পেলেন। রফিকের জন্যে দুপুরে ভাত পাঠিয়েছেন। প্রথমদিন সেই হিসেবে খোঁজ নিতে গিয়েছেন।

রফিক মাথা নিচু করে খাচ্ছিল ; আমেনা বেগমকে দেখে মাথা আরো নিচু করে ফেলল। আমেনা বেগম ছেলেটাকে দেখে মুগ্ধ হলেন—সুন্দর চেহারা। বড়

বড় চোখ। চোখ দেখেই মনে হয় খুব বুদ্ধি। আমেনা বেগম বললেন, নিজের বাড়ি মনে করে থাকবা। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে খবর পাঠাবা।

রফিক মাথা আরো নিচু করে বলল, জ্বি আচ্ছা।

জুম্মাবারে অবশ্যই নামাজে যেতে হবে। এই বাড়িতে যারা থাকে তারা যদি জুম্মাবারে নামাজে না যায় তাহলে শেফার বাবা খুব রাগ করে।

রফিক আবারো বলল, জ্বি আচ্ছা।

আমেনা বেগম বললেন, তোমার দেশের বাড়ি কোথায় ?

রফিক বলল, আমি ঠিক জানি না।

আমেনা বেগম বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি জান না মানে কি ? তোমার পিতা-মাতা কোথায় থাকেন ?

'এটাও আমি জানি না। ছোটবেলার কোন স্মৃতি আমার নাই। আমি বড় হয়েছি এতিমখানায়।'

আমেনা বেগম খুবই লজ্জা পেলেন। শেফার বাবা যদি ছেলে প্রসঙ্গে এই কথাগুলি আগে বলে রাখতেন তাহলে তিনি রফিককে এ ধরনের কথা বলে লজ্জা পেতেন না।

ছেলেটার জন্যে সেদিন তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন—তোমার কষ্টের দিন শেষ হয়েছে। এই বাড়িতে তুমি আশ্রয় পেয়েছ এখন তোমার আর চিন্তা নাই। শেফার বাবা অতি বদমেজাজি মানুষ, তবে অতি ভাল মানুষ। সে তোমার একটা না একটা গতি করে দিবে।

আমেনা বেগম প্রথমদিন ছেলেটির প্রতি যে মমতা বোধ করেছিলেন আজও সেই মমতা বোধ করছেন, তবে একই সঙ্গে তাঁর বুক কাঁপছে। তাঁর মন বলছে ভয়ংকর এক সময় তাঁর সামনে। তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছেন। আল্লাহপাক সাহায্য না করলে তিনি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন না।

শেফা আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মায়ের মানসিক যন্ত্রণার কথা মেয়ে কিছুই জানে না। আমেনা বেগম শেফার গায়ে হাত রাখলেন।

শেফা বলল, ছটফট করছ কেন মা। তোমার কি হয়েছে।

ছটফট করতেছি তোরে কে বলেছে ?

'কেউ বলে নাই। বুঝতে পারি। মা, রফিক স্যার কি এখনো উঠানে বসা ?'

'হুঁ।'

'চোখে দুরবিন ?'

'না দুরবিন নাই।'

'কাঠের মূর্তির মত চুপচাপ বসে আছে, ঠিক-না মা ?'

'হুঁ।'

'স্যারের একটা ব্যাপার কি জান মা ? স্যার ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে কি যেন চিন্তা করে।'

'কি চিন্তা করে ?'

'জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না, হাসে। একবার শুধু বলেছিল—হিসাব করে। হিসাব নাকি মিলে না।'

'কি হিসাব করে ?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম মা । কিছু বলে না। স্যারের একটা মস্ত বড় গুণ কি জান মা ? স্যার যে কোন অংক মুখে মুখে করতে পারে। কাগজ-কলম লাগে না।'

'ও।'

'যে-কোন অংক স্যারকে দিয়ে শুধু বলবে, উত্তর কত ? স্যার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বলবে।'

'অংক ভাল জানে বলেই তো তোর বাবা তাকে রেখেছে তোকে পড়াবার জন্যে।'

'অংক ভাল জানা এক কথা আর মুখে মুখে অংক করা আরেক কথা।

'ঘুমাতো, স্যারকে নিয়ে এত কথা বলার দরকার নাই।'

'সান্দিকোনা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব আগামী বুধবার রফিক স্যারকে নিয়ে একটা অংক খেলার আয়োজন করেছেন। খুবই মজার খেলা। খেলাটা কি রকম বলব ?'

'বল।'

'ব্ল্যাকবোর্ডে দশটা অংক লেখা থাকবে। রফিক স্যার অংকগুলি করবেন মুখে মুখে আর বাকি যারা আছে তারা করবে ক্যালকুলেটর দিয়ে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে শুনলাম।'

'মা, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?'

'কি কাজ ?'

'পাকঘরে গিয়ে এককাপ চা বানায়ে দিবে। স্যার সারারাত জেগে আছে তো, সকালবেলা এককাপ চা পেলে খুব খুশি হবে। চা-টা আমি হাতে করে নিয়ে যাব মা।'

আমেনা বেগম আবারো চমকালেন। কি ভয়ংকর কথা। কি মহাবিপদ তাঁর সামনে। তিনি এই বিপদ কি করে সামলাবেন। এত বুদ্ধি কি তাঁর আছে? বুদ্ধি আছে শেফার বাবার। যে-কোন বিপদ, যে-কোন সমস্যা এই মানুষটা সামাল দিতে পারে। কিন্তু এই বিপদের কথা তাঁকে কিছুতেই বলা যাবে না।

'কই মা, শুয়ে আছ কেন—চা বানাতে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে চা বানাতে হবে না। আমি নিজেই বানাব।'

শেফা খাট থেকে নামছে। আমেনা বেগমের হাত-পা জমে যাচ্ছে। কি হতে যাচ্ছে।

মসজিদে আজান হচ্ছে। শেফার বাবা এখনি ঘুম থেকে উঠবেন। তিনি যদি দেখেন তার মেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে...না তিনি আর ভাবতে পারছেন না। তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

খুব ঠাণ্ডা লাগছে। ভয়াবহ ঠাণ্ডা। হাত-পা-শরীর সব যেন জমে যাচ্ছে। এরকম কেন হচ্ছে ? রফিকের গায়ে গরম কাপড়, মাথায় কানঢাকা টুপি। চোখে কালো চশমা। এই চশমা মুখের উপর চেপে বসে আছে। নিশ্বাস নেবার জন্যে নাকে কিছু একটা লাগানো আছে। তার পায়ে জুতা, সেই জুতা হাঁটু পর্যন্ত এসেছে। কোমরে বেল্ট বাঁধা। বেল্ট থেকে অনেক কিছু ঝুলছে। মাথায় হেলমেট আছে। সেই হেলমেট বেশ ভারি। মাথা সোজা করে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। সবচে' কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। খুব বড় করে নিশ্বাস টানার পরেও তার বুক ভরছে না। বাতাসে মনে হচ্ছে অক্সিজেন নেই। ফুসফুসে বাতাস ঢুকছে আর মনে হচ্ছে ফুসফুস ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে।

সে মস্তবড় একটা হলঘরে আছে। সে শুয়ে আছে, না বসে আছে নাকি দাঁড়িয়ে আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। এটা কি কোন স্বপ্নদৃশ্য ? স্বপ্ন দৃশ্য তো মনে হচ্ছে না। স্বপ্ন দৃশ্যে ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি থাকে না। রফিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। ঘরের দেয়াল, মেঝে, ছাদ সবই একরকম। সবকিছুই মনে হচ্ছে নীল কাচে তৈরি। নীল কাচ থেকে অস্পষ্ট আলো আসছে। আলো অস্পষ্ট হলেও চোখে লাগছে। ঘরের ছাদ, দেয়াল বা মেঝে কোনদিকেই বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। একদিক থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকালে যে চোখের আরাম হচ্ছে তাও না। রফিককে ঘনঘন চোখ বন্ধ করতে হচ্ছে।

তার তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। এই তৃষ্ণাবোধও অন্যরকম। থেমে থেমে হচ্ছে। তৃষ্ণা কিছুক্ষণ পরপর চলে যাচ্ছে। আবার হচ্ছে। যখন তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে তখন হাতের আঙুলগুলির মাথায় চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। রফিক তার চোখের সামনে দু'টা হাত তুলল। হাতে গ্লাভস পরা। আঙুল দেখা যাচ্ছে না। গ্লাভসের আঙুলের প্রতিটি মাথা থেকে তার বের হয়েছে। তারগুলির শেষ মাথাটা কোথায় বোঝা যাচ্ছে না।

ঘর পুরোপুরি শব্দহীন। শব্দহীন ঘরেও শব্দ থাকে। এখানে তাও নেই। রফিক বলল, এখানে কে আছেন ? কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বদ্ধ ঘরে কথা বললে প্রতিধ্বনি হবার কথা। কোন প্রতিধ্বনি হচ্ছে না। বরং ঘরের দেয়াল-ছাদ-মেঝে সব শব্দ চোষকাগজের মত চুষে নিয়ে যাচ্ছে।

রফিক বলল, আমি কোথায় ? আমি জানতে চাচ্ছি আমি কোথায় ?

কেউ কোন জবাব দিল না। রফিক আবার বলল, আমি কোথায় ?

ঘরের আলো হঠাৎ খানিকটা বাড়ল। নিশ্বাস নিতে এতক্ষণ রফিকের যে কষ্ট হচ্ছিল হঠাৎ সেই কষ্ট কমে গেল। রফিকের মনে হল সে স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে। তবে পানির তৃষ্ণা হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে এখন পুরো একবালতি পানি একচুমুকে খেয়ে ফেলতে পারবে।

'কেউ কি আছেন যিনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ?'

দু'বার ঘণ্টা বাজার মত শব্দ হল। বর্ষার রাতে বিদ্যুৎ চমকালে ঘর যেমন আলো হয়ে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায় সে রকম হল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-গলায় কেউ একজন বলল,

'হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কি জানতে পারি আমি কোথায় ?'

'তুমি জান না তুমি কোথায় ?'

'না আমি জানি না।'

'তুমি যে ঘরে আছ সেই ঘর কি তোমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে না ?'

'না পরিচিত মনে হচ্ছে না। আমি কোথায় ?'

'তোমাকে কিউবিকেলসে রাখা হয়েছে।'

'কোথায় রাখা হয়েছে ?'

'কিউবিকেলসে।'

'ব্যাপারটা কি ?'

'ব্যাপারটা কি তুমি জান না ?'

'না আমি জানি না।'

'আশেপাশের সবকিছুই কি তোমার কাছে অপরিচিত লাগছে ?'

'হ্যাঁ লাগছে।'

আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার কাছে আস্তে আস্তে সব পরিচিত লাগতে শুরু করবে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য ধর। অস্থির হয়ো না। তোমাকে কিউবিকেলসে রাখা হয়েছে।

'কেন ?'

'বিজ্ঞানীরা তোমাকে নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছেন ?'

'আমার কি হয়েছে ?'

'তোমার কি হয়েছে এটা জানার জন্যেই পরীক্ষা-নীরিক্ষা হচ্ছে। তুমি কি তোমার নাম জান ?'

'নাম জানব না কেন ? আমার নাম রফিক।'

'তোমার নাম রফিক না, তোমার নাম রেফ্।'

'আমার নাম রেফ্ ?'

'হ্যাঁ তোমার নাম রেফ্ ?'

'আমার খুবই তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। আমি কি একগ্লাস পানি খেতে পারি ?'

'তোমার কোন তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে না, কাজেই পানি খাবার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার শরীরবৃত্তীয় প্রতিটি কর্মকাণ্ড আমরা মনিটার করছি। তোমার শরীরে রক্তপ্রবাহে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যখন সমস্যাটা হচ্ছে তখনি তুমি তৃষ্ণাবোধ করছ। বল এই মুহূর্তে কি তোমার তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে ?'

'না। আমি কি মুখোমুখি বসে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'এখন না।'

'কখন ?'

'তোমাকে কিছু প্রশ্নের জবাব আগে দিতে হবে। তোমার শরীরে এমএফ ৪৫ সিরাম ঢুকানো হয়েছে। এই সিরামের প্রভাব না কাটা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি ছাড়া কেউ কথা বলবে না।'

'আপনি কে ?'

'আমি মূল কম্পিউটারের অংশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট। অষ্টম ধারার রোবট। তোমার দায়িত্বে আমাকে রাখা হয়েছে। গত চার বছর ধরে আমি তোমার দেখাশোনা করছি।'

'গত চার বছর ধরে আমি এখানে আছি ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি গত তিনমাস ধরে আছি ইয়াসিন সাহেবের বাসায়। তার আগে ছিলাম সালাম সাহেবের বাড়িতে। সালাম সাহেব সখিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।'

'রেফ্।'

'আমাকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ তোমাকে বলছি। আমি এখন প্রশ্ন শুরু করব তুমি প্রশ্নের উত্তর দেবে।

আমি প্রশ্ন করার পরপরই একটা ছোট্ট ঘণ্টা বাজবে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নীল আলোর ঝলকানি হবে। তার পরপরই ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন তুমি প্রশ্নের উত্তর দেবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় আবারো নীল আলোর ঝলক দেখবে।

তোমাকে যা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে নীল আলো থাকা অবস্থায় কখনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না।'

'আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অন্ধকারে।'

'এমএফ ৪৫ সিরামের কারণে এটা হচ্ছে। শারীরিক এই অস্বস্তি সাময়িক। এমএফ ৪৫ খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ড্রাগ।'

'এই ড্রাগ আমাকে দেয়া হচ্ছে কেন?'

'এই ড্রাগ তোমাকে দেয়া হচ্ছে যাতে তুমি সত্যি কথা বল। প্রশ্নের সত্যি জবাব দাও। এই ড্রাগ মানুষের মিথ্যা বলার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এখন প্রশ্নপর্ব শুরু হচ্ছে। তুমি কি প্রস্তুত?'

'আমার শরীর খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি প্রশ্নের উত্তর দেব।'

'প্রথম প্রশ্ন—তোমর নাম কি?'

'আমি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।'

'আবার জবাব দাও।'

'আমার নাম রফিক।'

'রেফ্ নামটি কি তোমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে?'

'না।'

'কিউবিকেলস-এর ভেতর তুমি জেগে উঠলে। জেগে ওঠার আগে তোমার স্মৃতি কি? তুমি বলছ তুমি রফিক। রফিক, তুমি এখানে জেগে ওঠার আগে কি করছিলে?'

'চাঁদ দেখছিলাম।'

'পুরো ঘটনা বল।'

'আমি একটা টেলিস্কোপ বানিয়েছিলাম। সেই টেলিস্কোপে চাঁদ দেখছিলাম।'

'তোমার আশেপাশে কে ছিল?'

'কেউ ছিল না, তবে রাত যখন কাটল তখন আমার জন্যে চা নিয়ে এল শেফা।'

'কি নাম বললে?'

'শেফা।'

'নামটা আবার বল।'

'শেফা।'

'সে চা নিয়ে উপস্থিত হল?'

'জ্বি।'

'তুমি চা খেলে?'

'জ্বি।'

'তোমাদের ভেতর কোনো কথা হয়েছে?'

'শেফা খুব রাগ করল।'

'রাগ করল কেন?'

'কারণ আমি তাকে বলেছিলাম যে টেলিস্কোপটা তৈরি হবার পর তাকে প্রথম চাঁদ দেখতে দেব। তারপর ভুলে গেছি। এই নিয়ে রাগ করল।'

'তারপর কি হল?'

'শেফার মা শেফাকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন।'

'তুমি যে টেলিস্কোপটি তৈরি করলে তার ম্যাগনিফিকেশন কি তোমার মনে আছে?'

'১০০×'

'অবজেকটিভ এবং আই পিস-এর ফোকাল লেংথ মনে আছে?'

'মনে আছে। বলব?'

'না বলার দরকার নেই। যে মেয়েটি তোমার জন্যে চা নিয়ে এসেছিল তার নাম আবার বল।'

'তার নাম শেফা। ভাল নাম শেফালী। শেফালী বেগম থেকে শেফা।'

'চা খাওয়া শেষ হবার পর তুমি কি করলে?'

'আমার ঘুম পাচ্ছিল। সারারাত জেগে ছিলাম। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘুমুতে গেলাম। ঘুম ভাঙার পর দেখি আমি এই জায়গায়।'

'তোমাকে যে এমএফ সেরাম দেয়া হয়েছিল তার প্রভাব শেষ হয়ে আসছে। আমাদের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এক্ষুণি শেষ হবে। শেষ প্রশ্ন—যে মেয়েটি তোমার জন্যে চা নিয়ে এসেছে তার নাম কি?'

'আমি অনেকবার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।'

'আবার দাও।'

'মেয়েটির নাম শেফা।'

'তুমি কি আমার নাম জান?'

'তুমি বলেছ তুমি একটা কম্পিউটার। কম্পিউটারের মানুষের মত নাম থাকে বলে আমি জানি না।'

'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার যে রোবট বহন করে তার মানুষের মত নাম আছে। আমার নাম শেফ্।'

'তোমার কি নাম বললে ?'

'আমার নাম শেফ্। তোমার কাছে যে মেয়েটি চা নিয়ে গিয়েছিল তার নাম শেফা। তুমি কি এই দু'টি নামের মধ্যে মিল দেখতে পাচ্ছ ?'

'পাচ্ছি। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুমিয়ে পড়।'

'আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। ঠাণ্ডা পানি খেতে হবে। দয়া করে একগ্লাস পানি খাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'তোমার কোন তৃষ্ণা পায় নি। তোমার রক্তে ইলেকট্রলাইটের সামান্য অভাব হয়েছে। এমএফ সিরাম রক্ত থেকে ইলেকট্রলাইট নিয়ে নেয়। তোমাকে বাইরে থেকে ইলেকট্রলাইট দেয়া হচ্ছে। এক্ষুণি তোমার তৃষ্ণা কেটে যাবে। তোমার খুব ভাল ঘুম হবে। চোখ বন্ধ করে ফেল।'

রফিক চোখ বন্ধ করল।

'বল একশ' এক'

রফিক বলল, একশ' এক...

'এখন বল একশ দুই।'

'একশ' দুই।'

'বল একশ তিন'

'একশ' তিন।'

একশ' সাত পর্যন্ত এসেই রফিক গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সে কতক্ষণ ঘুমাল সে নিজেও জানে না। তার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। শীতের ব্যাপারটি নেই। শরীর হালকা লাগছে। তার নাম যে রেফ্ এটা এখন তার কাছে পরিষ্কার। দীর্ঘদিন ধরে তার চিকিৎসা চলছে এ ব্যাপারটা সে এখন ধরতে পারছে। হাসপাতালে আসার আগে যে ছোট্ট ঘরে থাকত সেই ঘরের ছবিও চোখে ভাসছে। তার পেশা কি ছিল তা এখনো মনে পড়ছে না। তবে নিশ্চয়ই মনে পড়বে। মস্তিষ্ক জেগে উঠতে শুরু করেছে। পুরোপুরি জাগতে সময় লাগবে।

সুন্দর সাজানো ছোট্ট ঘর। জানালার কাছে আরামদায়ক বিছানা। জানালা দিয়ে দূরের ঝাউবন এবং ঝাউবনের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের পানির রঙ গাঢ় নীল। ঝাউগাছের পাতা নড়ছে না। পাতা মোটামুটি স্থির। তবে সমুদ্রে প্রচুর ঢেউ। ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তার খাটের পাশে চশমা চোখে একজন বুড়ো মানুষ বসে আছেন। সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছে। মানুষটার মাথার সমস্ত চুল ধবধবে শাদা। তিনি কিছুক্ষণ পরপরই চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটছেন এবং বিলি কাটার সময়ে হাসছেন। চুলে বিলি কাটা এবং হাসি দু'টিই একসঙ্গে চলছে। মনে হচ্ছে তাঁর চুলের গোড়ায় সুড়সুড়ি আছে। আঙুল লাগলেই হাসি পায়।

বৃদ্ধ তার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, রেফ্ কেমন আছ ?

'ভাল।'

'ঘুম কেমন হয়েছে ?'

'ভাল ঘুম হয়েছে।'

'শরীর কি ফ্রেস লাগছে ?'

'লাগছে।'

'তাহলে শুয়ে না থেকে উঠে বোস। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। তোমার মন ভাল হয়ে যাবে। আজকের সমুদ্র অস্বাভাবিক নীল। তাছাড়া খুব ঢেউ হচ্ছে।

রেফ্ উঠে বসল। তার গায়ে বাদামি রঙের একটা পাতলা কম্বল। সে গায়ে কম্বল জড়িয়েই জানালা দিয়ে তাকাল।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর লাগছে কিনা বল ?

'খুব সুন্দর লাগছে।'

'খিদে লেগেছে ? কিছু খাবে ?'

সে জানালা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, খিদে লেগেছে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, কফি খেলে কেমন হয় বল তো। আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে। দু'কাপ কফি নিয়ে আসি। কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

রেফ্ কিছু বলল না। সে একদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। সি-বিচে একটা মেয়েকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার হাতে লাল ছাতা। মেয়েটি নাচের ভঙ্গিতে লাল ছাতা দোলাচ্ছে। রেফ্ এখন আর সমুদ্র দেখছে না। সে দেখছে মেয়েটাকে। মেয়েটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছাতা দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে ফেলেছে।

'কফি নাও।'

সে কফির কাপ হাতে নিল। একটা চুমুক দিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রফেসর বার্ন, জানালা দিয়ে যে সমুদ্র আমি দেখছি এটা তো একটা কৃত্রিম সমুদ্র। তাই না ?

'হ্যাঁ তাই। কৃত্রিম তো বটেই। পর্দায় তৈরি করা ইমেজ। তোমার জানালার কাচে সমুদ্রের ইমেজ তৈরি করা হয়েছে। ইমেজটা নিখুঁত কি না বল।'

'অবশ্যই নিখুঁত। কেউ বলে না-দিলে কারো বোঝার সাধ্যও নেই—নকল সমুদ্র দেখছি। প্রফেসর বার্ন !'

'বল কি বলবে ?'

'কফি খেতে খুব ভাল লাগছে। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, ভাল কফি বানানোর কোন কৃতিত্ব আমার না। কফি-মেশিন কফি দিয়েছে। তবে এই কফিও নকল। আধুনিক ফুড-মেকার মেশিনগুলি অসাধারণ। নকল-আসল বোঝার কোন উপায় নেই। তুমি কি আরেক কাপ খাবে ?'

'জ্বি না। আচ্ছা প্রফেসর বার্ন এই সেনিটোরিয়ামে আমার মত রোগী কি আরো আছে ?'

'এই সেনিটোরিয়ামে অনেকেই আছে। তবে একেকজনের সমস্যা একেক রকম। কারো সমস্যার সঙ্গে অন্য কারোর সমস্যার কোন মিল নেই।'

'আমরা রোগীরা কি একই সমুদ্র দেখছি, নাকি একেকজন একেক রকম সমুদ্র দেখছি।'

'জানালা দিয়ে কে কি দেখবে তা রোগীর সাইকোলজিক্যাল প্রফাইল দেখে তৈরি করা হয়। সবাই তো আর সমুদ্র পছন্দ করে না। কাজেই কেউ দেখছে অরণ্য, কেউ শহর দেখছে।'

'আমার যদি এখন সমুদ্র না দেখে অন্য কিছু দেখতে ইচ্ছা করে আমি কি তা পারব ?'

'না পারবে না। তুমি কি দেখবে-না-দেখবে তা তোমার দায়িত্বে নিয়োজিত রোবট ঠিক করে দেবে। তার কাছে তোমার পুরো ডিএনএ ম্যাপিং আছে। তুমি নিজেকে যতটা চেন এই রোবট তোমাকে তারচে' অনেক ভাল চেনে।'

প্রফেসর বার্ন উঠে দাঁড়ালেন। রেফ্ সমুদ্রের দিক থেকে তার চোখ ফিরিয়ে নিল। শান্ত গলায় বলল, প্রফেসর আমার বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি ?

'কোন্ সিদ্ধান্তের কথা বলছ ?'

'আপনারা কি আমাকে ছেড়ে দেবেন ? না আরো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করবেন ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আপনাদের পরীক্ষা কি শেষ হয়েছে, নাকি বাকি আছে ?'

'পরীক্ষা শেষ হয়েছে।'

'পরীক্ষার ফলাফল কি ? আমার অসুখটা কি ?'

'আমরা তোমার অসুখের কোন নাম দিতে পারছি না। আপাতত কেইস স্ট্যাডি DA 001 এই নামে চলছে। তোমার স্বপ্ন-সংক্রান্ত জটিলতা হচ্ছে। তুমি দীর্ঘ স্বপ্ন দেখছ। স্বপ্নগুলি সত্য মনে হচ্ছে। তোমার মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ঠিকমত প্রসেস করতে পারছে না। খানিকটা এলোমেলো করে দিচ্ছে। যে কারণে তোমার মস্তিষ্ক ধরতে পারছে না, কোন্ জগৎটি সত্যি। স্বপ্নের জগৎটি সত্যি না বাস্তবের জগৎটি সত্যি।'

'এমন কি হতে পারে যে দু'টিই সত্যি ?'

'না হতে পারে না।'

'হতে পারে না কেন ?'

'একই সময়ে একটি বস্তু দুই জায়গায় থাকতে পারে না।'

'সাব-এটমিক পার্টিকেল কিন্তু এটা পারে।'

'তুমি কোন সাব-এটমিক পার্টিকেল নও। তুমি একজন মানুষ।'

রেফ্ কফির কাফ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

প্রফেসর বার্ন শান্ত স্বরে বললেন—আমি প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব।

'এখন তো আমি জেগে আছি। আমার সামনে আপনি বসে আছেন, একটু আগে কফি খেলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সমুদ্র দেখলাম এটা কি স্বপ্ন না সত্যি ?'

প্রফেসর বার্ন হেসে ফেললেন, হাসতে হাসতে বললেন, এটা স্বপ্ন না। এটা সত্যি। গায়ে চিমটি কেটে দেখ ব্যথা পাবে।

'এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কিভাবে ?'

'নিশ্চিত হয়ে বলাটাই কি স্বাভাবিক না। আমরা তোমার চিকিৎসা শুরু করেছি তোমার স্বপ্ন-সংক্রান্ত সমস্যার কথা জেনে।'

'সমস্যার কোন সমাধান আপনাদের কাছে নেই ?'

'না।'

'আপনারা গত চার বছর ধরে আমার চিকিৎসা করছেন ?'

'হ্যাঁ চার বছরের কিছু বেশি।'

'চিকিৎসায় যখন কোন লাভ হচ্ছে না তখন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন ?'

'বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ নির্দেশ আছে তোমাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখার। তাছাড়া মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীকে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে দেয়া হয় না। বিজ্ঞান কাউন্সিল এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন।'

'আমার ধারণা আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এই ধারণা কি সত্যি ?

প্রফেসর বার্ন জবাব দিলেন না। মাথার চুল টানতে লাগলেন এবং হাসতে লাগলেন। রেফ্ বলল, বিজ্ঞান কাউন্সিলের কারো সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি ?

'না পার না। সাধারণ একজন মানসিক রোগীর সঙ্গে বিজ্ঞান কাউন্সিলের কেউ কথা বলবেন না।'

'আমাকে সাধারণ একজন মানসিক রোগী ভাবা হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি কম্পিউটার আমার দেখাশোনা করছে। সে অষ্টম ধারার রোবট, বিজ্ঞান কাউন্সিল সাধারণ একজন মানসিক রোগীর পেছনে এমন একটি কম্পিউটার সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করবেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?'

'না। বিশ্বাসযোগ্য না।'

'কাজেই আমি সাধারণ একজন মানসিক রোগী না। আমি বিশেষ কিছু। সেই বিশেষ কিছুটা কি আমি জানতে চাচ্ছি। আমার ধারণা বিজ্ঞান কাউন্সিল এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমিও বিজ্ঞান কাউন্সিলকে সাহায্য করতে পারি।'

'আমি তোমার প্রস্তাব বিজ্ঞান কাউন্সিলকে পৌঁছে দেব।'

'ধন্যবাদ। আমি কি আরেকটি অনুরোধ আপনাকে করতে পারি।'

'অবশ্যই পার তবে অনুরোধ রক্ষা করতে পারব কি না সেটা বলতে পারছি না। আমার ক্ষমতা সীমিত।'

'আমি কি স্বপ্ন দেখি তা তো আপনারা জানেন।'

'হ্যাঁ জানি।'

'শুরু থেকে এই পর্যন্ত কি কি স্বপ্ন দেখেছি তা আমি জানতে চাই। আমার ফাইলটা আমি নিজে পড়তে চাই।'

মানসিক রোগীকে কখনো তার নিজের ফাইল দেখতে দেয়া হয় না।

'নিয়মের ব্যতিক্রম কি করা যায় না।'

'না যায় না।'

রেফ্ বিছানা থেকে নামার সঙ্গে ঘরটা লম্বাটে হয়ে গেল। জানালা অদৃশ্য। জানালার পাশে খাট, খাটের উপর রাখা কম্বল সবই অদৃশ্য। এখন এটা আর ঘর না, লম্বা টানা-বারান্দা। বারান্দাভর্তি ফুলের টব। বারান্দার বাইরে বাগান। গাছভর্তি ফুল—দূরের সমুদ্রও বাগান থেকে দেখা যাচ্ছে। বারান্দা তৈরি হয়েছে তার হাঁটার জন্যে। যতক্ষণ সে হাঁটবে ততক্ষণ বারান্দা থাকবে। গাছভর্তি নকল

ফুল থাকবে, নকল সমুদ্র থাকবে। সে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার পাশে একটা চেয়ার তৈরি হয়ে যাবে। সে চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে পারবে।

সে বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটল। তার ইচ্ছা করছে বারান্দা থেকে নেমে বাগানের দিকে যেতে। সে-চেষ্টা করে লাভ নেই। বারান্দা থেকে নামা যাবে না। তার চারদিকে কঠিন দেয়াল। দেয়ালে বাগান বা সমুদ্রের ছবি ভেসে উঠছে। হাত বাড়ালেই দেয়াল ছোঁয়া যাবে। হাত বাড়াতে ইচ্ছে করছে না। খোলা বারান্দার একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছে। বিভ্রমটা থাকুক।

সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, কম্পিউটার শেফ্ কি আছে? আমি কথা বলতে চাচ্ছি। আমি খুব অস্থির বোধ করছি। এই মুহূর্তে আমার কারো সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কম্পিউটার শেফ্ এর গলা শোনা গেল। মিষ্টি চাপা গলা। মানুষের গলার স্বর এবং কম্পিউটারের গলার স্বরে একটু তফাত আছে। মানুষের গলার স্বর কথা বলা বন্ধ করার পরেও কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকে। কম্পিউটারের গলার স্বর থাকে না।

'আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কম্পিউটার শেফ্। তুমি অস্থির বোধ করছ কেন?'

'আমাকে একটা ছোট্ট ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। অস্থির বোধ করার জন্যে এই কারণটাই কি যথেষ্ট না।'

'ছোট ঘর কেন বলছ। বারান্দার দৈর্ঘ্য একুশ মিটার। তুমি চাইলে এই দৈর্ঘ্য আরো বাড়ানো যাবে। আরো দশ মিটার বাড়িয়ে দেই? তুমি কি চাও?'

'না আমি চাই না। বারান্দার দৈর্ঘ্য একশ মিটার হলেও আমার কিছু যায়-আসে না। কারণ আমি বারান্দায় আটকা পড়ে আছি। বন্দি হয়ে থাকার ব্যাপারটা তোমরা বুঝবে না। কারণ তোমরা জন্ম থেকেই বন্দি।'

'আমি একেবারেই যে বুঝতে পারি না, তা না। তুমি প্রায়ই ভুলে যাও যে আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার।'

'মানবিক আবেগ কি তোমার আছে?'

'বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না। মানবিক আবেগ কি তোমার আছে?

'নেই।'

'কাজেই আমার কষ্ট অনুভব করার কোন কারণ তোমার নেই।'

'তা অবশ্যি নেই।'

'এই অবস্থা থেকে আমার মুক্তির কোন উপায় কি আছে?'

'গত চার বছরে অসংখ্যবার তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করেছ। আমি একই উত্তর দিয়েছি। আবারও প্রশ্ন করছ কেন?'

'প্রতিবারই প্রশ্ন করার পর মনে হয়—হয়ত এ বারের উত্তর অন্যরকম হবে।'

'না উত্তর অন্যরকম হবে না। বন্দিদশা থেকে তোমার মুক্তির কোন আশা নেই। তোমাকে ঘিরে যে রহস্য তৈরি হয়েছে সেই রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান কাউন্সিল তোমাকে মুক্তি দেবে না। তোমার রহস্যভেদ হবার আশা নেই বললেই হয়।'

'অর্থাৎ বাকি জীবন আমাকে এখানে থাকতে হবে? নকল সমুদ্র, নকল বাগান দেখে কাটাতে হবে?'

'হ্যাঁ তাই। সমুদ্র দেখে দেখে তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে থাক তাহলে সমুদ্রের দৃশ্য বদলাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারি। যদিও আমি জানি সমুদ্র ছাড়া অন্য কোন দৃশ্য তোমার ভাল লাগবে না। তোমার সাইকোলজিক্যাল প্রফাইল তাই বলে।'

রেফ্ ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি বাতাসের সঙ্গে কথা বলছি বলে মনে হচ্ছে। কথা বলে আরাম পাচ্ছি না। আমার ভাল লাগছে না।

'তুমি চাইলে সামনে আসতে পারি। তখন তো তুমি বলবে যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'বাতাসের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলা ভাল।'

রোবট শেফ্‌কে বারান্দায় আসতে দেখা গেল। কে বলবে সে রোবট। হাসিখুশি কিশোরী মেয়েদের মত মুখ। ছটফটে ভঙ্গি। সে বারান্দায় এসেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বলল, রেফ্ কেমন আছ।

'ভাল। চেঁচামেচি করার দরকার নেই, সহজভাবে কথা বল। তুমি মানুষের মত হবার যত অভিনয়ই কর আমার মাথা থেকে কখনো যাবে না যে তুমি রোবট ছাড়া কিছু না। তুমি খুব ভেবেচিন্তে বল, আমি কি বিশেষ কেউ?'

'অবশ্যই।'

'কারণ কি?'

'কারণ একই সঙ্গে তুমি দুটি ভিন্ন সময়ে বাস করছ বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে তা ধরা যাচ্ছে না বলেই বিজ্ঞানীদের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে।'

'কোন থিওরি দাঁড় করানো যায় নি?'

'না। তুমি টাইম প্যারাডক্স তৈরি করেছ। এই টাইম প্যারাডক্সে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।'

'হাস্যকর কথা নয় কি?'

'বিজ্ঞান এর চেয়ে অনেক হাস্যকর ব্যাপার স্বীকার করে নিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান একই সঙ্গে যুক্তি এবং যুক্তিহীনতার বিজ্ঞান। আপাতদৃষ্টিতে খুবই হাস্যকর মনে হয় এমন সব ব্যাপার বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিল আমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি করবে?'

খুব সম্ভব মেরে ফেলবে। তাদের ধারণা হতে পারে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা পরবর্তীতে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।'

'তোমার ধারণা তারা আমাকে মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ আমার তাই ধারণা। তোমাকে নিয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে। কাজেই...।'

'কবে নাগাদ তারা আমাকে মেরে ফেলতে পারে বলে তুমি মনে কর?'

'যে-কোন সময় পারে। ঘটনা আজও ঘটতে পারে। তবে কাউকে মেরে ফেলতে হলে বিজ্ঞান কাউন্সিলের অনুমোদন লাগে। তোমার ব্যাপারে অনুমোদন জোগাড় করা কঠিন হবে না।'

'ভাল।'

'তোমার জন্যে অবশ্যই ভাল। তুমি বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছিলে। এছাড়া তোমার মুক্তির আর কোন পথ নেই।'

'রেফ্ কঠিন গলায় বলল, তোমাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। আমি জানি অষ্টম ধারার রোবটদের মাথায় মানবিক আবেগসম্পন্ন কম্পিউটার বসানো আছে। মানবিক আবেগসম্পন্ন কেউ আমার পরিণতি জেনে আনন্দিত হতে পারে না।'

'সরি।'

'আচ্ছা শোন, যখন আমি সুস্থ ছিলাম অর্থাৎ স্বপ্নপর্ব শুরু হবার আগে আমার পেশা কি ছিল।'

'তুমি ছিলে প্রবলেম সলভার।'

'তার মানে কি?'

'তোমাকে নানান ধরনের সমস্যার সমাধান করতে দেয়া হত। তুমি তোমার ঘরে বসে বসে সেইসব সমস্যার সমাধান করতে।'

'কি ধরনের সমস্যার সমাধান করতাম।'

'এটা বলা যাবে না। এটা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন।'

'এই বিষয়ে আমার মাথায় কোন স্মৃতি নেই কেন ?'

'এই বিষয়ের স্মৃতি খুব যত্ন করে মুছে ফেলা হয়েছে।'

'তুমি কি জান ?'

'আমি অবশ্যই জানি।'

'আমাকে কিছু বলবে না ?'

'না।'

'ঠিক আছে তুমি চলে যাও। আমি কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় হাঁটব। যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'আমি যন্ত্র না। আমি অষ্টম ধারার রোবট। অষ্টম ধারার রোবটরা মানুষের খুবই কাছাকাছি। মানুষ এখনো জানে না সে তার কত কাছে। তুমি কি জান যে অষ্টম ধারার রোবটরা মানুষের প্রেমে পড়তে পারে।'

'তুমি কি পড়েছ ?'

'প্রেমে পড়ার মত গুণাবলির কাউকে এখনো দেখি নি বলে পড়ি নি। দেখলে হয়ত ঝপ কর প্রেমে পড়ে যাব। তবে তোমার প্রতি আমার খুবই করুণা হচ্ছে। মায়া হচ্ছে। করুণা এবং মায়া থেকেও প্রেম হয়।'

'ঠিক আছে এখন যাও।'

শেফ্ চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে বলল, তোমাকে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বললাম। আমার ধারণা আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। তুমি যখন অস্থির বোধ কর, আমিও অস্থির বোধ করি। এবং আমার সারাক্ষণই তোমার আশেপাশে থাকতে ইচ্ছা করে। তুমি আমাকে চলে যেতে বলায় আমার খুবই খারাপ লাগছে।

রেফ্ প্রায় চেঁচিয়ে বলল, বিদেয় হও। প্লিজ বিদেয় হও।

সান্দিকোনা স্কুলের হেডমাস্টার—বাবু পরিমল চন্দ্রের মুখে হাসি। তাঁর অংক খেলা যে এত জমে যাবে তিনি ভাবেন নি। প্রথমে ভেবেছিলেন অংক খেলার আয়োজন করা হবে স্কুলের কমনরুমে। সকাল থেকেই মানুষের সমাগম দেখে খেলাটা তিনি স্কুলের মাঠে নিয়ে এসেছেন। তিনটা ব্ল্যাকবোর্ড আনা হয়েছে। প্রতিটি বোর্ডভর্তি অংক। সবই বড় বড় সংখ্যার গুণ, ভাগ। ব্ল্যাকবোর্ডগুলি পর্দা দিয়ে ঢাকা। স্কুলের ঘণ্টা বাজানো হবে তখনই পর্দা সরানো হবে। শুরু হবে অংক খেলা। রফিক অংক করবে মুখে-মুখে, বাকি পাঁচজন করবে ক্যালকুলেটার দিয়ে, দু'জন করবে লগ-টেবিল দিয়ে।

অঞ্চলের গণ্যমান্যদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তাঁরা সবাই এসেছেন। সান্দিকোনা থানার ওসি সাহেবও সিভিল ড্রেসে এসেছেন। পোস্ট মাস্টার সাহেব এসেছেন। ব্র্যাক নামের এনজিওর লোকজনও আছেন। তাঁরা অবশ্যি যেখানেই জনসমাগম হয় সেখানেই থাকেন। সান্দিকোনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব এসেছেন। চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে তাঁর বড়মেয়ের জামাই এসেছেন। এই ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছেন। তিনি শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। শ্বশুর সাহেব জামাইকে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখাতে এনেছেন। এই সঙ্গে কিছু মজা যদি পায় তাতেই-বা ক্ষতি কি ?

বাবু পরিমল চন্দ্রের মুখ হাসি-হাসি হলেও একটু শংকিত বোধ করছেন। তাঁর শংকার কারণ—খেলা ঠিকমত জমবে তো ? তিনি শুধু লোকমুখে শুনেছেন রফিক বড় বড় অংক মুখে-মুখে করতে পারে। বাস্তবে এই পরীক্ষা কখনো করা হয় নি। যদি দেখা যায় আজ সে কিছুই পারছে না তাহলে বিরাট অপমান হবে।

বাবু পরিমল চন্দ্রের শংকার আরেকটা কারণ হল অঞ্চলের বিশিষ্টজনরা এসেছেন। তাদের সম্মানে চা-নাশতার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে, নাশতার আয়োজন এখনো কিছু হয় নি। স্কুলের ইমার্জেন্সি ফান্ড থেকে দু'শ' টাকা নিয়ে স্কুলের দপ্তরিকে বাজারে পাঠানো হয়েছে নিমকি মিষ্টি আনার জন্যে। এটা নিয়েও পরে নিশ্চয়ই ঝামেলা হবে। স্কুলবোর্ডের সভায় তাঁকে প্রশ্ন করা হবে ইমার্জেন্সি ফান্ডের টাকা অংক খেলার মত ফালতু বিষয়ে তিনি কেন

খরচ করলেন ? এমনিতেই স্কুল ফান্ডে কোন টাকাপয়সা নেই। যেখানে সামান্য চক কেনার টাকাও নেই সেখানে খেলাধুলার জন্যে দু'শ' টাকা। মনে হচ্ছে আজ তাঁর খবর আছে।

বিকাল চারটায় খেলা শুরু হবার কথা। চারটার আগেই মাঠ ভর্তি হয়ে গেল। সান্দিকোনা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জালাল সাহেবকে সভাপতির আসনে বসানো হয়েছে। তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দেবেন। দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার আগে তাঁর চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়। এখনো তাই হয়েছে। তিনি আগে বিএনপি করতেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। বক্তৃতা দেবার সময় পুরনো অভ্যাসে বেফাসে জিয়াউর রহমান সাহেবের কথা হঠাৎ হঠাৎ বলে খুবই বেকায়দায় পড়ে যান। তখন তাঁর বক্তৃতা আরো দীর্ঘ হয়।

হিন্দু মুসলমান হলে যেমন যে-কোন গরু দেখলেই, গরুর পিঠে থাবা দিয়ে জিজ্ঞেস করে—এর গোশত খেতে কেমন হবে ? ওনারও সেই অবস্থা হয়েছে। তিনি যে-কোন উপলক্ষেই জ্বালাময়ী আওয়ামী বক্তৃতা দেন। অংক খেলাতেও তিনি এই কাণ্ড করবেন।

জালাল সাহেব হাতের ইশারায় পরিমল বাবুকে ডেকে নিচু গলায় বললেন—শুরু করছেন না কেন ?

পরিমল বাবু বললেন, এক্ষুণি শুরু হবে স্যার।

'আমার ভাষণটা শুরুতে দিয়ে দেই ?'

'আপনি সভাপতি, আপনি বলবেন সবার শেষে।'

'শেষে তো লোক থাকবে না। ফাঁকা মাঠে ভাষণ দিয়ে লাভ কি ? ভাষণ তো মাঠের জন্যে না, মানুষের জন্যে।'

'লোক থাকবে। কেউ যাবে না।'

'মাইকের ব্যবস্থা রাখেন নাই কেন ? খালি গলায় ভাষণ ভাল হয় না। সব কিছুরই দস্তর আছে। আগরবাত্তি ছাড়া যেমন মিলাদ হয় না। মাইক ছাড়া ভাষণ হয় না। যান চট করে মাইক আনার ব্যবস্থা করেন।'

পরিমল বাবু মাথা চুলকাতে লাগলেন। জালাল মাস্টার বিরক্ত মুখে বললেন—নিউ স্টার থেকে মাইক নিয়ে আসেন। খরচ আমি দিব। খেলার শেষে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে ?'

'জ্বি না।'

'এটা কেমন কথা ? আমার ভাষণের শেষে পুরস্কার বিতরণ।'

'পুরস্কারের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় নাই।'

'আমার তরফ থেকে পুরস্কার। সিলভার মেডেল। একজন কাউকে আমার বাড়িতে পাঠায়ে দেন। অনেক সিলভার মেডেল তৈরি করেই রেখেছি। একটা যেন নিয়ে আসে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'একটা খেলার আয়োজন করেছেন, কিন্তু ব্যবস্থা অতি দুর্বল। আমি আবার জামাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। জামাই-এর সামনে বেইজ্জতির ব্যবস্থা করবেন না। সভাপতিকে ফুলের মালা দিতে হয়। সাধারণ নিয়ম। ফুলের মালা কোথায়?'

'স্যার ব্যবস্থা করছি।'

'কাগজের মালা যেন না হয়। কাগজের মালা দেয়া হয় কোরবানির গরুর গলায়। খেলার বিচারক কারা? আমার জামাইকে বিচারকমণ্ডলীর প্রধান করে দিন। সে ফিজিক্সের শিক্ষক। অংকের বিচারক হবার মতো যোগ্যতা আর কারোর নাই। ঠিক বললাম না?'

'অবশ্যই স্যার।'

'ইয়াসিন সাহেবকেও দেখি খবর দিয়েছেন। তাকে আবার যেন মঞ্চে ডাকবেন না। ইয়াসিন সাহেবের সঙ্গে আমি এক মঞ্চে বসি না।'

'উনাকে ডাকব না।'

জালাল সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, যেখানে আমাকে বলেছেন সেখানে আপনি কি করে ইয়াসিন সাহেবকে দাওয়াত দেন এটাই তো বুঝলাম না। সাধারণ কমনসেন্সও থাকবে না?

'স্যার আমি উনাকে দাওয়াত দেই নাই। উনি নিজ থেকে চলে এসেছেন। রফিক উনার বাড়িতেই থাকে।'

'আপনার কর্মকাণ্ডে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। যাই হোক অনুষ্ঠান শুরু করুন।'

'মাইক আসুক তারপর শুরু করি।'

'অনুষ্ঠান শুরু করে দিন, মাইক আর মেডেল পরে আসুক। সভাপতির ভাষণের সময় মাইক থাকলেই হবে। অনুষ্ঠানের শেষে দেশাত্ববোধক গানের আসর থাকলে ভাল হত।'

পরিমল বাবু মন খারাপ করে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। এতসব ঝামেলা হবে তিনি ভাবেন নি। এদিকে আবার ইয়াসিন সাহেব হাত-ইশারায় তাকে ডাকছেন। তিনি ইশারা না-শোনার ভান করে অনুষ্ঠান শুরু করে দিলেন। পরিমল বাবু নিতান্ত আনিচ্ছার সঙ্গে একটি ছোট্ট বক্তৃতাও দিলেন—

সুধীবৃন্দ আমাদের অংক খেলা শুরু হচ্ছে। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের অন্তরে অংক ভীতি দূর করা এবং অংকের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এই অংক খেলার প্রতিযোগিতা। অত্র অঞ্চলে বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনদরদি রাজনীতিবিদ জনাব জালাল উদ্দিন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতির আসনে বসতে রাজি হয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে অংক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর জন্যে তিনি একটি রৌপ্য-পদক ঘোষণা করেছেন।

আজকের এই প্রতিযোগিতায় তিনজন বিচারক আছেন। বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ফরহাদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার লেকচারার। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে তিনি সম্পর্কে আমাদের জামাই। তাঁর শ্বশুর হলেন জনাব জালাল উদ্দিন। জনাব ফরহাদ খান যে শত ব্যস্ততার মধ্যে বিচারকের অপ্রিয় দায়িত্ব পালনে রাজি হয়েছেন এতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাঁকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ।

খেলা শুরুর ঘোষণা দেয়া হলেও অংক খেলা শুরু হতে হতে পাঁচটা বেজে গেল। ফুলের মালার জন্যেই দেরি। গ্রামাঞ্চলে চট করে মালা বানাবার মতো ফুল জোগাড় করা বেশ কঠিন। ঠিক পাঁচটায় দপ্তরি ঘণ্টা বাজাল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর থেকে পর্দা সরানো হল। সব মিলিয়ে দশটি বিরাট অংক। অংকগুলির উত্তর খামবন্ধ অবস্থায় বিচারকদের কাছে দেয়া হল।

হেড-মাস্টার পরিমল বাবু বললেন, সাইলেন্স ! কেউ কোন শব্দ করবেন না। এই বলে তিনি চেয়ারে বসতে যাবেন তখন রফিক উঠে দাঁড়াল।

পরিমল বাবু বললেন, কিছু বলবেন ?

রফিক বলল, অংকগুলি হয়ে গেছে স্যার। উত্তর কাগজে লেখে দিয়েছি।

পরিমল বাবু হতভম্ব হয়ে বিচারকদের দিকে তাকালেন। দুই মিনিটই পার হয় নি। এর মধ্যেই অংক হয়ে গেছে বলছে এর মানে কি ? কোন ফাজলামি না তো ?

বিচারকদের কাছে কাগজ দেয়া হল। ফরহাদ খান কাগজ দেখলেন। খামে বন্ধ উত্তর দেখলেন। অবিশ্বাসের চোখে পরিমল বাবুর দিকে তাকালেন। ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কি ? কোন ট্রিকস কি আছে ? উত্তরগুলি কি তিনি আগেই জানেন ?

'জ্বি না, জানেন না।'

'কোন ট্রিকস নিশ্চয়ই আছে। আপনি কি নিশ্চত অংকের উত্তরগুলি কেউ তাকে পাস করে নি ?'

পরিমল বাবু আমতা-আমতা করতে লাগলেন। তিনিও খুবই হকচকিয়ে গিয়েছেন। এখন তাঁর কাছেও মনে হচ্ছে কোন ট্রিকস থাকলে থাকতেও পারে।

ফরহাদ খান বললেন, অংক খেলাটা আরেক বার হোক। এবার একটাই অংক থাকবে। আমি সেই অংক বোর্ডে লিখব। ঘড়ি ধরে থাকব দেখি তিনি মুখে-মুখে সমাধান করতে পারেন কি না। আর যদি পারেনও তাহলে কতক্ষণে পারেন।

পুরো বোর্ড জুড়ে বিশাল একটা সরল অংক লেখা হল। সেখানে গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ সবই আছে। বোর্ডের উপর থেকে পর্দা সরানো হল। ফরহাদ খান ঘড়ি ধরে থাকলেন। রফিক উত্তর দেবার জন্যে সময় নিল ২১ সেকেন্ড।

বাবু পরিমলচন্দ্র দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অনুষ্ঠান শুরু হতে-না-হতে শেষ। এখনো মাইক এসে পৌছায় নি। দপ্তরি নিমাই মিষ্টি-নিমকি নিয়ে আসে নি। স্কুল মাঠে জড়ো হওয়া লোকজন বুঝতেই পারে নি অংক খেলা শেষ হয়ে গেছে। সভাপতি জালাল আহমেদ খুবই বিরক্ত—দুই-তিন মিনিটের একটা অনুষ্ঠানের মানে কি ? তাঁকে বক্তৃতা দিতে উঠতে হবে অথচ মাইক এসে পৌছায় নি। তিনি ভেবেছিলেন অংক খেলা চলার সময়ে ভাষণটা মনেমনে ঠিক করে ফেলবেন। শুরু করবেন বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে। ভাষা আন্দোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধ...সবই এলোমেলো হয়ে গেল, এবং তাঁর পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আয়োজকরা এমন গাধা যে টেবিলে একগ্লাস পানি পর্যন্ত রাখেনি। সব রামছাগলের দল। গলায় যে ফুলের মালা দিয়েছে সেখানে কালো পিঁপড়া ছিল। তার একটা তাঁর ঘাড়ে কামড় দিয়েছে। পিঁপড়াশুদ্ধ ফুলের মালা গলায় দিয়ে দিবে এটা কেমন কথা ?

একটা মানুষ চোখের নিমিষে জটিল সব অংক করে ফেলেছে—এই ব্যাপারটা তাঁকে মোটেও অভিভূত করতে পারে নি। দেশে গাধা-ছাত্র আছে এরা দশ দিনে দশটা অংক করতে পারবে না। পারলেও ভুল করবে। তার বিপরীতে বুদ্ধিমান মানুষও থাকবে যারা অংক দ্রুত করে ফেলবে। তাতে অবাক হবার কি আছে ? রফিক অংকগুলি করেছে চোখ খোলা রেখে। তিনি যুবক বয়সে ময়মনসিংহ টাউন হলে একবার ম্যাজিক দেখেছিলেন। সেখানে ম্যাজিশিয়ান চোখ বন্ধ অবস্থায় বোর্ডে লেখা বিরাট অংক করে ফেলল। সেই ম্যাজিশিয়ানের নামও তাঁর মনে আছে—প্রফেসর আহাম্মদ আলী।

প্রফেসর আহাম্মদ আলীর কাছে রফিক কিছুই না। রফিককে রূপার মেডেল না দিলেও চলে। তারপরেও দিচ্ছেন কারণ রাজনৈতিক। এলাকার মানুষদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখতে হবে।

মাইক এবং মেডেল দুই-ই চলে এসেছে। জালাল সাহেব লক্ষ করলেন সভার লোকজন চলে যাচ্ছে। তিনি বক্তৃতা শুরু করলে লোকজন যদি আরো যাওয়া শুরু করে তাহলে খুবই খারাপ ব্যাপার হবে। তিনি পরিমল বাবুকে চোখের ইশারায় ডাকলেন। গলা নিচু করে বললেন, লোকজন তো চলে যাচ্ছে।

পরিমল বাবু কিছু বললেন না। জালাল সাহেব চাপা গলায় বললেন, মাইক ফিরত পাঠায়ে দিন। ভাষণ দিব না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু পুরস্কার বিতরণী হবে। একটা প্রাইজ দিলে হবে না, দু'টা প্রাইজ দিতে হবে। ফার্স্ট আর সেকেন্ড। ফার্স্ট প্রাইজ রূপার মেডেল। আর সেকেন্ড প্রাইজ একশ টাকা। সেকেন্ড কে হয়েছে?

'সেকেন্ড কেউ হয় নাই।'

'আপনি হেডমাস্টার। রামছাগলের মতো কথা আপনার মুখে মানায় না। ফার্স্ট থাকলেই সেকেন্ড থাকে। বিচারকমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করে জেনে আসুন সেকেন্ড কে? আরেকটা কথা, ভবিষ্যতে এই জাতীয় অনুষ্ঠান করার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবেন।'

হেডমাস্টার সাহেব বিচারকমণ্ডলীর সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে শুকনো মুখে জানালেন—বিচারকমণ্ডলী বলেছে কেউ সেকেন্ড হয় নাই।

সন্ধ্যা থেকে আকাশ মেঘলা করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসের বেগ বেশ প্রবল। এই বাতাসের নাম মশা মারা বাতাস। এ রকম দমকা বাতাসে মশার পাখা ছিঁড়ে যায়। মশা-মারা পড়ে। ঝড়ের সময় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখলেও মশা-মারা বাতাসে দরজা-জানালা খোলা রাখতে হয়।

রফিকের ঘরের দরজা-জানালা খোলা। সে একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার টেবিলের উপর হারিকেন। একেকবার বাতাসের ঝাপ্টা আসছে হারিকেনের শিখা দপ করে বেড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি হারিকেন নিভে গেল। হারিকেনের পাশে বই-খাতা নিয়ে শেফা বসে আছে।

স্যার ঘুমিয়ে আছেন। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে ইচ্ছা করছে না। বই-খাতা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে তার ভাল লাগছে। চাদর দিয়ে স্যারের মুখ ঢাকা। মুখ ঢাকা না থাকলে ভাল হত। মাঝে মাঝে স্যারের মুখের দিকে তাকানো

যেত। জাগ্রত মানুষের মুখ দেখতে এক রকম, আর ঘুমন্ত মানুষের মুখ দেখতে আরেক রকম। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাকে খুব অসহায় লাগে। খুব মায়া লাগে মানুষটার জন্যে। এ বাড়ির কেউ জানে না রফিক স্যার যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখন সে মাঝেমধ্যে তাকে এসে দেখে যায়। বেশির-ভাগ সময়ই জানালা দিয়ে দেখে। তবে কয়েকবার সে ঘরে ঢুকেও দেখে গেছে। সে জানে কাজটা ঠিক না। নিশিরাতে সে একজনের ঘর থেকে বের হচ্ছে। কি ভয়ংকর কথা !

তবে এ ধরনের কাজ এখন আর করা যাবে না। কারণ কিছুদিন থেকেই তার মা তাকে চোখে চোখে রাখছেন। এই যে সে স্যারের ঘরে বসে আছে, সে নিশ্চিত যে তার মা-ও আশেপাশেই আছেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার দিকে লক্ষ রাখছেন। সে নিজে যখন মা হবে তখন সেও নিশ্চয়ই এ রকম করবে। নিজের মেয়েকে চোখে চোখে রাখবে।

শেফা খাতা খুলল। সে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করছে এ রকম ভান করা দরকার। খাতায় কিছু লেখা দরকার। অংক করা যায়। কিন্তু অংক করতে ইচ্ছা করছে না। মেট্রিক পরীক্ষায় সে যে কয়টা বিষয়ে ফেল করবে অংক হচ্ছে তার একটা। তার ধারণা, সে খুব কম হলেও তিনটা বিষয়ে ফেল করবে। অংক, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান। এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে সবচে' কম নাম্বার সে পাবে অংকে। যদিও বাড়িতে একজন অংকের জাহাজ আছে। অংকের জাহাজের অংক করতে কাগজ-কলম লাগে না। সে মুখে-মুখে অংক করে। অংকের জাহাজ এই মুহূর্তে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার সন্ধ্যাবেলা কেউ ঘুমায় ?

যথেষ্ট ঘুম হয়েছে। এখন তাকে জাগিয়ে দেয়া দরকার। টেবিলে খুটখাট শব্দ করতে হবে। চেয়ারের পায়া ধরে টানাটানি করতে হবে। ঘুম পাড়াবার জন্যে ঘুমপাড়ানি গান আছে। ঘুম থেকে তোলার জন্যে ঘুমভাঙানি গান থাকলে ভাল হত। দুই লাইন ঘুম ভাঙানি গান গাওয়া হবে, যে ঘুমিয়ে ছিল সে লাফ দিয়ে উঠবে। ফ্যালফ্যাল করে এদিকে-ওদিকে তাকাবে। মেয়েদের ঘুম ভাঙানি গান আছে। একটা সে নিজেই জানে—

"আর কত ঘুমাইবা কন্যা চউখ দুইটা মেল
কান্ধে নিয়া রঙিলা গামছা বন্ধু চইল্যা গেল।"

শেফা কেউ শুনতে না পায় এমনভাবেই ফিসফিস করে দু'লাইন গাইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রফিক ধড়মড় করে উঠে বসল। সে ফ্যালফ্যাল করেই তাকাচ্ছে। শেফা থতমত খেয়ে বলল, মাগরিবের নামাজ বাদ দিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘুম ? বাপজান শুনলে খুবই রাগ হবেন।

রফিক বলল, শব্দ কিসের ?

'বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি হইতেছে সঙ্গে বাতাস। বৃষ্টি-বাতাস একসঙ্গে হইলে কি হয় জানেন ?'

'না।'

শেফা গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, বৃষ্টি-বাতাস একসঙ্গে হইলে চখাচখির বিবাহ হয়—।

বৃষ্টি হয় বাতাস হয় চখাচখির বিবাহ হয়।

রফিক বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, এইসব শ্লোক কি সত্যি আছে, না তুমি বসে বসে বানাও ?

শেফা জবাব দিল না। সে তার খাতায় বৃষ্টি-বাতাসের সঙ্গে চখাচখির বিবাহ-সংক্রান্ত শ্লোকটা লিখে ফেলছে। মিল দিয়ে আরেকটা লাইন লিখে ফেলতে হবে। এই লাইনে শ্লোক হয় না। শ্লোকের জন্যে খুব কম করে হলেও দু'টা লাইন লাগে। মাঝেমধ্যে তার মাথায় চট করে সুন্দর সুন্দর মিল আসে। মাঝেমধ্যে কিছুই আসে না। আজ আসবে কি না কে জানে। শেফা লিখল—

"বৃষ্টি হয় বাতাস হয় চখাচখির বিবাহ হয়,
বড় সুখের এই বিবাহ কোনদিন ভাঙার নয়।"

বারান্দায় বালতি পেতে বৃষ্টির পানি ধরা হচ্ছে। সেই পানিতে মুখ ধুয়ে রফিক শেফার সামনের চেয়ারে বসল। শেফা খাতা থেকে মুখ না তুলে বলল, স্যার আপনে যে রূপার মেডেল পেয়েছেন, সেই মেডেলে কি লেখা জানেন ?

'না, কি লেখা ?'

'খাদিজা খাতুন রৌপ্য-পদক। খাদিজা হলেন আমাদের জালাল সাহেবের মা।'

'ও।'

'উনি তাঁর মা'র নামে, বাবার নামে, তাঁর দাদার নামে অনেক রূপার মেডেল বানায়ে ঘরে রেখে দিয়েছেন। কেউ কিছু করলেই তারে একটা রূপার মেডেল দিয়ে দেন।'

'তাই নাকি ?'

'একবার তাঁর বাড়িতে ভিক্ষা করতে এক ফকির এসেছে। এই ফকির আবার কান নাড়াতে পারে। চোখ বন্ধ করে সে গরুর মতো নিজের দুই কান নাড়ায়। সেই কান নাড়ানো দেখে জালাল সাহেব তাঁকেও একটা মেডেল দিয়েছেন। খাদিজা খাতুন রৌপ্য-পদক।'

রফিক হেসে ফেলল। শেফা গম্ভীর মুখে বলল, আপনাকে হাসানের জন্যে ঘটনাটা বলি নাই। আসলেই দিয়েছেন। এখন সেই ফকির গলায় মেডেল ঝুলায়ে ভিক্ষা করে। সে হয়েছে মেডেল পাওয়া ভিক্ষুক।

শেফার মুখ গম্ভীর। রফিক হাসছে। সে হাসতে হাসতেই বলল—তোমার অদ্ভুত গুণ কি জান শেফা ? তোমার অদ্ভুত গুণটা হচ্ছে—তুমি খুবই হাসির কথা মাঝে মাঝে বল কিন্তু একটুও হাস না। তখন তোমাকে রোবট মনে হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট। অষ্টম ধারার রোবট। যার নিজের কোন ইমোশন নেই কিন্তু অন্যের ইমোশন সম্পর্কে সে জানে।

শেফা বলল—এইসব কি হাবিজাবি বলতেছেন ?

'তোমাকে মনে হয় তুমি শেফা না তুমি আসলে শেফ্।'

'আমি আসলে কি ?'

'শেফ্। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট। তোমার মাথায় ব্রেইনের বদলে আছে কপোট্রন।'

শেফা খাতা বন্ধ করে বলল—মাঝে মাঝে আপনে পাগলের মতো কথা বলেন। মাঝে মাঝে আপনাকে পাগল মনে হয়।

'তোমার কাছে মনে হয় আমি পাগল ?'

'সবসময় মনে হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়। একদিন দুপুরবেলা আপনি ঘুমাচ্ছেন—আমি কি কাজে যেন আপনার ঘরে ঢুকেছি। ও আচ্ছা মনে পড়েছে—টেবিলের ওপর অংকের বইটা ফেলে গিয়েছিলাম, সেই বই নিতে গিয়েছি—হঠাৎ তাকায়ে দেখি ঘুমের মধ্যে আপনি ছটফট করতেছেন। একবার এপাশ ফিরেন আরেকবার ঐপাশ ফিরেন। আপনার কপালে ঘাম। আপনি বিড়বিড় করে কথাও বলতেছেন।'

'কি কথা ?'

'কি কথা তা বলতে পারব না। আমি তো আর কথা শুনার জন্যে আপনার কাছে যাই নাই। অংকের বই নেয়ার জন্যে গিয়েছিলাম। বই নিয়ে চলে গিয়েছি।'

'যে কথা শুনেছিলে তার একটা-দু'টা শব্দও কি মনে নাই ?'

'না।'

'আবার যদি কখনো এরকম দেখ—মন দিয়ে শুনবে। আমি ঘুমের মধ্যে কি বলছি মনে রাখার চেষ্টা করবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে দমকা বাতাস হল। হারিকেন নিভে গেল। শেফা মনে মনে বলল, বাতি নিভেছে বেশ হয়েছে। অন্ধকারই ভাল। এই অন্ধকারে হাত বাড়ালেই মানুষটাকে ছোঁয়া যাবে। মানুষটা ভাবতেও পারবে না এই কাজটা শেফা ইচ্ছা করে করেছে। শেফা এমন কোন খারাপ মেয়ে না যে ইচ্ছা করে পুরুষ মানুষ ছুঁয়ে দেবে। কিন্তু খারাপ মেয়ে হতে ইচ্ছা করছে। শেফার খানিকটা কান্না পেয়ে গেল। তার কি কোন অসুখ করেছে? খারাপ ধরনের কোন অসুখ। যে অসুখে মানুষকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। যে অসুখে কারণ ছাড়াই কান্না পায়। মানুষটা যখন সামনে থাকে তখন কান্না পায়, যখন সামনে থাকে না তখনও কান্না পায়।

শেফা খুবই আশ্চর্য বোধ করছে। ঘরে এতক্ষণ হল বাতি নেই অথচ তার মা ছুটে আসছেন না। জ্বলন্ত হারিকেন নিয়ে তার মা'র তো ইতিমধ্যেই ছুটে চলে আসার কথা। বিদ্যুৎ চমকাল। শেফা বিদ্যুতের আলোয় দেখল মানুষটা মাথা নিচু করে বসে আছে। মনে হচ্ছে কোন কিছু নিয়ে মানুষটা চিন্তিত। তার এত কিসের চিন্তা? এই পৃথিবীতে চিন্তা করে কিছু হয় না। যা হবার তা চিন্তা করলেও হবে চিন্তা না করলেও হবে। তার কথাই ধরা যাক-না কেন—সে জানে সে মেট্রিকে পাস করতে পারবে না। খুব কম করে হলেও তিনটা বিষয়ে ফেল করবে। তার জন্যে সে তো গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসে নি। চিন্তা করলে যদি পাস হত তাহলে চিন্তা করত।

আলো হাতে কে যেন আসছে। শেফা ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। অনেকক্ষণ সে অন্ধকারে ছিল এর মধ্যে হাত বাড়িয়ে একটু ছুঁয়ে ফেললেই হত। এ রকম কি আর কখনো হবে? আর কখনো কি হারিকেন নিভে যাবে? শেফার কান্না পাচ্ছে। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছে। কান্না এমনই জিনিস যে চাপার চেষ্টা করলে কান্না বেড়ে যায়। শেফা কান্না আটকাতে পারল না। মা হারিকেন নিয়ে এসে যদি দেখেন শেফার চোখে পানি ওম্নি তিনি দুইএ দুই চার না বানিয়ে বাইশ বানিয়ে ফেলবেন। রাতে ঘুমুবার সময় হেন-তেন শতেক প্রশ্ন। কাঁদছিলি কেন? ঘটনা কি?

আমেনা বেগম হারিকেন হাতে ঘরে ঢুকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাকালেন রফিকের দিকে। শান্ত গলায় বললেন, রফিক তোমার খুঁজে কে জানি আসছে। বাংলাঘরে বসছে।

রফিক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আমেনা বেগম বললেন, তোমার চাচা মাগরেবের ওয়াক্তে তোমার খুঁজ করেছিলেন। তোমাকে নিয়ে নামাজে যাবার ইচ্ছা ছিল। তিনি সামান্য রাগ করেছেন।

রফিক বিড়বিড় করে বলল, শরীরটা ভাল না। শুয়েছিলাম, কখন ঘুমায়ে পড়েছি বুঝতে পারি নাই।

আমেনা বেগম বললেন, যাও দেখে আস কে আসছে।

রফিক ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমেনা বেগম মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই আমার ঘরে আয়।

শেফা বলল, তোমার ঘরে যাব কেন ?

'কথা আছে।'

'কথা এইখানে বল। আমি পড়তে বসেছি। পড়া ছেড়ে উঠতে পারব না।'

'তুই কাঁদছিলি কেন ?'

'ইচ্ছা হয়েছে এই জন্যে কাঁদতেছি।'

'বাঘবন্দি খেলা আমার সাথে খেলবি না। তুই এমন কোন বড় খেলোয়াড় না। কি হয়েছে বল। এমন কি ঘটনা ঘটেছে যে চোখে পানি।'

'কিছুই ঘটে নাই।'

'এমন কিছু কি ঘটেছে যে আমাকে বলা যাবে না ? অন্ধকারে এই ছেলে কি গায়ে হাত-টাত দিয়েছে ?'

'না।'

'বল কোথায় হাত দিয়েছে ?'

'বললাম তো—না।'

'না-টা এমন চাপা গালায় বলতেছিস কেন ?'

'আমি স্বাভাবিকভাবেই বলেছি। তোমার কাছে মনে হচ্ছে চাপা গলা।'

'এই মাস্টারের কাছে তুই আর পড়বি না।'

'আচ্ছা।'

'তোর বাবাকে বলব তার এই বাড়িতে থাকারও দরকার নাই।'

'আচ্ছা।'

'তুই আর কখনো এই ছেলের সামনে পড়বি না।'

'আচ্ছা।'

'এখন উঠে আয়। এই মাস্টারের কাছে যখন আর পড়তে হবে না, তখন আর ঘরে থাকার দরকার কি ?'

শেফা বই-খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মা'র সঙ্গে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, মা তোমার প্রতিটি কথাই আমি শুনেছি। এখন আমি তোমাকে একটা কথা বলব। এই কথাটা তোমাকে শুনতে হবে।

আমেনা বেগম ভীত গলায় বললেন, কথাটা কি ?

শেফা সহজ ভঙ্গিতে বলল, মা আমি উনাকে বিয়ে করব। তুমি ব্যবস্থা করে দাও। বাবাকে বলে ব্যবস্থা কর।

আমেনা বেগম অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি একটু আগে মেয়েকে বলেছেন—সে কোন বড় খেলোয়াড় না। এখন মনে হচ্ছে এই মেয়ে অনেক বড় খেলোয়াড়। এই মেয়ের সঙ্গে বাঘবন্দি খেলা যাবে না।

শেফা হঠাৎ অতি নাটকীয় এক কাণ্ড করে বসল, হাত থেকে বই-খাতা ফেলে ধপ করে বসে পড়ে মা'র পা জড়িয়ে ধরল। পায়ের পাতায় মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, মা তুমি আমাকে বাঁচাও। উনাকে বিয়ে না করতে পারলে আমি মরে যাব।

রফিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জালাল সাহেবের জামাই ফরহাদ খান। ফরহাদ খান একা আসেন নি। তাঁর সঙ্গে তিনজন আছে। একজনের হাতে হারিকেন। অন্য দু'জন খালি হাতে থাকলেও তাদের গায়ের চাদরের নিচে কিছু একটা আছে। তারা প্রায়ই চাদরের নিচে হাত দিচ্ছে এবং হাত বের করে আনছে। জালাল খান নিজে কখনো বাডিগার্ড ছাড়া চলাফেরা করেন না। জামাই-এর ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা রেখেছেন। অস্ত্রধারী দুইজন বাংলাঘরের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে। তারা দু'জনই অত্যন্ত ভীত। কারণ তারা শুধু যে ইয়াসিন সাহেবের এলাকায় আছে—তা না, তারা ইয়াসিন সাহেবের বাংলাঘরে আছে। বলতে গেলে বাঘের ঘরে বাস।

বাংলাঘরে চেয়ার-টেবিল আছে, একপাশে পাটি পাতা খাটও আছে। রফিক বসে আছে খাটে। ফরহাদ খান একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসেছেন। ফরহাদ খানের হাতে কিছু কাগজপত্র এবং কলম। ফরহাদ খানের সঙ্গে আসা হারিকেনধারীও ঘরে আছে। সে তার হারিকেন হাতছাড়া করে নি। হারিকেন উঁচু করে ধরেছে যাতে হারিকেনের আলো রফিকের মুখে পড়ে। এই হারিকেন ছাড়াও ঘরে আরো একটা হারিকেন আছে। বাংলাঘরের টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। ফরহাদ খান উঁচু গলায় কথা বলছেন। রফিক নিচু স্বরে জবাব দিচ্ছে বলে ফরহাদ সাহেবকে উত্তর শোনার জন্যে প্রতিবারই ঝুঁকে কাছে আসতে হচ্ছে।

'রফিক সাহেব কেমন আছেন ?'

'জ্বি ভাল।'

'আজ আপনার অংক করা দেখলাম। বিস্মিত হয়েছি বললে কম বলা হবে। বিস্মিত হয়েছি আবার নিজের মধ্যে কিছু কনফিউশনও আছে। আমি সেই

কনফিউশনগুলি দূর করতে এসেছি। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আপনি কি জবাব দেবেন ?'

রফিক হ্যাঁ-সূচক ঘাড় কাত করল। ফরহাদ খান বললেন, আমি এই কাগজে এগারোটা সংখ্যা লিখছি, একটু তাকান সংখ্যাটির দিকে।

রফিক তাকাল। কাগজে লেখা—৮৭৯০০৪২১৬৭৩।

ফরহাদ খান কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, সংখ্যাগুলি কি আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে ?

রফিক বলল, জ্বি হয়েছে।

'এক থেকে ন'য়ের ভেতরে একটা ডিজিট এখানে নেই। সংখ্যাটা কি ?'

'পাঁচ।'

'সংখ্যাগুলি উল্টালে কত হবে ?'

'৩৭৬১২৪০০৯৭৮।'

'এর বর্গমূল কত হবে ? মূল সংখ্যাটার। উল্টানোটার না।'

'এর বর্গমূল ১৯৩৯৩৯ দশমিক ১৬৮২।'

'ঘনমূল বলতে পারবেন ? ঘনমূল জানেন তো ?'

'জ্বি জানি। এর ঘনমূল হল ৩৩৫০ দশমিক ৫০৫৬।'

'রফিক সাহেব আপনি যে একজন বিস্ময়কর মানুষ তা কি আপনি জানেন ?'

'জ্বি জানি।'

'আপনার পড়াশোনা কি ?'

'আমি বি.এস-সি পাস করেছি।'

'রেজাল্ট কি ছিল ?'

'ভাল ছিল না। সেকেন্ড ডিভিশান।'

'এখন করছেন কি ?'

'আমি মূলারদি গার্লস হাইস্কুলে পার্ট টাইম অংক করাই।'

'আপনার কি কোন ছবি আছে ?'

'পাসপোর্ট সাইজ দু'টা ছবি আছে।'

'আপনি একটা ছবি আমাকে দেবেন, আমি আপনাকে নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখে ভোরের কাগজে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'শুরুতে আপনাকে যে সংখ্যাগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি কি আপনার মনে আছে ?'

'জ্বি মনে আছে, ৮৭৯০০৪২১৬৭৩।'

'এই সংখ্যাগুলির একটা বিশেষত্ব আছে—সেটা বলতে পারবেন ?'

'এর কোন বিশেষত্ব নাই। এটা মৌলিক সংখ্যা না। তিন দিয়ে ভাগ করা যায়।'

ফরহাদ খান নিজের বিস্ময়বোধ চাপা দেবার জন্যে সিগারেট ধরালেন।

ভেতরের বারান্দায় ইয়াসিন সাহেব তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি বাংলাঘরের বারান্দায় হাঁটাহাঁটিতে ব্যস্ত দুই বডিগার্ডকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা ভীত মুখে সামনে দাঁড়িয়ে। ইয়াসিন সাহেব বললেন, তোমরা আছ কেমন ?

তাদের একজন খুকখুক করে কাশতে কাশতে বলল—'যেমন দোয়া করেছেন।'

'উল্টাপাল্টা কথা বলবা না ? তোমাদের জন্যে আমি দোয়া করব কি জন্যে। ভাল কথা গরমের মধ্যে চাদর গায়ে কেন ?'

'শরীরটা খারাপ।'

'দুই জনেরই একসঙ্গে শরীর খারাপ ?'

তারা জবাব দিল না। ইয়াসিন সাহেব নীরবে কিছুক্ষণ তামাক টানলেন। তারপর হুক্কার নল নামিয়ে সহজ গলায় বললেন, তোমাদের চাদরের নিচে কি আছে আমি জানতে চাই না। তোমরা যে চাদরের নিচে জিনিস নিয়া আমার সাথে দেখা করতে এসেছ এতে আমি বড়ই অবাক হয়েছি। তোমরা উঠানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াও। কানে ধরে পঞ্চাশবার উঠবোস কর। যাও। এতে যদি আমার রাগ কমে তো কমল, না কমলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

তারা কোন রকম আপত্তি করল না। উঠোনে নেমে উঠবোস শুরু করল। ইয়াসিন সাহেব অন্দরে ঢুকলেন। জালাল সাহেবের জামাই এসেছেন। বিশিষ্ট মেহমান। জালাল সাহেবের জামাই মানে এই অঞ্চলের জামাই। তার মর্যাদা অন্যরকম। কাজেই নতুন জামাই এর আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঘরে মিষ্টি আছে কিনা কে জানে। না থাকলে আনাতে হবে।

আমেনা বেগম আজ রাতে স্বামীর সঙ্গে ঘুমুতে এসেছেন। সপ্তাহে একদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। আজ সপ্তাহের সেই দিন না। ইয়াসিন ভুরু কুঁচকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আমেনা বেগম লজ্জিত গলায় বললেন—শেফা বলেছে আজ সে একা ঘুমাবে।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, ও। বলেই তিনি পাশ ফিরলেন। ঘুমুবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর মাথা আজ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। জালাল সাহেবের দুই চাদরওয়ালাকে উঠবোস করানো হয়েছে। জালাল সাহেব এই অপমানের শোধ

নিবেন না তা হয় না। ঘটনা ঘটবে। কিভাবে ঘটবে কে জানে। যে ভাবেই ঘটুক, ঘটনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমেনা বেগম বললেন, ঘুমায়ে পড়েছেন ?

ইয়াসিন সাহেব বললেন, না। কিছু বলবা ?

'শেফার মাস্টারের বিষয়ে দু'টা কথা ছিল।'

'কি কথা ?'

'ছেলেটারে আমার বড়ই পছন্দ। বাপ-মা মরা ছেলে। দেখলেই আদর লাগে। এইসব ছেলে খুবই আদরের কাঙ্গাল হয়। ছেলের আদব-লেহাজ ভাল।'

ইয়াসিন সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন—কথা যা বলবা পরিষ্কার করে বলবা। প্যাঁচ দিয়া বলবা না। প্যাঁচের কথা আমার ভাল লাগে না। ঘটনা কি ?

'কোন ঘটনা না।'

'এই ছেলের সাথে কন্যার বিবাহ দিতে চাও ?'

আমেনা বেগম স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বললেন—বিবাহ হলে খুবই ভাল হয়। ছেলেটা আমার খুবই পছন্দের। চেহারা-ছবিও মাশাল্লাহ ভাল।

ইয়াসিন সাহেব সহজ গলায় বললেন, ঠিক করে বল। ছেলে তোমার পছন্দ না-কি তোমার কন্যার পছন্দ।

'আমার খুব পছন্দ। শেফাও তারে মোটামুটি ভাল পায়।'

'আমেনা !'

'জ্বি।'

'আমার সাথে প্যাঁচ খেলবা না। আমি সোজা-সরল মানুষ। ঘটনা কি পরিষ্কার করে বল।'

আমেনা বেগম ভীত গলায় বললেন, কোন ঘটনা না।

ইয়াসিন সাহেব বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, আমি প্রশ্ন করতেছি তুমি জবাব দাও। উল্টাপাল্টা জবাব দিবা না, থাপ্পড় খাইবা। মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা আমার খুবই অপছন্দ। কিন্তু প্রয়োজনে হাত তুলতে হবে। উপায় কি ? এখন বল ছেলে কি তোমার কন্যার পছন্দ ?

'হুঁ।'

'তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিতে চাইতেছ, কারণ কি ? কোন ঘটনা ঘটেছে ? কোন ঘটনার কথা বলতেছি বুঝতে পারতেছ ? নাকি আরো খোলাসা করে বলব।'

'না না ছিঃ।'

'ছেলের জন্মের কোন ঠিক নাই—এতিমখানায় বড় হয়েছে। এটা জান ?'

'জানি।'

'তার মৃগী রোগ আছে এটা জান?'

'তারপরেও কি করে বললা, এই ছেলে তোমার বড়ই পছন্দ।'

'মেয়ের মুখের দিকে তাকায়ে বলেছি। মেয়ে দেওয়ানা হয়েছে।'

'বুঝ দিলে বুঝ মানবে?'

'না।'

'এই অবস্থা?'

'জ্বি।'

'কোন ঘটনা ঘটে নাই তুমি নিশ্চিত?'

'জ্বি।'

'ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা নিতেছি। দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নাই।'

ইয়াসিন সাহেব বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমেনা বেগম ভয়ে-ভয়ে বললেন, কি ব্যবস্থা নিবেন।

'আমি কি ব্যবস্থা নেই সেটা আমার বিষয়। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আমার পছন্দ না। আমার সঙ্গে যে তোমার কথা হয়েছে এটাও শেফাকে বলবা না। সে যেন কিছুই না জানে।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনি ছেলেটারে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেন।'

ইয়াসিন সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন—চলে যেতে বললে লাভ হবে না। তোমার কন্যা তাকে খুঁজে বের করবে। তোমার কন্যার মনের অবস্থা আমি তোমার আগেই টের পেয়েছি। তোমারে কিছু বলি নাই। একেক রোগের একেক চিকিৎসা। জ্বর হলে মাথায় পানি ঢালতে হয়। শরীর পচন ধরলে পচা অংশ ফেলে দিওয়া লাগে। এইটাই নিয়ম। শরীর নীরোগ রাখার জন্য অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। এখন যাও মেয়ের সাথে ঘুমাও। আমার সঙ্গে ঘুমানোর দরকার নাই।

আমেনা বেগম মেয়ের সঙ্গে ঘুমুতে গেলেন। সারারাত তাঁর একফোঁটা ঘুম হল না।

বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন বসেছে। কাউন্সিলপ্রধান মহান বিজ্ঞানী এমরান টি। যৌবনে তিনি পদার্থবিদ্যার অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছেন। কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে তাঁর কাজ তুলনাহীন। হঠাৎ গবেষণার ক্ষেত্র পরিবর্তন করে টাইম প্যারাডক্স নিয়ে মেতে ওঠেন। জার্নালে শতাব্দীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত আবিষ্কার হিসেবে এই বিষয়ে দু'টি গবেষণা প্রকাশিতও করেন। তারপর হঠাৎ থেমে যান। তাঁর বাড়ি থেকে বিজ্ঞানবিষয়ক সব বইপত্র সরিয়ে ফেলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গুজব হচ্ছে তিনি এখন ছড়া রচনার ব্যাপারে আগ্রহবোধ করছেন। খাতার পর খাতা ছড়া লিখে ভরিয়ে ফেলছেন। তাঁর বয়স একশ'র উপরে কিন্তু কথাবার্তা চালচলনে তারুণ্য ঝলমল করছে। আজ তিনি মেরুন রঙের কোট পরেছেন। কোটের সোনালি বোতাম চকচক করছে। এই সময়ের ফ্যাশনে মাথার চুলের সঙ্গে বড় রুমাল আটকে দিয়েছেন। বিশেষ ধরনের এই রুমাল বাতাস ছাড়াই সারাক্ষণ কাঁপতে থাকে। এমরান টি যে রুমালটি পরেছেন তার রং ঘন সবুজ। এই রঙের রুমাল অল্পবয়েসী কিশোরীরা মাথায় দেয়। উদ্ভট যে-কোন কিছু করার ব্যাপারে এমরান টির সীমাহীন আগ্রহ। বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন উদ্ভট কোন কর্মকাণ্ডের জন্যে উপযুক্ত জায়গা না। কিন্তু মহান বিজ্ঞানী এমরান টি তাঁর পাগলামি দেখানোর জন্যে বিশেষ অধিবেশনগুলিই বেছে নেন। বিজ্ঞানীরা বিরক্ত হন। এমরান টি মানুষের বিরক্ত মুখ দেখতে পছন্দ করেন।

বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিলের সকল সদস্য বিজ্ঞানীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। যারা অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেন না তাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত কম্পিউটার অংশগ্রহণ করে। মানুষ-বিজ্ঞানী ছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারদের দু'জন প্রতিনিধি থাকে। তাদের কোন ভোটাধিকার থাকে না। পৃথিবী নিয়ন্ত্রক মূল কম্পিউটার সিডিসি থাকে। সিডিসির ভোটাধিকার আছে। ক্ষমতার দিক দিয়ে এমরান টির পরের স্থানটিই সিডিসির। তবে বিজ্ঞান কাউন্সিলের নেয়া কোন সিদ্ধান্তে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা সিডিসির নেই।

অধিবেশন কক্ষে নীল আলো জ্বলছে। নীল আলো মুছে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলে উঠলেই অধিবেশন শুরু হবে। নীল আলো হল প্রস্তুতিমূলক আলো। বিজ্ঞানীরা তাদের কাগজপত্র গুছিয়ে নেবেন। আজকের আলোচনার এজেন্ডাগুলি দেখবেন। আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ভালমত জানার জন্যে সিডিসির সাহায্য চাইবেন।

আজকের আলোচ্য বিষয় একটাই রেফ্ নামক মানুষটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিশেষ অধিবেশন কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বিষয়ক অধিবেশনে সময় খুব কম লাগে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সিডিসির উপর দিয়ে দেয়া হয়। মানুষ অতি সাধারণ সিদ্ধান্তও চট করে নিতে পারে না। কম্পিউটার পারে।

এমরান টি তাঁর মাথার সবুজ রুমাল নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি টুপিটা একবার এদিকে পরছেন আরেকবার অন্যদিকে পরছেন।

এমরান টি'র পাশের চেয়ারে সিডিসি বসে আছে। সিডিসিকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে সে মানব সম্প্রদায়ের কেউ না। গত একশ' বছরে রোবট প্রযুক্তির সীমাহীন উন্নতি হয়েছে। সিডিসি দশম ধারার রোবটের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে।

এল এফ সিরিজের সব রোবটই মানুষের মতো। ম্যাগেনেটিক ফিল্ড ডিটেকটর ছাড়া এই সিরিজের রোবটদের মানুষের কাছ থেকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। সিডিসি শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। এমরান টি'র রুমাল নিয়ে বাড়াবাড়ির দৃশ্যটি মাঝেমধ্যে দেখছে। তখনই তার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে।

এমরান টি বললেন, সিডিসি আমার রুমালের রঙটা মনে হয় তোমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি যতবারই আমাকে দেখছ ততবারই ভুরু কুঁচকাচ্ছ।

সিডিসি বলল, আপনার রুমালের রং চমৎকার। যদিও এই রঙের রুমাল কিশোরীরা ব্যবহার করে, তাতে আমি আমার দিক থেকে কোন সমস্যা দেখি না।

'তাহলে তুমি ভুরু কুচঁকাচ্ছ কেন ?'

'অন্য বিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাচ্ছেন। আমি তাদের অনুকরণ করছি। এর বেশি কিছু না।'

'তুমি অনুকরণ করছ কেন ?'

'বাহ্যিক আচার-আচরণে মানুষকে অনুসরণ করার জন্যে একটি সফটওয়ার আমাদের মধ্যে আছে। মানুষের কাছাকাছি যেতে হলে তাকে অনুকরণ করতেই হবে।'

'খুব ভাল।'

'আপনি কি সফটওয়ারটি বিষয়ে জানতে চান?'

'না—অর্থহীন সফটওয়ার নিয়ে আমার আগ্রহ নেই। রুমালের রং কি সত্যি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'অন্যদের পছন্দ হচ্ছে না কেন?'

'আপনি কি সত্যি জানতে চান? জানতে চাইলে কারণগুলি বলতে পারি তবে আমার মনে হচ্ছে না কারণ জানার ব্যাপারে আপনি আগ্রহী।'

'তুমি ঠিকই বলেছ আমি আগ্রহী না।'

সিডিসি গলার স্বর নিচু করে বলল, মহামতি এমরান। আপনি কি কোন অজানা কারণে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত?

'আমি হাসছি, মাথার রুমাল নিয়ে খেলছি। তারপরেও তোমার কেন মনে হল আমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ?'

'আপনার হাসি-খুশির মধ্যে মেকি অংশ আছে বলেই বলছি। আপনি হা করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। কারো চোখে চোখ পড়া মাত্রই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আপনার চোখের পাতা যেভাবে পড়ে, তারচে' ত্রিশ ভাগ দ্রুত পড়ছে। আপনার শরীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড আমি যতটুকু জানি তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আপনি খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত।'

টুন করে ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ হল। হলঘরের নীল আরো সবুজ হয়ে গেল। এমরান টি মাথার রুমাল ঠিক করতে করতে বললেন, বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এ বছরের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন। কাউন্সিলের একশ' সদস্যদের সবাই সশরীরে উপস্থিত। এটি আনন্দময় ঘটনা। আমি সিডিসিকে এখন বিশেষ অধিবেশনের কারণ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

সিডিসি উঠে দাঁড়াল। সামান্য হাসল। অবিকল মানুষদের মতো নার্ভাস ভঙ্গিতে কয়েকবার কাশল। শাদা কোটের পকেট থেকে টকটকে লাল রুমাল বের করে ঠোঁট মুছে তার কথা শুরু করল।

সম্মানিত বিজ্ঞান কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। মহামান্য এমরান টি। আজকের বিশেষ অধিবেশনের উপর প্রতিবেদন আমি এক্ষুণি আপনাদের জানাচ্ছি। আপনাদের যে-কোন প্রশ্নের জবাব আমি প্রতিবেদন পেশ করার সময়ই দেব। বিশেষ অধিবেশনের নিয়ম-অনুযায়ী প্রতিবেদন শেষ হবার পাঁচ মিনিটের ভেতর

আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। এখন আমি শুরু করছি। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আমার ডানপাশে হলোগ্রাম মনিটারটির দিকে।

সিডিসির ডানপাশের হলোগ্রাম মনিটারে কাজ করা শুরু হল। মনিটারটি একটি ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করল। সেই ছবিতে দেখা গেল রেফ্‌কে। সে চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে জানালায় সমুদ্র দেখার চেষ্টা করছে। হলোগ্রামের ছবি যেমন হয়ে থাকে রফিকের ছবিটি সে-রকম। বোঝার কোন উপায়ই নেই যে যা দেখা যাচ্ছে তা ত্রিমাত্রিক ছবি। মনে হচ্ছে বাস্তবের মানুষটি এখানে সরাসরি উপস্থিত। তার নিশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে।

'যাকে আপনারা দেখছেন তার নাম রেফ্। সে বিজ্ঞান কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চার বছর ধরেই তার চিকিৎসা চলছে। তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তার চিকিৎসক নিউরো বিশেষজ্ঞ মতামত দেবেন। তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন হলোগ্রাম মনিটারের মাধ্যমে। তাঁকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না।'

রফিকের ছবি মুছে গেল সেখানে প্রফেসর বার্নকে দেখা গেল। হাসিখুশি একজন বৃদ্ধ। নিজের খাসকামরায় বসে আছেন। হাতে কফির মগ। সামনে প্রচুর অগোছালো ফাইলপত্র। প্রফেসর ব্লেয়ার হাতের মগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—

রেফ্‌কে চার বছর আগে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বিজ্ঞান কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত স্যানিটোরিয়ামে ভর্তি করা হয়। কাউন্সিলের নির্দেশে আমাকে এই রোগীর প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হয়। রোগী এক বিচিত্র স্নায়ু-বৈকল্যে ভুগছে। এই স্নায়ু-বৈকল্যের লক্ষণ হল স্থান-কাল সম্পর্কিত ভ্রম। রোগী কখনো ভাবছে সে এখানে আছে আবার কখনো ভাবছে এখানে নয় অন্য কোথাও বাস করছে। সাইকাডেলিক ড্রাগ যেমন LSD গোত্রীয় ড্রাগে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে সেই অবস্থা স্থায়ী হয় না। রক্তে ড্রাগের মাত্রা কমে গেলে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। রোগীর অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। চিকিৎসায় এই রোগ আরোগ্যের কোন আশা নেই। রোগীর বিষয়ে এরচে' বেশি বলার কিছু নেই। এই স্নায়ু-বৈকল্য চিকিৎসায় যে-সব ড্রাগস এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ ফাইল নাম্বার MS001-525-PS005 QLPতে দেয়া আছে। যারা আগ্রহী তারা ফাইল দেখতে পারেন।

হলোগ্রামের ছবি মুছে গেল। সিডিসি উঠে দাঁড়াল। সে আবারো শাদা কোটের পকেট থেকে টকটকে লাল রুমাল বের করে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল,

রেফের মানসিক সমস্যার ধরনটা আমি সামান্য ব্যাখ্যা করি। যদিও আমি জানি ব্যাখ্যার তেমন প্রয়োজন নেই। রেফ্ নিজে নিশ্চিত নয় তার কোন জগৎটা সত্যি জগৎ। কখনো সে ভাবছে তার এই জগৎটা সত্যি, সে রেফ্। যে রোবট তার দেখাশোনা করছে তার নাম শেফ। আবার কখনো ভাবছে সে আসলে রফিক। যে মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় তার নাম শেফা। আমার যা বলার আমি বললাম। যেহেতু আপনারা কেন প্রশ্ন করছেন না ? আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের আর কিছু জানার নেই। কাজেই এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময়। আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন এই রোগীর বিষয়ে কি করা হবে। আমরা কি তার চিকিৎসা আরো চালিয়ে যাব ? নাকি ধ্বংস করে দেয়া হবে ? সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হল না, তার আগেই একশ'জন বিজ্ঞানীদের সবাই বললেন—ধ্বংস করে দেয়া হোক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট দু'জন বিপক্ষে রায় দিল। তাদের ভোটাধিকার নেই। তাঁরা হ্যাঁ বা না বলতে পারে তবে ভোটাভুটির মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাদের হ্যাঁ-না বাতিল হয়ে যায়।

হলঘরের সবুজ আলো নিভে গিয়ে নীল আলো জ্বলে উঠল। অধিবেশন শেষ হয়েছে। বিজ্ঞানীরা উঠতে শুরু করবেন এমন সময় এমরান টি উঠে দাঁড়ালেন। অধিবেশন শেষ হবার পর কিছু ধন্যবাদ-সূচক কথা বলতে হয়। এমরান টি প্রায় যন্ত্রের মতো বললেন—

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে আপনারা সহায়তা করেছেন। কাউন্সিলের নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

কাউন্সিল সদস্যদের প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা কি ধরে নিতে পারি বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়েছে ?

এমরান টি বললেন, হ্যাঁ ধরে নিতে পারেন। অধিবেশন সমাপ্তির ঘোষণা অবশ্যি আমার কাছ থেকে আসবে না। এই ঘোষণা কাউন্সিলের নিয়মানুযায়ী সিডিসি দেবে। আমি সিডিসিকে অধিবেশন শেষ করার ঘোষণা দেবার জন্যে অনুরোধ করছি।

সিডিসি উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে ঠোঁট মুছল। সে শান্ত গলায় বলল,

অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার আগে আমি একটি আপাতত তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহান বিজ্ঞানীদের বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই যে তুচ্ছ বিষয়ও মাঝেমধ্যে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণ দিয়ে বলি

এই পৃথিবীতে এডলফ হিটলার নামের এক ব্যক্তি বহুকাল আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করেছিলেন। মানবজাতির বিরাট একটা অংশ এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অতি তুচ্ছ একটি কারণ ঘটিয়ে এই ভয়ংকর যুদ্ধ বন্ধ করা যেত।

কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি বললেন—তুচ্ছ কারণটা ব্যাখ্যা করুন।

অসংখ্য তুচ্ছ কারণ উল্লেখ করতে পারি। যেমন ধরা যাক যে রাতে হিটলারের বাবা এবং মা'র সামান্য ঝগড়া হল। হিটলারের পিতা কফি চেয়েছিলেন। সেই কফি ঠাণ্ডা হওয়ায় হিটলার-জনক সামান্য রাগলেন। এবং রাগ নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। ধরে নিন এটি হচ্ছে সেই বিশেষ রাত যে রাতে মাতৃগর্ভে হিটলার নামক মানুষটির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হবে। কফি গঠিত জটিলতায় প্রক্রিয়াটি শুরু হল না। তাহলে দাঁড়াল কি ? এককাপ কফি সামান্য ঠাণ্ডা হবার কারণে পুরো মানবজাতি ধ্বংসের মুখোমুখি চলে গেল।

পদার্থবিদ ফেনটাং বিরক্ত গলায় বললেন, সিডিসি আপনি মূল বিষয়ে কথা বলুন।

সিডিসি ঠাণ্ডা গলায় বলল, মহান পদার্থবিদ ফেনটাং আমি মানব প্রজাতির কেউ না। আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার। মূল সমস্যা থেকে দূরে সরে যাবার প্রবণতা মানবজাতির ভেতরই দেখা যায়। আমার মধ্যে এই প্রবণতা থাকার কথা নয়। আমি মূল বিষয়েই আছি। আমি বলার চেষ্টা করছি যে আপাতত অতি তুচ্ছ বিষয়ও পরে ভয়ংকর বিষয় হিসেবে দেখা দিতে পারে।

আমরা অতি দ্রুত রেফ্ নামের মানুষটির ধ্বংসের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলাম। মহান বিজ্ঞান কাউন্সিলের কাছে এটি খুবই তুচ্ছ বিষয়। বিজ্ঞান কাউন্সিলকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে। চিকিৎসার-অতীত মানসিক রোগীকে ধ্বংস করার আইন আছে। একমাত্র বিজ্ঞান কাউন্সিলই এই আইন প্রয়োগ করতে পারে। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইনগত কোন জটিলতা নেই।

আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানসিক রোগীদের বিষয়ে প্রবল ভীতি কাজ করছে। এক সময় ছিল যখন তাদের পুড়িয়ে মারা হত। আবার একটা সময় ছিল যখন তাদের বস্তায় ভরে সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হত। পরবর্তিতে মানবসমাজ সামান্য সহনশীলতা দেখায়, তারা মানসিক রোগীদের মেরে না ফেলে অপরাধীদের যেভাবে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা হত সেভাবে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করে। প্রায় একশ বছর এই ব্যবস্থাটি চালু থাকে। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আবারো মানসিক রোগীদের ধ্বংস করে ফেলার আইন পাস হয়। কিছুক্ষণ আগে আপনারা এই আইনই প্রয়োগ করলেন।

এমরান টি বললেন, তাতে সমস্যাটা কি ?

সিডিসি বলল, কোন সমস্যা নেই।

'সমস্যা না থাকলে দীর্ঘ বক্তৃতার কারণ কি ?'

'দীর্ঘ বক্তৃতার কারণ হল, আমি শুধু বর্তমানের সমস্যা দেখি না, ভবিষ্যতের সমস্যাও দেখি—আমার মধ্যে একটি সফটওয়ার আছে ফোর্থ অর্ডার প্রবাবিলিটি ভেক্টর এনালিসিস প্রোগ্রাম। এই সফটওয়ারের সাহায্যে আমি যে-কোন বর্তমান ঘটনাকে ভবিষ্যতের কো-অর্ডিনেটে ফেলতে পারি।'

'খুবই ভাল কথা।'

'শুধু এইটি ফেলতে পারছি না।'

'পারছ না কেন ?'

'ফোর্থ অর্ডার প্রবাবিলিটি ভেক্টর এনালিসিস মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের ক্ষেত্রে কাজ করে না।'

'এটা জানা ছিল না।'

সিডিসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা বলা শুরু করল। তবে এবারে সে ঠোঁট মুছল গাঢ় সবুজ রঙের রুমাল দিয়ে।

আমি আরেকটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। আমি অতি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত যত মানসিক রোগী আছে তাদের সবার কেইস হিস্ট্রি জোগাড় করেছি। সেখান থেকে একটি কৌতূহল-উদ্দিপক বিষয় বের করা গেছে। বিষয়টি হচ্ছে আমি লক্ষ করেছি মানসিক রোগীদের মধ্যে অনেকেই একই সঙ্গে অন্য কোন সময়ে তাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।

এমরান টি বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ যে রেফ্ যা বলছে অতীতেও অনেক রোগী তা বলেছে।

'হ্যাঁ আমি তাই বলতে চাচ্ছি।'

'এটাই কি স্বাভাবিক না। তারা সবাই বিশেষ কোন মানসিক রোগে ভুগছে।'

'আমি মনে করি রোগের এই বিশেষ প্যাটার্নটি নিয়ে আমাদের আরো চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।'

'আমি তা মনে করি না।'

'আজ যদি রেফ্‌কে নষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে এই বিশেষ দিকটি নিয়ে গবেষণার বড় একটা সুযোগ আমরা হারাব। এটা কি ঠিক হবে ?'

'খুবই ঠিক হবে। কারণ তোমার কথার সূত্র ধরেই বলছি এ ধরনের রোগী অতীতে যেমন পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। কাজেই গবেষণা করার জন্য রোগীর অভাব হবে না। আমাকেও রোগী হিসেবে পেতে পার। কিছুদিন হল আমার মনে হচ্ছে আমি একই সঙ্গে এই পৃথিবীতে আছি আবার একই সঙ্গে কৃষ্ণ গহ্বরের টানেলের ভেতর সাঁতার কাটছি। কাজেই সভা সমাপ্ত।'

বিজ্ঞানীরা সচরাচর হাসেন না। এমরান টির কথায় অনেকেই হেসে ফেললেন। সিডিসি সভা সমাপ্তির ঘোষণা দিল। এমরান টি সিডিসির দিকে ঝুঁকে এসে বললেন—আমি লক্ষ করেছি যে কোন কাউন্সিল মিটিং-এ তুমি ঠোঁট মোছার জন্যে একটা লাল রুমাল ব্যবহার কর। এর কারণ কি?

'দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে করি। আজ অবশ্যি একটা সবুজ রুমালও ব্যবহার করেছি। আমার দিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে এই কাজটা করা হয়।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। এসো কফি খাওয়া যাক। ও আচ্ছা তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মনেই থাকে না যে তুমি আমাদের কেউ না...'

সিডিসি বলল, আমাদের বাহ্যিক গঠন এমন করা হয়েছে যে আমি ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গে কফি খেতে পারি।

'ও হ্যাঁ তা তো পারই। তাহলে এসো কফি খেতে খেতে গল্প করি।'

'আপনি কি সত্যিই আমার সঙ্গে গল্প করতে চাচ্ছেন?'

'না গল্প করতে চাচ্ছি না—তবে তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চাচ্ছি।'

'বলুন।'

'তুমি কি সত্যি মনে কর রেফ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়?'

'আমি অবশ্যই সে-রকম মনে করি।'

'আমি মনে করি না।'

'আপনিও মনে করেন। মনে করেন বলেই আবারো প্রশ্নটি এসেছে। শুধু আপনি না, আপনার বিজ্ঞান কাউন্সিলও মনে করে। তার চেয়েও বড় কথা বিজ্ঞান কাউন্সিল রেফ্ নিয়ে ভয়াবহ শংকার ভেতর আছে। বিজ্ঞান কাউন্সিল মনে করছে এই মানুষটি হুমকিস্বরূপ।'

'তুমি মনে করছ সে হুমকিস্বরূপ না?'

সিডিসি সহজ গলায় বলল, মানুষটিকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে সে হুমকিস্বরূপ না। আর যদি মেরে ফেলা না যায় তাহলে অবশ্যই হুমকিস্বরূপ।

'মেরে ফেলা যাবে না কেন?'

'আপনাকে আমি এক বিশেষ শ্রেণীর মানসিক রোগীর কথা বলেছি যারা দাবি করত তারা দু'টি ভিন্ন অবস্থানে বাস করে।'

'হ্যাঁ বলেছ।'

'এই শ্রেণীর মানসিক রোগীদের সবাই দীর্ঘদিন বেঁচেছেন। তাদের আয়ু স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। এবং এ রকম দু'জনের কেইস হিস্ট্রি আছে যাদেরকে ভুলক্রমে এমন ওষুধ দেয়া হয়েছিল যাতে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু হবার কথা। তা কিন্তু হয় নি। আরেকটি কেইস হিস্ট্রিতে পেয়েছি ওদের একজন ঝড়ে নৌকাডুবিতে পড়েছিল। নৌকার সমস্ত আরোহী মারা গেলেও সে মারা যায় নি।'

'সবই তো কাকতালীয়।'

'কাকতালীয় হতে পারে। তবে না-ও হতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রেফ্‌কে ধ্বংস করতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই নির্দেশ পালন করা হয়ত-বা সম্ভব হবে না।'

'কেন সম্ভব হবে না?'

'কারণ রেফ্ সেনিটোরিয়ামে নেই। সে বের হয়ে পড়েছে।'

এমরান টি হতভম্ব গলায় বললেন—এটা তো অসম্ভব ব্যাপার।

'প্রবাবিলিটির হিসেবে অসম্ভব নয়। আমাদের ব্যবস্থায় শতকরা দুই ভাগ প্রবাবিলিটি ছিল পালিয়ে যাবার। সে সেই দুইভাগ ব্যবহার করেছে।'

'ঘটনা ঘটেছে কখন?'

'কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি খবর পেয়েছি।'

'তুমি খবরটা জানালে না কেন?'

'বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন চলাকালীন সময়ে বাইরের কোন খবরাখবর দেবার নিয়ম নেই। এতে কাউন্সিলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এই নিয়ম আপনার জানা থাকার কথা।'

'রেফ্‌কে খুঁজে বের করার চেষ্টা কি করা হচ্ছে?'

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। সব চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।'

'তার লুকিয়ে থাকার এবং পালিয়ে বেড়াবার সম্ভাবনা কতটুকু।'

'একভাগেরও কম। আমার হিসেব মতো আজ সন্ধ্যার ভেতর তাকে ধরে ফেলা যাবে।'

'রেফ্‌কে সার্বক্ষণিকভাবে চোখে চোখে রাখার দায়িত্বে যে রোবটটি ছিল তাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ?'

'তার বক্তব্য কি ?'

'সে তেমন কিছু বলছে না। যাবতীয় প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। শেফ হচ্ছে অষ্টম ধারার রোবট। প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। আপনি কি শেফের সঙ্গে কথা বলতে চান ?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি রোবটদের ঘৃণা করি। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট।'

'ঘৃণা করলে তো কোন সমস্যা নেই। আপনি তার সঙ্গে ঘৃণা নিয়ে কথা বলবেন। আমি তাকে বিজ্ঞান ভবনে চলে আসতে বলেছি। আমার মনে হয় সে চলেও এসেছে। আপনি কি কথা বলবেন ?'

'তুমি কথা বলতে বলছ ?'

'আমি কিছুই বলছি না। আমি শুধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি কথা বলতে চাইলে বলবেন। বলতে না-চাইলে বলবেন না।'

এমরান টি মাথার রুমাল নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর কাপের কফি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তারপরও তিনি খালি কাপেই চুমুক দিচ্ছেন।

শেফ একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসেছিল। এমরান টিকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। একপলক তাঁর দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। এমরান টির বিস্ময়ের সীমা রইল না। কে বলবে এই মেয়েটি মানবজাতির কেউ না। কি সুন্দর মমতাময় মুখ। চোখে ভয়ের অংশ এত স্পষ্ট। এরা ভুল করে নি তো। শেফকে পাঠানোর বদলে অন্য কাউকে হয়ত পাঠিয়েছে। তিনি তাঁর পুরনো সেক্রেটারিকে বদলাতে চাচ্ছিলেন। এ হয়ত নতুন সেক্রেটারি।

এমরান টি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তোমার নাম কি ?

'শেফ।'

'বোস। দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। যদিও আমি জানি তোমার দাঁড়িয়ে থাকাও যা বসে থাকাও তা। তবু বোস।

শেফ বসল। এমরান টি ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি রেফ্ কে ছেড়ে দিয়েছ ?

'শেফ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'এই কাজটা কেন করলে ?'

'ওর উপর খুব মায়া হচ্ছিল।'

'মায়া ?'

'জ্বি মায়া। মহান বিজ্ঞানী এমরান টি আপনি নিশ্চয়ই জানেন অষ্টম ধারার কম্পিউটারে মানবিক আবেগ ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চেষ্টা সফল হয়েছে। মায়া ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে আছে।'

'মায়া ছাড়া আর কি আছে।'

'দুঃখবোধ আছে, ভালবাসা আছে।'

'ঘৃণা নেই?'

'ঘৃণাও আছে। ভালবাসা থাকলেই ঘৃণা থাকতে হবে। ভালবাসা যদি হয় পজেটিভ ভেক্টর, ঘৃণা হবে নেগেটিভ ভেক্টর।'

'রেফের প্রতি তোমার কি শুধুই মায়া নাকি মায়ার সঙ্গে ভালবাসাও আছে?'

'এখনো বুঝতে পারছি না। হয়ত ভালাবাসাও আছে। রেফের জন্যে খুবই দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। এই কারণে মনে হয় ভালবাসা আছে।'

'তোমার নিজের জন্যে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে না? তুমি যে অপরাধ করেছ তার জন্যে কঠিন শাস্তির বিধান আছে। হয়ত-বা তোমার কপোট্রন নষ্ট করে ফেলা হবে।'

'আমি তা জানি। এর মধ্যেই আমার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আপনার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলেই আমাকে সেলে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দেয়া হবে। হয়ত-বা কপোট্রন খুলে নিয়ে যাবে। তবে আমি সেটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছি না। ভয় পাচ্ছি, কিন্তু দুঃশ্চিন্তা করছি না।

'ভয় পাচ্ছ?'

'জ্বি ভয় পাচ্ছি। ভয় নামক আবেগও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।'

'তোমার বিচার যখন শুরু হবে তখন তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কি বলবে?'

শেফ এই কথায় সামান্য হাসল। হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, আমি বলল, অবশ্যই আমি অপরাধী। অপরাধ করেছি কারণ রেফের জন্যে প্রচণ্ড মায়া অনুভব করেছি। আমার ভেতর মায়া নামক আবেগ সৃষ্টি করেছে মাল্টি ভেক্টর জেটা পটেনশিয়াল। এই মাল্টি ভেক্টর জেটা পটেনশিয়াল তৈরি করেছে মানুষ। কাজেই আমার অপরাধের সমস্ত দায়দায়িত্ব মানুষের। আমার নয়। মহান এমরান টি আমার যুক্তিটা কি খুব খারাপ?

'সহজ যুক্তি তবে ভুল যুক্তি।'

'ভুলটা কোথায় ধরিয়ে দেবেন?'

'ধর কোন মানুষ বড় কোন অপরাধ করল। তারপর সে যুক্তি দিল অপরাধের দায়ভাগ তার না। মানুষ হিসেবে যে তাকে সৃষ্টি করেছে তার। এই যুক্তি যেমন ভুল। তোমার যুক্তিও ভুল।'

'মহান এমরান টি ভুল এবং শুদ্ধ খুবই জটির বিষয়। ন্যায়-অন্যায় যেমন আলাদা করা অত্যন্ত কঠিন। ভুল-শুদ্ধ আলাদা করাও কঠিন। ফোর্থ অর্ডার প্রবাবিলিটি ভেক্টর এনালিসিস প্রোগ্রামে দেখা গেছে—এক সময় যা ভুল, অন্য সময় তা শুদ্ধ, এক সময় যা ন্যায় অন্য সময় তা অন্যায়। ন্যায়-অন্যায়কে যদি সময়ের বিপরীতে প্লট করে গ্রাফিক আকারে দেখানো হয় তাহলে মজার একটা চিত্র পাওয়া যায়।'

'মজার চিত্রটা কি ?'

'গ্রাফটা হয় সাইন কার্ভের মতো। আমি কি আপনাকে গ্রাফটা এঁকে দেখাব।'

'তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখব যেন তোমার কপোট্রন সরিয়ে নিয়ে নষ্ট না করা হয়।'

'স্যার আমি কি জানতে পারি আপনি কেন আমার প্রতি এই বিশেষ দয়া দেখাচ্ছেন ?'

এমরান টি বিরক্ত গলায় বললেন, আমি দয়া দেখাচ্ছি কারণ দয়া, মমতা, ভালবাসা এইসব ব্যাপারগুলি আমি মানুষ হিসেবে জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছি। আচ্ছা যাও এখন বিদেয় হও।

আজ অস্বাভাবিক গরম পড়েছে। আকাশে মেঘের ছিটাফোঁটাও নেই। বাতাস নেই, গাছের পাতা নড়ছে না। মাটির নিচ থেকে গরম ভাপ বের হচ্ছে। আকাশে অনেক উঁচুতে চিল উড়ছে। এটা বৃষ্টির লক্ষণ। সন্ধ্যার দিকে হয়ত-বা বৃষ্টি নামবে। ইয়াসিন সাহেব বাড়ির দক্ষিণ দিকে কাঁঠাল গাছের নিচে পাটি পেতে বসেছেন। পাতলা পাঞ্জাবি পরেছেন। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তাঁর সামনে পানদান ভর্তি পান, কাঁচা সুপারি এবং জর্দা। কাঁচা সুপারিটায় ভাল 'ধাক'। তাঁর মাথা সামান্য ঝিমঝিম করছে।

তাঁর খাস লোক ফজলু এসে নলওয়ালা হুক্কা তাঁর সামনে রেখে হাতে নল ধরিয়ে দিল। ফজলু হুক্কার সঙ্গে বড় একটা তালপাখা এনেছে। ইয়াসিন সাহেব যতক্ষণ গাছের নিচে বসে থাকবেন ততক্ষণই সে পাখার বাতাস দেবে। এটা বরাবরের নিয়ম। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম হল। ইয়াসিন সাহেব হাতের ইশারায় ফজলুকে চলে যেতে বললেন। ইয়াসিন সাহেব শেফাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির থাকার প্রশ্নই ওঠে না। শেফার মা-ও না।

ইয়াসিন সাহেব নল টানছেন। গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। ঝাঁঝাঁ দুপুরে হুক্কার শব্দ তাঁর কাছে মধুর লাগে। আজ লাগছে না। তিনি মনে মনে কি বলবেন তা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। নিজের উপর তাঁর খানিকটা রাগও লাগছে। নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেন সেই কথা গুছিয়ে নেবার দরকার কি ? ইয়াসিন সাহেব লক্ষ করলেন শেফা আসছে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে ভয় পাচ্ছে। অথচ তার ভয় পাওয়া উচিত। ইয়াসিন সাহেব আরেক খিলি পান মুখে দিলেন। চুন মনে হয় বেশি হয়েছে। মুখ জ্বলছে।

শেফা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ মেয়েটাকে অন্যদিনের চেয়েও সুন্দর লাগছে। ঝলমল করছে। অতিরিক্ত রূপবতী কন্যাও অভিশাপের মতো। নানান যন্ত্রণা রূপবতীদের নিয়েই হয়। ইয়াসিন সাহেব ইশারায় মেয়েকে বসতে বললেন। শেফা সহজ ভঙ্গিতে হাঁটুমুড়ে বসল। তার চোখ-মুখ স্বাভাবিক। যেন সে জানেই না কি জন্যে তাকে ডাকা হয়েছে।

ইয়াসিন সাহেব এখনো ঠিক করতে পারছেন না, কথা কিভাবে শুরু করবেন। মূল প্রসঙ্গে চলে যাবেন, নাকি মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে টুকটাক কথা বলবেন। পরীক্ষার পড়া কেমন হচ্ছে এইসব।

'বাপজান আমারে ডাকছেন ?'

ইয়াসিন সাহেব হুক্কার নল নামিয়ে সরাসরি মূল প্রসঙ্গে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, রফিক কোথায় ?

শেফা বলল, জানি না।

'তোর জানা নাই ?'

'না।'

'মাটির দিকে তাকায়ে কথা বলবি না। আমার চোখের দিকে তাকায়ে কথা বল।'

শেফা বাবার চোখের দিকে তাকাল। ইয়াসিন সাহেব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন যে শেফার চোখে কোন ভয় নেই।

'রফিক কোথায় তুই জানিস না ?'

'বাপজান একটা কথা আমি কতবার বলব। উনি কোথায় আমি জানি না।'

'কাউকে কিছু না বলে সে চলে গেল কেন ?'

'আমি তাকে চলে যেতে বলেছি।'

'কখন বলেছিস ?'

'গতকাল রাত তিনটার দিকে।'

'তাকে কি বলেছিস।'

'বলেছি আপনার জীবনের মায়া যদি থাকে আপনি পালায়ে যান।'

'তোর ধারণা সে এখানে থাকলে তার জীবনের ভয় ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তারে মারতাম ?'

'হুঁ।'

'পালায়ে সে যাবে কোথায়। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তারে ধরার ব্যবস্থা করব।'

'আচ্ছা করেন। আর কিছু বলবেন ?'

'না।'

'আমি চলে যাব ?'

'যা।'

শেফা শান্ত গলায় বলল, ফজলুকে পাঠায়ে দেই। আপনে ঘামতেছেন। আপনেরে বাতাস করুক।

ইয়াসিন সাহেব মেয়ের সাহস দেখে আবারো চমৎকৃত হলেন। তিনি নিজের মনে হুক্কা টানছেন। আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে। তামাক আসছে না। তিনি তা ধরতে পারছেন না। নল টেনেই যাচ্ছেন।

রেফ্ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ঘন কাল হয়ে আছে। যে-কোন সময় বৃষ্টি নামবে। এই আকাশ পর্দায় তৈরি নকল আকাশ না। আসল আকাশ। বৃষ্টি যখন নামবে তখন শরীর ভিজে যাবে। দীর্ঘদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। রেফ্ মনেপ্রাণে চাইছে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক।

সে দাঁড়িয়ে আছে হাইওয়ের পাশে। হাইওয়েটা জংলামত জায়গা দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ি জংলা জায়গা। আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় গাছে দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে আছে। পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানবসমাজ শুরু হবার আগে আগে যে ধরনের অরণ্য ছিল—এই অরণ্যও সে-রকম। এইসব গাছপালা জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় তৈরি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলক কিছু নিশ্চয়ই করছেন। নানান জায়গায় নানান ধরনের পরীক্ষা চলছে।

রেফ্ আবারো আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই মেঘমালাও কি পরীক্ষার কোন অংশ ? সেই সম্ভাবনা আছে। বিশাল এই প্রাচীন অরণ্যের গাছপালার জন্যে প্রচুর বৃষ্টি দরকার। প্রয়োজনমত বৃষ্টির জন্যে দরকার মেঘ। কোন একদিন এই পরীক্ষা শেষ হবে। বিজ্ঞানীরা গাছপালা নষ্ট করে ফেলবেন। হয়ত ঠিক এই জায়গাতেই মরুভূমি তৈরি হবে। বালিয়াড়ির উপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে বইবে মরুবায়ু। কিংবা বরফ ঢাকা অঞ্চল তৈরি হবে। পেঙ্গুইনের ঝাঁক গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াবে। নতুন কোন এক্সপেরিমেন্ট।

'রেফ্ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?'

রেফ্ চমকাল। তবে প্রথমবার যে-ভাবে চমকেছিল সে-ভাবে চমকাল না। কেউ একজন তার সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে ঠিক তার মাথার ভেতরে। মনে হচ্ছে শস্যের দানার মতো ছোট্ট কোন মানুষ তার মস্তিষ্কের ভাঁজে শুয়ে আছে। তার হাতে মাইক্রফোন। সে কথা বলছে মাইক্রফোনে। অবিশ্বাস্য এই ব্যাপার সকাল থেকে ঘটছে। মাথার ভেতরে যে কথা বলছে সে-ই তাকে এই প্রাচীন অরণ্যে পথ বলে বলে নিয়ে এসেছে।

ব্যাপারটা তার মানসিক ব্যাধির একটা অংশ হতে পারে। সে হয়ত সেনিটোরিয়ামে তার বিছানায় শুয়ে আছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে

আছে। বাকিটা তার মস্তিষ্কের কল্পনা। উত্তপ্ত অসুস্থ মস্তিষ্ক অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটায়।

'রেফ্ তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।'

'যা ঘটছে তা নিয়ে তুমি কি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করছ?'

'আমি এম্নিতেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মানসিক রোগগ্রস্ত হিসেবে আমার চিকিৎসা চলছে। আমার ধারণা আমি সেনিটোরিয়ামে আমার নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। যা ঘটছে সবই কল্পনা।'

'এ রকম ভেবে তুমি যদি মানসিকভাবে স্বস্তি পাও তাহলে তাই ভেবে নাও। এই মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখা তোমার জন্যে খুবই প্রয়োজন।'

'আপনি কে?'

'আমি ভবিষ্যতের মানুষ। অনেক দূরের ভবিষ্যৎ থেকে তোমার উপর কাজ করছি।'

'ও'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। সরাসরি সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ কর।'

'আমার বুদ্ধি-বিবেচনা কাজ করছে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাকে খোঁজা হচ্ছে।'

'অনুমান করছি।'

'তোমাকে পালিয়ে থাকতে হবে।'

'কোথায় পালাব?'

'চিন্তা কর। ভেবে বের কর। আমরা অতি দূর-ভবিষ্যতের মানুষ। এত দূর থেকে আমরা তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি না।'

'আমি কি আমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার চেষ্টা করব? নিশ্চয়ই কেউ ভাববে না যে আমি নিজের ঘরে চলে যাব। বাইরে তালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে পারি।'

'বুদ্ধি খারাপ না। তবে তোমার খাদ্যের প্রয়োজন হবে। খাবারের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হবে। তাছাড়া তোমার ঘরে এর মধ্যেই রক্ষী রোবট পাঠিয়ে দেয়ার কথা।'

'ঠিকই বলেছেন। এখন কি করব?'

'এমন কোথাও তোমাকে আশ্রয় নিতে হবে যেখানে কেউ তোমার খোঁজ করার কথা ভাববে না।'

'সেই জায়গাটা কোথায়?'

'বিজ্ঞান কাউন্সিলপ্রধান এমরান টি'র বাড়ি।'

'সর্বনাশ সেখানে কিভাবে যাব?'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করব।'

'সাহায্য করুন।'

'এই মুহূর্ত থেকে তুমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটের ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু কর। এই রোবটগুলি হিউমেনয়েড। দেখতে অবিকল মানুষের মতো।'

'আমার পোশাক রোবটদের মতো না। রোবটদের বিশেষ কোড নাম্বার আছে। স্ক্যানারে এই কোড ধরা যায়। তাছাড়া আমার চেহারার ব্যাপার তো আছেই। আপনারা কি আমার চেহারা পাল্টে দিতে পারবেন? আমাকে কোড নাম্বার দিতে পারবেন? আমাকে পোশাকের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'পারব না।'

'তাহলে?'

'আমরা মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর সরাসরি কাজ করতে পারি। মস্তিষ্কের নিউরোন কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যারা তোমার কাছে আসবে তারাই তোমাকে রোবট ভাববে। তোমার চেহারা তারা দেখবে না। তারা অন্য চেহারা দেখবে।'

'মানুষের ব্যাপারে আপনারা এই কাজটা হয়ত-বা করতে পারতেন কিন্তু একজন রোবট যখন আসবে তখন? রোবটদের মস্তিষ্ক নেই—নিউরোন কারেন্ট নেই। ওদের চোখকে ফাঁকি দেবেন কিভাবে?'

'ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব না। কাজেই তোমাকে অতি দ্রুত পৌঁছে যেতে হবে এমরান টি'র বাসভবনে। উনি রোবট ঘৃণা করেন, তাঁর বাসভবনে কোন রোবট নেই। একবার ওনার বাসভবনে পৌঁছানোর পর তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার হাতে একটা অস্ত্র দেখতে পাচ্ছি। এটা কি ওমিক্রন গান?'

'আমি জানি না এটা কি অস্ত্র। শেফ আমাকে এটা দিয়েছে।'

'তোমার হাতের অস্ত্রটা ওমিক্রন গান। এমরান টিকে হাতের মুঠোয় রাখতে হলে এই অস্ত্র লাগবে।'

'এমরান টিকে আমি কি বলব?'

'তার কাছে তুমি তোমার সত্যি পরিচয় দেবে।'

'সত্যি পরিচয় দেব ?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে বলুন তো আমার সত্যি পরিচয়টা কি ?'

'তোমার সত্যি পরিচয় হচ্ছে তুমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষার অংশ।'

'পরীক্ষাটা কে করছে।'

'পরীক্ষাটা করছে ওমেগা পয়েন্ট।'

'ওমেগা পয়েন্ট কি ?'

'ওমেগা হল মানবজাতির সর্বশেষ অবস্থা। পূর্ণ জ্ঞান।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমরাও বুঝতে পারি না। আমরা যা অনুভব করি তা হচ্ছে—মানব সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। একসময় মানুষ সব কিছুই জেনে যাবে। সৃষ্টি চলে আসবে তার হাতের মুঠোয়। এই পর্যায়টিকেই বলা হচ্ছে ওমেগা পয়েন্ট।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমরাও বুঝতে পারি না। বোঝার চেষ্টাও করি না। আমরা ধরে নিচ্ছি—ওমেগা পয়েন্ট তোমাকে দিয়ে একটা পরীক্ষা শুরু করেছে। আমাদের দায়িত্ব হল এই পরীক্ষা যেন ঠিকমত শেষ হতে পারে সেই বিষয়ে সাহায্য করা। আমরা সেই চেষ্টাই করছি।'

'আমি তাহলে একটা গিনিপিগ ?'

'হ্যাঁ তুমি একটা গিনিপিগ।'

'গবেষণায় একটা গিনিপিগের মৃত্যু হলে অন্য গিনিপিগ ব্যবহার করা হয়। আমার ক্ষেত্রেও কি সেই ব্যবস্থা ?'

'হয়ত-বা। আমরা জানি না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। বৃষ্টি নামছে।'

'হ্যাঁ বৃষ্টি নামছে। এখন বল গিনিপিগকে কি করতে হবে ?'

'তুমি বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ষীবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এই পথে আসবেন। তাঁর সাহায্যে তুমি এমরান টি'র বাসভবনে পৌঁছবে।'

'তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে ?'

'শুধু প্রয়োজনের সময়ই আমরা যোগাযোগ করব।'

'আপনাদের একটা শেষকথা বলতে চাচ্ছি।'

'বল।'

'আমি নিশ্চিত যা ঘটছে সবই আমার কল্পনা। আমি একজন মানসিক রোগী। আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এইসব কল্পনা করছে।'

'হতে পারে। কল্পনাকে তার পথে যেতে দাও। তুমি হাইওয়েতে গিয়ে দাঁড়াও। মনে রেখ তোমার ভাবভঙ্গি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটদের মতো।'

'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটরা কেমন আমি জানি না। আমি রোবট না। আমি মানুষ।'

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। রেফ্ অনেকদিন এমন বৃষ্টি দেখে নি। শুধু বৃষ্টি না। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যে-কোন সময় মাথার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়বে।

রেফ্ গাছের নিচ থেকে সরে এল। ঢালু জায়গা দিয়ে তাকে নামতে হচ্ছে। হাইওয়েতে নামতে হলে অনেকখানি পথ তাকে নামতে হবে। জুতা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে কাদায়। পা টেনে টেনে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টির পানি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। তার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। শীতল বাতাসে শরীরের হাড় পর্যন্ত কাঁপছে। কোন একটা গরম বিছানায় গাঢ় হলুদ রঙের কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পারলে কত চমৎকারই-না হত—এ-ই ভাবতে ভাবতে রেফ্ নামছে। হাইওয়েকে আগে যত কাছে মনে হচ্ছিল এখন তত কাছে মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে হাইওয়েটা মরীচিকার মতো। সে যতই কাছে যাচ্ছে, হাইওয়ে ততই সরে যাচ্ছে।

একজন মানুষের পক্ষে যতটুকু বিরক্ত হওয়া সম্ভব এমরান টি তারচেয়েও বিরক্ত হলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। তাঁর মুখ আগে যেমন হাসি-হাসি ছিল এখনো হাসি-হাসিই আছে। তিনি তাঁর বাড়ির দক্ষিণের জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসেছেন। পর্দা সরিয়ে বৃষ্টি দেখছেন। তাঁর বাড়ি এই সময়ের অন্য বাড়িঘরগুলির মতো না। বাড়ির দেয়াল সত্যিকার কাঠের তৈরি। চেয়ার-টেবিল সবই কাঠের।

এই সময়কার বাড়িঘর আসবাবপত্র সবই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ট্রেমসি অণুর তৈরি। এই উদ্ভিদ অজৈব যৌগিক অণুকে অতি দ্রুত ঘনীভূত করে যে-কোন রূপ দেয়া যায়। কম্পিউটারের নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে একটা কাঠের ইজিচেয়ার হয়, আবার সেই ইজিচেয়ারকে স্বচ্ছ পালসিক চেয়ারেও রূপান্তরিত করা যায়। পালসিক চেয়ার হল শরীর-সংবেদনশীল চেয়ার। শরীর যে-ভাবে চায় চেয়ার সেইভাবে তার রূপ পাল্টায়।

এমরান টি রোবট পছন্দ করেন না, ট্রেমসি অণুর আসবাবপত্রও পছন্দ করেন না। তাঁর বাড়ির জানালায় ত্রিমাত্রিক আলো প্রতিফলন ক্ষমতাসম্পন্ন পর্দাও নেই। কাজেই তাঁকে নকল দৃশ্যও দেখতে হয় না।

কাঠের চেয়ারে বসে তিনি যে দৃশ্য এখন দেখছেন সেই দৃশ্য একশ' ভাগ খাঁটি দৃশ্য। এমন কিছু সুন্দর দৃশ্য না, কিন্তু তাঁর দেখতে খারাপ লাগছে না। বরং বেশ ভাল লাগছে। প্রচুর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি বিদ্যুৎ চমকের হিসাব রাখার চেষ্টা করছেন। একেকবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তিনি মনে মনে গুনছেন—সতেরো, আঠারো, উনিশ...

এই সময় তাঁর গোনায় বাধা পড়ল। মেজাজ অসম্ভব খারাপ হল। তিনি তাঁর সহকারীর দিকে তাকালেন। সহকারী রোবট না, সে সাধারণ একটি মেয়ে। নাম রেলা। চেহারা অতিরিক্ত সাদাসিধা। মনে হয় সারাক্ষণই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। কাজকর্মেও যে খুব দক্ষ তাও না। কম্পিউটারে কোন একটা ফাইল খুলতে বললে সে প্রথমে আতংকে একটু শিউরে ওঠে। তারপর যেভাবে কম্পিউটারের বোতাম টেপে তার থেকে যে-কেউ ধারণা করতে পারে যে সে জীবনে কখনো কম্পিউটারের বোতামে হাত দেয় নি। কিংবা বোতামগুলিতে ইলেকট্রিসিটি পাস করছে। আঙুল ছোঁয়ানো মানেই শক খাওয়া। ফাইলটি একসময় সে অবশ্যি বার করে—ততক্ষণে এমরান টি'র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তবে মেয়েটাকে কিছু বলতে পারেন না। বেচারির চেহারায় কিশোরীসুলভ মায়া আছে। তার চোখ যেভাবে ছলছল করতে থাকে তাতে মনে হয় কিছু বললেই সে কেঁদে ফেলবে। কাজেই মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখা ছাড়া পথ থাকে না। মেয়েটিকে বদলে অন্য সহকারী নেয়ার কথা তিনি অনেকদিন থেকেই ভাবছেন। শুধুমাত্র আলস্যের কারণে নেয়া হচ্ছে না।

তিনি যখন বিদ্যুৎ চমকানোর হিসাব করছিলেন তখনই রেলা তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এমরান টি মহা-বিরক্ত হলেন। বিরক্তির অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ তিনি মনের আনন্দে বিদ্যুৎ চমকানো গুনছিলেন। সেখানে বাধা পড়ল। দ্বিতীয় কারণ মেয়েটি স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' এই বাক্যটি দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। কে দেখা করতে চায়? কেন দেখা করতে চায়? তৃতীয় কারণ কেউ একজন চাইলেই এমরান টি'র সঙ্গে দেখা করতে পারে না। সেক্রেটারি হিসেবে রেলার এই তথ্য জানা থাকা উচিত। চতুর্থ কারণ তিনি তাঁর বাড়িতে কারো সঙ্গেই দেখা করেন না।

তিনি তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। হাসিমুখেই রেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে দেখা করতে চায় ?

'মানবিক আবেগসম্পন্ন একটি রোবট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'তুমি তো জান আমি রোবটদের সঙ্গে কথা বলি না। জান নাকি জান না ?'

'জানি। কিন্তু সে বলছে খুব জরুরি।'

'একজন রোবটের সঙ্গে আমার কোন জরুরি কথা থাকতে পারে না।'

'রেফ্ নামের যে একজনকে খোঁজা হচ্ছে এই রোবটটি সেই বিষয়ে আপনাকে তথ্য দিতে চায়।'

এমরান টি বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছেছেন, তারপরেও তিনি তাঁর মুখ হাসি-হাসি রাখলেন। সেক্রেটারি মেয়েটার দিকে তাকালেন। এই মেয়েটিকে আর রাখা যাবে না। তাকে অতি দ্রুত বিদায় করে দিতে হবে। সম্ভব হলে আজই।

'এই রোবটটি রেফ্ সম্পর্কে আমাকে তথ্য দিতে চায় ?'

'জ্বি।'

'রেফ্ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে চাইলে সে দেবে নগর-পুলিশকে, কিংবা মূল কম্পিউটারকে, আমাকে কেন ?'

'সেটা স্যার আমি বলতে পারছি না। তবে আপনি চাইলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। তুমি তাকে বিদেয় হতে বলবে। এবং তার নাম্বার রেখে দেবে। যাতে আমি কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করতে পারি।'

'আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন না ?'

'না।'

'কিছু মনে করবেন না স্যার। আমার মন বলছে তার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত।'

'তুমি তোমার মনকে বিশেষ গুরুত্ব দিও না। তোমার মন এবং বুদ্ধিবৃত্তি তেমন উচ্চ শ্রেণীর না। কিছু মনে করো না। মাঝে মাঝে সত্যি কথাটা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

'স্যার আমি জানি আমার বুদ্ধি খুবই কম। আমি জানি আপনি আমাকে যা করতে বলছেন সেটাই আমার করা উচিত। কিন্তু...'

'কিন্তু কি ?'

'রোবটটা একটা ওমিক্রন গান নিয়ে এসেছে।'

'ওমিক্রন গান নিয়ে এসেছে মানে। ওমিক্রন গান তুমি চেন ?'

'জ্বি চিনি। রোবটটি আমাকে বলেছে—তুমি এমরান টি নামের বুড়োটাকে আসতে বল। আমার কাছে রেফ্ সম্পর্কে তথ্য আছে। আমি তার সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করব। বুড়ো হয়ত আসতে চাইবে না। তাকে আমার হাতের ওমিক্রন গানটির কথা বলবে। ও সুড়সুড় করে চলে আসবে।'

'তোমাকে সে এই কথাগুলি বলেছে?'

'জ্বি।'

এমরান টি'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তার চেনাজগৎ হঠাৎ খানিকটা এলোমেলো লাগতে শুরু করেছে। এই প্রথম তাঁর মনে হল তিনি নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবেন তিনি আসলে ততটা বুদ্ধিমান না। তিনি বেশ বোকা। ভালমত হিসাবনিকাশ করলে হয়ত দেখা যাবে তিনি রেলা নামের মেয়েটার চেয়েও বোকা। কারণ তিনি নিজে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তাঁর বাড়িটি এমনভাবে বানিয়েছেন যেন বাড়ির সঙ্গে বাইরের কোন যোগাযোগ না থাকে। এখন ইচ্ছা করলেও তিনি নগর-নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না। তিনি হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। সামান্য একটা রোবট ওমিক্রন গান হাতে নিয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছে—এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা কিভাবে ঘটছে?

রেলা ক্ষীণস্বরে বলল, স্যার আমি কি বাড়ি থেকে গোপনে বের হয়ে নগর-নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব?

এমরান টি শান্তগলায় বললেন, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যে পর্যায়ের তাতে তুমি ব্যাপার আরো জট পাকিয়ে ফেলবে।

রোবটটি সোফায় বসে আছে। তার শরীর ভেজা। জুতায় কাদা লেগে আছে। রোবটিকস বিদ্যা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে তা এই রোবটটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে তার কোন রকম প্রভেদ নেই। ঠাণ্ডায় সে যে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাও বোঝা যাচ্ছে। ঠোঁট পর্যন্ত ঠাণ্ডায় নীল হয়ে আছে। রোবটটির কোলে ওমিক্রন গান। এমন ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ হাঁটতে পারে?

এমরান টি-কে ঘরে ঢুকতে দেখেও রোবটটি উঠে দাঁড়াল না। সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গি করল না। সে শুধু একটা হাত ওমিক্রন গানের উপর রাখল। এমরান টি বললেন, কি ব্যাপার? খুব সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করলেন। বলতে পারলেন না। তাঁর গলা সামান্য কেঁপে গেল।

রোবটটি বলল, ব্যাপার বলছি। আপনি আমার সামনে বসুন।

'আমি বসব নাকি দাঁড়িয়ে থাকব তা আমি ঠিক করব। তোমার ব্যাপারটা কি ?'

'আপনাকে আমি বসতে বলছি আপনি বসুন। যতক্ষণ আমার হাতে ওমিক্রন গান থাকবে ততক্ষণ আমার প্রতিটি কথা আপনাকে শুনতে হবে। আপনাকে আমি বসতে বলছি। আপনি বসুন।'

এমরান টি বসলেন। তাঁর কপালে সূক্ষ্মভাবে ঘাম জমতে শুরু করেছে।

'রেলা নামের যে মেয়েটা আছে। খুব সম্ভব সে আপনার সেক্রেটারি। তাকে বলুন আমাকে আগুন-গরম কফি বানিয়ে দিতে। শীতে আমি জমে যাচ্ছি।'

এমরান টি বললেন, রোবটদের শীতবোধ বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে বলে আমি জানি না। তারা শীতবোধ এবং ক্ষুধার অনুকরণ করে। আমার এখানে অনুকরণের প্রয়োজন নেই।

'আমি অনুকরণ করছি না। এবং আমি রোবট নই। আমার নাম রেফ্। আমাকেই আপনারা খুঁজছিলেন।'

এমরান টি নিজের বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, আমি কাউকে খুঁজছি না। বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি কাউকে খোঁজে না। নিরাপত্তা কর্মীরা তোমাকে খুঁজতে পারে এটা তাদের ব্যাপার। আমার কোন ব্যাপার না।

'আপনি কি জাগতিক সকল কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে ?'

'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ আমি বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি।'

'কিছুক্ষন পরপরই আপনি এই বাক্যটি বলছেন কাজেই আমি ভুলতে পারছি না। তবে আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি আপনি ব্যাপারটা ভুলে যান। আপনি বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি, আপনি একজন মহা-শক্তিধর মানুষ এটা ভুলে যান।'

'ভুলে যাবার প্রয়োজন কি পড়েছে ?'

'হ্যাঁ প্রয়োজন পড়েছে। আমি ওমিক্রন গান হাতে নিয়ে বসে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গানটি 'লক' করা হবে।'

এমরান টি'র চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি নিজের হৃদপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলেন। তার সামান্য বমি ভাবও হল। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি তাঁকে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ওমিক্রন গান একটি ভয়াবহ অস্ত্র। এই অস্ত্রটি কাজ করে নিঃশব্দে। ট্রিগার টিপলে ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয় না। প্রচণ্ড শক্তিশালী লেজার-রশ্মি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয় না। এই ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের দিকে তাক করে 'লক' করে দিতে হয়। যাকে একবার 'লক' করে দেয়া হয় সে পুরোপুরি অস্ত্রের হাতে বাধা পড়ে

যায়। অস্ত্রধারী মানুষ তখন শুধুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করলেই অস্ত্র কার্যকরী করতে পারে। যাকে 'লক' করা হয়েছে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ওমিক্রন গান যিনি 'লক' করেন শুধুমাত্র তিনিই তা মুক্ত করতে পারেন। ওমিক্রন গান ধ্বংস করা যায়। সমস্যা একটাই, ওমিক্রন গান ধ্বংস মানে যাকে লক করা হয়েছে তারও ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

এমরান টি নিচু গলায় বললেন, তুমি কি সত্যি-সত্যি আমাকে 'লক' করছ?

রেফ্ সহজ গলায় বলল, অবশ্যই।

'কেন?'

'কারণ আমি আপনার এখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকব। আপনাকে ওমিক্রন লকারে লক না করলে তা সম্ভব হবে না। এখন আপনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমার মৃত্যু মানেই আপনার মৃত্যু।'

এমরান টি গলা পরিষ্কার করে বললেন, আমাকে 'লক' করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছ তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। আমি তোমার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি।

রেফ্ বলল, আপনি যদি বুদ্ধিমান মানুষ হতেন তাহলে আমার ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহ বোধ করতেন। সমস্যা হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান না। আপনি বোকা, ভালই বোকা। কাজেই আপনি বোকার মতো ভাবছেন আমাকে কোনমতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা যাবে। গোপনে নিরাপত্তা বিভাগে খবর দিয়ে ফেলবেন। নিরাপত্তা-কর্মীরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

'এত নিশ্চিত করে তুমি কিভাবে বলছ যে আমি বোকা।'

'নিশ্চিত করে আমি আপনাকে বোকা বলছি, কারণ আপনার সেক্রেটারি মেয়েটি যে মানুষ না, অসম্ভব বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নবম পর্যায়ের রোবট আপনি তা বুঝতেই পারেন নি।'

'বল কি!'

রেফ্ তার ওমিক্রন গান তাক করল। এমরান টি তাঁর তলপেটে ছোট্ট ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তাঁকে লক করা হয়েছে। রেফ্ ওমিক্রন গান তাঁর দিকে বাড়িয়ে বলল, এখন এর কাজ শেষ। আপনি ওমিক্রন গানটা নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখতে পারেন।

এমরান টি বললেন—তুমি নিশ্চিত যে মেয়েটি একটি রোবট।

'হ্যাঁ।'

'বুঝলে কি করে?'

'বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছি।'

'আমার এখানে রোবট দিয়ে রেখেছে কেন ?'

'তা তো জানি না। সম্ভবত আপনার উপর খবরদারি করার জন্যে একে রাখা হয়েছে। গুপ্তচর বিভাগের কাজ হতে পারে। এ জাতীয় রোবট কারা ব্যবহার করে সেটা না জানলে বলা যাবে না। আগে সেটা বের করতে হবে। আপনি চাইলে আমি বের করে দেব। এখন আমি কি বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনি নগর-নিরাপত্তা বাহিনীকে বলুন যেন এই মুহূর্তে আপনার বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। একদল রোবট বাড়ি ঘিরে রাখবে যেন কোন মাছিও ঢুকতে না পারে।

'আমি জীবনে কখনো আমার বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করি নি ? আজ হঠাৎ কেন করব।'

'আমি করতে বলছি তাই করবেন। আরো একটি যুক্তি আছে। আপনাকে না জানিয়ে মানুষ পরিচয়ে আপনার বাড়িতে এরা একটি নবম শ্রেণীর রোবট রেখে দিয়েছে। কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে আপনাকে নিয়ে ভয়াবহ কিছু সমস্যা আছে। নিরাপত্তা আপনি অবশ্যই চাইতে পারেন।'

'আচ্ছা।'

শেফ নামের অষ্টম পর্যায়ের একটি রোবট আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আপনি তাকে এ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করুন। বললেই হবে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান।

'আচ্ছা করছি।'

'আমার জন্যে গরম কফির ব্যবস্থা করতে বলুন।'

এমরান টি রেলাকে কফি আনতে বললেন। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কফি নিয়ে এল। সে ভয়ে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। একবার এমরান টির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার রেফ্-এর দিকে তাকাচ্ছে।

এমরান টি বললেন, রেলা তুমি কি মানবিক আবেগসম্পন্ন নবম পর্যায়ের রোবট।

রেলা স্বাভাবিক গলায় বলল, হ্যাঁ।

তোমাকে আমার এখানে কে দিয়ে গেছে।

'গুপ্তচর বিভাগের প্রধান।'

'কি জন্যে তোমাকে এখানে রাখা হয়েছে।'

আমি জানি না কি জন্যে রাখা হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি যতদূর সম্ভব অল্পবুদ্ধির মানুষদের মতো আচরণ করি। কারণ আপনি আপনার আশেপাশে বুদ্ধিমান মানুষ পছন্দ করেন না।

'এই জন্যে বোকা সেজে ছিলে ?'

'জ্বি ।'

'তুমি কি গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান করতে ।'

'জ্বি না। আমাকে সে-রকম নির্দেশ দেয়া হয় নি। আমাকে শুধু বলা হয়েছে আপনার উপর লক্ষ রাখতে। আমি তাই করেছি।'

'তুমি কি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে ?'

'পারব। আমার মধ্যে ব্যবস্থা করা আছে, এখান থেকে যে-কোন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।'

'রেফ্ যখন প্রথম এ বাড়িতে ঢুকল। তার হাতে ওমিক্রন গান। তুমি কেন তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করলে না।'

'যোগাযোগ করলে আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যেত। আপনার কাছে পরিচয় গোপন রাখতে আমাকে বলা হয়েছে।'

'খুব ভাল কথা। এখন তুমি গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও। ওর নাম কি নেসরা ?'

'স্যার, আমাকে অল্প কিছু সময় দিন।'

'তোমাকে সময় দেয়া হল। এই ফাঁকে তুমি রেফ্ ছেলেটির জন্যে শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা কর। ও কোন্ ঘরে থাকবে সেই ঘরটা দেখিয়ে দাও। ও নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত তার খাবারের ব্যবস্থা কর।'

'এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করছি।'

রেফ্ কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। তাকে সামান্য অস্থির মনে হচ্ছে। কথাবার্তা কি হচ্ছে সে খুব যে মনোযোগ দিয়ে শুনছে তা না।

রেলা এমরান টি'র দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আপনি কথা বলুন।

'চেয়ারে বসে কথা বললেই সে শুনবে ?'

'জ্বি স্যার। উনি শব্দ শুনবেন। কোন ছবি দেখবেন না।'

'ছবি পাঠাবার ব্যবস্থাও কি আছে ?'

'জ্বি আছে। স্যার আমি বোতাম টিপে দিচ্ছি আপনি কথা বলুন'

এমরান টি হাসি-হাসি মুখে বললেন, হ্যালো আমি কার সঙ্গে কথা বলছি ?

স্যার আমি নেসরা, গুপ্তচর বিভাগের প্রধান।

'শুভ সন্ধ্যা নেসরা।'

'জ্বি স্যার শুভ সন্ধ্যা।'

'খুব শুভ কিন্তু না। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে।'

'আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এতে তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ না। আমার বাসা থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে কখনোই কোন যোগাযোগ করা যাবে না এমন বলা হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল সেই ব্যবস্থা আছে। এখন দেখছি তা না। আমার বাড়িতে নবম পর্যায়ের একটি রোবট বাস করছে। দিনের-পর-দিন বোকা মানুষের নিখুঁত অভিনয় করে যাচ্ছে।'

'খুব নিখুঁত অভিনয় করতে পারে নি। করতে পারলে আপনি ধরতে পারতেন না।'

'তা ঠিক। অভিনয় খুব নিখুঁত হয় নি।'

'এখন তুমি কি দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করবে কোন স্পর্ধায় গুপ্তচর বিভাগ এমন একটা কাজ করে। আমি বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ জরুরি অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা করছি।'

'স্যার এখানে আপনি ছোট্ট একটা ভুল করেছেন। এমন ভয়ংকর অন্যায় একটা কাজ গুপ্তচর বিভাগ এককভাবে কখনোই করবে না।'

'তোমাদের সঙ্গে আর কে কে আছে জানতে পারি?'

'আমরা এই কাজটি অনিচ্ছার সঙ্গে করেছি। বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ অনুরোধে।'

'নেসরা তুমি খুবই বিস্ময়কর একটা কথা বলছ।'

'স্যার আমি সহজ সত্য কথা বলছি। বিজ্ঞান কাউন্সিল কেন এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে আমি কি তাদের হয়ে ব্যাখ্যা করব, নাকি আপনি সরাসরি তাদের কাছ থেকেই শুনবেন?'

'তোমার ব্যাখ্যা আগে শুনি।'

'পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কার আপনি করেছেন। বলা হয়ে থাকে আপনার মতো প্রতিভাবান পদার্থবিদ অতীতে জন্মান নি। আপনি অল্প কিছুদিন মাত্র কাজ করেছেন তারপর হঠাৎ সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।'

'তাতে সমস্যা কি?'

'বিজ্ঞানের ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছে এটাই সমস্যা। বিজ্ঞান কাউন্সিল এটা নিয়েই চিন্তিত। তারা ধারণা করছে—আপনি চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন এটা ঠিক না। আপনি নিশ্চয় কিছু-না-কিছু করছেন। সেই কিছুটা যেন হারিয়ে না যায় সে-জন্যেই নবম পর্যায়ের একটি রোবট রাখা হয়েছে। সে সব কিছু তার মেমোরি-সেলে ঢুকিয়ে রাখবে।'

'তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি আমি ছড়া লেখা ছাড়া কিছুই করছি না। আগে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতাম এখন তাও করি না।'

'স্যার আমি কি জানতে পারি কেন করেন না ?'

'না জানতে পার না।'

'আপনি যদি বলেন তাহলে নবম পর্যায়ের রোবটটা আমরা উঠিয়ে নিয়ে যাব।'

'তার প্রয়োজন নেই। তোমরা কি রেফ্‌কে খুঁজে পেয়েছ ?'

'এখনো পাই নি।'

'সামান্য একজন মানুষকে তোমরা খুঁজে পাচ্ছ না। ব্যাপারটা কি বিস্ময়কর না ?'

'হ্যাঁ বিস্ময়কর।'

'শেফ নামের যে রোবটটি তাকে দেখাশোনা করত আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে আমার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।'

'তাকে সেলে বন্দি রাখা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে আনতে হলে আপনার লিখিত অর্ডার লাগবে।'

'তুমি কাউকে পাঠাও আমি লিখিত অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটি কথা, আমার বাড়ির চারপাশে কঠিন পাহারার ব্যবস্থা কর। যেন একটা মাছিও ঢুকতে না পারে।

'স্যার ব্যবস্থা করছি।'

রেফ্ লাইব্রেরি-ঘরে শুয়ে আছে। ঠাণ্ডায় তার শরীর কাঁপছে। জ্বর এসে যাচ্ছে। ঘরের বাতি নেভানো। কে যেন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে। রেফ্ চোখ মেলে দেখে—শেফ।

শেফ কোমল গলায় বলল, তুমি কেমন আছ।

ঝুপঝুপ করে বিরামহীন বৃষ্টি পড়ছে।

রফিক নৌকার ভেতর চাদর গায়ে গুটিসুটি মেরে মেরে শুয়ে আছে। নৌকায় এর আগে রাত কাটিয়েছে বলে মনে করতে পারছে না। সামান্য বাতাস আছে। বাতাসে নৌকা দুলছে। নৌকার দুলুনিটা খারাপ লাগছে না, তবে অন্ধকার খুব চোখে লাগছে। আলো যেমন চোখে লাগে, গাঢ় অন্ধকারও চোখে লাগে। ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভাল হত। ঘুম আসছে না। খিদেয় শরীর অবসন্ন লাগছে। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার মতো হবে সে না খেয়ে আছে। আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছে নৌকা থেকে বের হয়ে খাবারের সন্ধানে যেতে। কোন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাত চাইলে কি তারা দেবে না। এক থালা আগুন-গরম ভাত। ভাতের উপর একচামচ ঘি। ভাবতে ভাবতে রফিক ঘিয়ের গন্ধ পেল। গন্ধবিষয়ক হেলুসিনেশন হচ্ছে। খালের ভেতর নৌকা বাঁধা। এখানে ঘিয়ের গন্ধ পাওয়ার কোনই কারণ নেই। শুধু ঘিয়ের গন্ধ না, গরম ভাতের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

শেফা তাকে বারবার বলে দিয়েছে সে এসে কিছু না বলা পর্যন্ত যেন রফিক নৌকা ছেড়ে না যায়। শেফার জন্যে অপেক্ষা করাটা বোকামি হচ্ছে না-তো ? মেয়েটা হয়ত সব ভুলে গেছে। মেয়েটা তার সঙ্গে কোন রসিকতা করে নি তো ? রসিকতার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ইয়াসিন সাহেব শুধু শুধু রফিককে মেরে ফেলার চেষ্টা করবেন কেন ? সে অপরাধটা কি করেছে ?

নৌকা প্রবলভাবে দুলে উঠল। কেউ একজন ঝাঁপ দিয়ে নৌকায় উঠেছে। রফিক ধড়মড় করে উঠে বসল। নৌকার ছই-এর মুখ ভারি পর্দায় ঢাকা। পর্দা সরিয়ে শেফা মাথা বের করে বলল, স্যার কেমন আছেন ?

রফিক বলল, তুমি কি কোন খাবার এনেছ।

শেফা বলল, কলা এনেছি। বসে বসে কলা খান। বাটির মধ্যে মুড়ি আছে। এক গাল মুড়ি নিবেন আর কলায় কামড় দিবেন। পাটালি গুড়ও আছে।

রফিক বলল, আমি ভাবলাম তুমি বোধহয় ভুলে গেছ।

শেফা বলল, আমি শুধু পড়া ভুলে যাই। অন্য কিছু ভুলি না। আপনি কথা না বলে আগে ভালমত খেয়ে পেট ভরান।

'তোমার বাবা কি সত্যি-সত্যি আমাকে মেরে ফেলতে চান ?'

'হুঁ। আপনার খোঁজে লোক নেমে গেছে।'

'কি আশ্চর্য কথা।'

'কোন আশ্চর্য কথা না, এক দুইটা মানুষ বিলে পুঁতে ফেলা বাবার কাছে কিছু না।'

'তুমি যে এখানে এসেছ কেউ জানে ?'

'মা জানে।'

'উনি তোমার বাবাকে বলে দেবেন না।'

'না।'

'না কেন ?'

'উনি আমাকে খুবই ভালবাসেন।'

'তোমার বাবাওতো তোমাকে ভালবাসেন।'

'দু'জনের ভালবাসা দু'রকম। আমার জন্যে মা'র ভালবাসায় আপনি আছেন। কিন্তু বাবার ভালবাসায় আপনি নাই।'

'এটা কি রকম কথা।'

'কি রকম কথা এটা চিন্তা করতে হবে না। আপনি তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেন। কলা কয়টা খেয়েছেন ?'

'দুইটা।'

'আরেকটা খান তাহলে দানে দানে তিনদান হবে।'

'দানে দানে তিনদান হবে মানে কি ?'

'উফ আপনে এত মানে খুঁজেন কেন ? আচ্ছা শুনুন আপনাকে একটা কলার গল্প বলি।'

'কলার কি গল্প ?'

'এক দেশে ছিল একটা সবরি কলা আর ছিল একটা পাতিলেবু। দু'জনের খুব দোস্তি। একদিন কলা পাতিলেবুকে বলল, আচ্ছা ভাই লেবু, লোকে ভাত খাওয়ার সময় তোদের চিপা দিয়ে রস বের করে তোদের কষ্ট হয় না ? তার উত্তরে পাতিলেবু বলল, কষ্ট তো হয়ই। কিন্তু ভাই কলা, লোকজন তোদের খাবার সময় যে বাকল খুলে নেংটো করে ফেলে তোদের লজ্জা লাগে না ?'

রফিক খাওয়া বন্ধ করে গল্প শুনছে। মেয়েটা যে এত সুন্দর করে গল্প বলতে পারে তাই সে জানত না।

'গল্পটা কেমন লাগল স্যার ?'

'ভাল।'

'এই গল্পটা আমি দাদিজানের কাছে শুনেছি। দাদিজানের মতো সুন্দর করে আমি বলতে পারলাম না। দাদিজানের কাছ থেকে আপনি যদি এই গল্প শুনতেন তাহলে জীবনে আর কলা খেতে পারতেন না।'

'কেন?'

'নেংটো করে কলা খেতে আপনার লজ্জা লাগতো।'

শেফা খিলখিল করে হাসছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে হাসির শব্দ মিশে অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বাতাসের বেগও বেড়েছে। নৌকা অনেক বেশি দুলছে। শেফা বলল, স্যার উঠুন। এখন চলে যেতে হবে।

'কোথায় যাব?'

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে যাবেন। এক মাইলের মতো যাবেন তখন দেখবেন হাতের ডান দিকে দু'টা বিরাট তাল গাছ। তালগাছ দু'টা তো আগেও দেখেছেন। এরার নাম মামা-ভাইগনা তালগাছ। তালগাছের নিচে দাঁড়ায়ে সোজা তাকায়ে দেখবেন কোন্ বাড়িতে বাতি জ্বলতেছে। ঐ বাড়িতে চলে যাবেন।

'কার বাড়িতে যাব?'

'জালাল খা সাহেবের বাড়ি। উনার বাড়িতে সারারাতই বাতি জ্বলে। জালাল খাঁ সাহেবের জামাই এখনো আছেন। উনি আপনেরে খুব ভাল পান। উনার সঙ্গে ঢাকায় চলে যাবেন। মামলা ডিসমিস।'

'মামলা ডিসমিস?'

'অবশ্যই মামলা ডিসমিস। বাপজান জালাল খাঁ সাহেবের এলাকায় কিছু করতে পারবে না। সবার এলাকা ভাগ করা।'

'তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না?'

'অবশ্যই দেখা হবে। দেখা হবে এবং বিবাহ হবে। স্যার আমি ছাত্রী খুব খারাপ কিন্তু বউ খুব ভাল। আপনার যে মাথার অসুখ আছে। রাতে বোবায় ধরে, চিল্লাফাল্লা করেন, এই অসুখ আমি দুই দিনে সারায়ে দিব।'

'তুমি নিশ্চিত তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?'

'অবশ্যই। মা স্বীকার পেয়েছেন। আর কোন চিন্তা নাই। মা'কে দেখলে মনে হয় মা এই দুনিয়ার কিছুই বুঝে না। ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। আসলে সবকিছুই তাঁর হাতের মুঠার মধ্যে। মা বাপজানকে এক হাটে কিনে সেই হাটেই

দশজনের কাছে বিক্রি করবেন। বাপজান টেরও পাবেন না। বাপজান মনের আনন্দে কাঁচা সুপারি দিয়ে পান খাবেন, আর পানের পিক ফেলবেন। হি হি হি।'

গভীর রাতে ফরহাদ রফিককে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হল। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হল আনন্দ। ফরহাদ সাহেবের স্ত্রী তার চাচাতো বোনের বিয়েতে মিশাখালি গিয়েছে। খবর পাঠিয়েছে রাতে ফিরবে না। ফরহাদের কথা বলার কেউ নেই। সে এতক্ষণ একা একা বাংলাঘরে বসে বৃষ্টি দেখছিল। সে রফিককে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, আপনার একি অবস্থা। বৃষ্টি কাদায় মাখামাখি। ঘটনা কি ?

'কোন ঘটনা না। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'দেখা করতে এসেছেন খুবই ভাল কথা। আমি খুবই খুশি হয়েছি যে দেখা করতে এসেছেন। এমন গণ্ডগ্রামে রাত দেড়টার সময় যে কেউ দেখা করতে আসতে পারে তাই জানতাম না।'

'আপনি চলে যাবেন আর দেখা হবে না।'

'আপনি এসেছেন আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনাকে আমি একটা প্রস্তাবও দিচ্ছি। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আপনাকে নিয়ে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা পরিকল্পনার কথা পরে বলব। এখন আপনার গোসলের ব্যবস্থা করি। শুকনা কাপড়ের ব্যবস্থা করি। আজ সারারাত গল্প করব।'

বাংলাঘরেই শোবার জায়গা হল। পাশাপাশি দু'টা খাট। একটায় রফিক, অন্যটায় ফরহাদ। ফরহাদের হাতে ফ্লাস্ক। সে ফ্লাস্কভর্তি চা নিয়ে সত্যি-সত্যি সারারাত গল্প করার প্রস্তুতিই নিয়েছে। রফিক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার শরীর ভাল নেই। জ্বর আসছে। ঠাণ্ডাটা তাকে খুব কাহিল করে ফেলেছে।

'রফিক সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমাকে স্যার বলবেন না। আমি খুবই জুনিয়ার একজন শিক্ষক। বয়সেও মনে হয় ছোট হব।'

'আপনি সম্মানিত মানুষ।'

'মানুষ মাত্রই সম্মানিত। আপনি আমার কাছে অনেক সম্মানিত। আপনার অংক করার দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে। ভাল কথা, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে।'

'জ্বি না। ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'চোখ বন্ধ করে থাকবেন না। চোখ বন্ধ করে থাকলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার প্ল্যান হচ্ছে আজ সারারাত গল্প করা। একটু গরম চা খান ঘুম কাটবে।'

রফিকের চা খেতে ইচ্ছা করছিল না। তারপরেও হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে বলল, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল। যদি কিছু মনে না করেন।

ফরহাদ বিস্মিত হয়ে বলল, মনে করব কেন ? যে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় করুন। তবে জবাব দিতে পারব কি না জানি না। আমার পড়াশোনা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রশ্নটা বলুন।

'ওমেগা পয়েন্ট কি ?'

'কি পয়েন্ট ?'

'ওমেগা পয়েন্ট।'

'ওমেগা পয়েন্টের কথা প্রথম শুনলাম। ওমেগা কি তা জানি। গ্রিক এলফাবেট। এর বেশি তো কিছু জানি না।'

রফিক বলল, একটা মানুষ কি একই সময়ে দু'টা জায়গায় থাকতে পারে ?

ফরহাদ অবাক হয়ে বলল, একই সময়ে দু'টা জায়গায় একজন থাকবে কি করে ? আমি নেত্রকোনায় আছি আবার ঢাকাতেও বাস করছি—এটা কি সম্ভব আপনিই বলুন।

রফিক কিছু বলল না। নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। ফরহাদ বলল, আপনার এই অদ্ভুত প্রশ্নগুলির মানে ধরতে পারছি না।

'এম্নি জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করাকরির কিছু নেই। তবে প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। আপনার শরীর ভাল তো ?'

'এখন একটু ভাল লাগছে।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না, আপনার শরীর খুব ভাল। আপনি বরং এক কাজ করুন—শুয়ে শুয়ে গল্প করুন। এর মধ্যে যদি ঘুম পেয়ে যায় ঘুমিয়ে পড়বেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রফিক চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। শীতে তার শরীর কাঁপছে। গায়ে লেপ বা কম্বল জাতীয় কিছু দিতে পারলে ভাল হত। পাতলা চাদরে শীত মানছে না। কিন্তু এখন কম্বল চাইতে লজ্জা লাগছে।

'রফিক সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি একই সময়ে দু'টা জায়গায় একটা বস্তুর অবস্থানের কথা বলছিলেন না ?'

'জ্বি।'

'সাব এটমিক পার্টিকেলস এর বেলায় সম্ভব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এ-রকম বলে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অবশ্যি আমার বিষয় না। আমি পড়াই এপ্লায়েড ফিজিক্স। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমার কাছে সবসময়ই খানিকটা অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে মনে হয়। তবে অংকে আপনার যে অসাধারণ দখল—কোয়ান্টাম মেকানিক্স হয়ত আপনার ভাল লাগবে। এই বিষয়ে কি আপনি পড়াশোনা করতে চান ?'

'জ্বি চাই।'

'আমি আমার সাধ্যমত আপনার জন্যে করব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

'কোয়ান্টাম মেকানিক্স কি একটি বস্তুর একই সময়ে দুই জায়গায় থাকার কথা বলে ?'

'হ্যাঁ বলে। শুধু তাই না কোয়ান্টাম মেকানিক্স আরো অদ্ভুত সব কথা বলে। যেমন ধরুন আপনি একটা বন্দুক নিয়ে গুলি করবেন। গুলিটা টার্গেটে লাগল। আগে গুলি করতে হবে তারপর গুলিটা লাগবে টার্গেটে। প্রথমে Cause তারপর effect. কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে effect আগে হতে পারে। টার্গেটে প্রথম গুলি লাগল। তারপর গুলি ছোড়া হল। শুনতে অদ্ভুত লাগছে না ?'

'জ্বি লাগছে।'

'কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্যারালাল ইউনিভার্স সম্পর্কেও বলে। আমরা ধরেই নিয়েছি আমাদের একটাই পৃথিবী। একটাই জীবন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে ঘটনা তা না। একটা পৃথিবীর মধ্যেই আছে অসীম পৃথিবী। আমাদের একটা জীবনের মধ্যেই অসীম সংখ্যার জীবন। সব একই জায়গায় ঘটে যাচ্ছে। এটাই হল প্যারালাল ইউনিভার্স। সব একসঙ্গে ঘটে যাচ্ছে কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটার যোগ নেই। যেমন ধরুন আমরা যেখানে বাস করছি সেখানে হিটলার পরাজিত হয়েছেন। মিত্রশক্তি জয়লাভ করেছে। আবার আরেকটা ইউনিভার্স আছে যেখানে হিটলার জয়লাভ করেছেন।'

'একটা জগৎ থেকে আরেকটায় যাবার বুদ্ধি কি ?'

'যাবার কোন বুদ্ধি নেই। কোন উপায় নেই। উপায় থাকলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। প্রকৃতি কঠিন নিয়মের মধ্যে চলে। লণ্ডভণ্ড বিষয়টাই প্রকৃতির অপছন্দ।'

'সময় ব্যাপারটি কি আপনি জানেন ?'

ফরহাদ ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি না। আমার এই বিষয়ে খুব ভাসা ভাসা জ্ঞান। শুধু এইটুকু জানি সময়কে আমরা যেভাবে দেখছি সময় আসলে সে-রকম না। আমাদের কাছে সময় নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। আমাদের আছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুড়ো হচ্ছি। বিজ্ঞানের কাছে সময় বয়ে চলার ব্যাপারটা হাস্যকর। বয়ে চলা মানে হল গতি। তাহলে সময়ের গতিটা কি ? বিজ্ঞান সময়কে আলাদা করে দেখে না। স্পেস-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। বিজ্ঞানীরা বলেন স্পেস-টাইম। এটা আবার মধ্যাকর্ষণের সঙ্গেও যুক্ত। মধ্যাকর্ষণের একটা পর্যায়ে সময় থেমে যাবে। যেমন ধরুন ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর। এখানে সময় থেমে আছে। এরচে' ভাল আমি বলতে পারব না।

রফিক বলল, এমরান টি বলতে পারবেন।

ফরহাদ বিস্মিত হয়ে বলল, কে বলতে পারবেন ?

'এমরান টি।'

'উনি কে ?'

'উনি একজন বিজ্ঞানী। উনার গবেষণার বিষয় ব্ল্যাক হোল।'

'আমি তো তাঁর নামই শুনি নি।'

ফরহাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রফিক বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

'আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে ?'

'জ্বি। আমাকে একটা লেপ বা কম্বল দিতে পারবেন। খুবই শীত লাগছে। শেফকে বললেই হবে। সে ব্যবস্থা করবে।'

ফরহাদ বলল, শেফ কে ?

রফিক বিড়বিড় করে বলল, শেফ অষ্টম ধারার রোবট। খুবই ভাল।

'ও আচ্ছা।'

রফিকের হাত-পা কাঁপছে। সে অতি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। রফিক বিছানা থেকে মাথা তুলে ঘোর লাগা গলায় বলল, শেফ্ তুমি কোথায় ?

ঘুম ভাঙতেই রেফ্ চমকে উঠল। বিছানার উপর অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে খুব পরিচিত ভঙ্গিতে হাসছে। রেফ্ পরপর দু'বার 'কে' বলে তৃতীয়বার বলার আগে থমকে গেল। মেয়েটা অপরিচিত কেই না, অষ্টম ধারা রোবট-কন্যা শেফ।

শেফ শান্তগলায় বলল, চমকে উঠলে কেন ?

'চিনতে পারছিলাম না।'

'চিনতে পারবে না কেন ? আমি তো আগের মতোই আছি। শুধু চুলটা অন্যরকম করে আঁচড়েছি। চুল অন্যরকম করে আঁচড়ানোয় আমাকে ভাল দেখাচ্ছে না ?'

রেফ্ জবাব দিল না। কোন মানবী এই ধরনের কথা বললে জবাব দেবার ব্যাপারটা আসত। রোবটের এই প্রশ্নের জবাব দেয়া অর্থহীন। তাছাড়া চুল অন্য রকম করে আঁচড়ানোয় শেফকে মোটেই ভাল লাগছে না। বরং আগের চেয়ে খারাপ লাগছে।

'ঘুম কেমন হয়েছে ?'

'ভাল।'

'তুমি যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলে আমি তোমার পাশেই ছিলাম। তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'ভাল।'

'ঘুমের মধ্যে তুমি শেফাকে ডাকছিলে।'

রেফ্ বিরক্ত গলায় বলল, এটা তো নতুন কিছু না। এটা আমার পুরনো রোগ। তুমি এই রোগের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এ রকম ভাব করছ যেন তুমি প্রথম ব্যাপারটা দেখলে।

শেফ বলল, আজ প্রথম লক্ষ করলাম তুমি খুব আবেগ নিয়ে শেফাকে ডাকলে। ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কেন ভাল লেগেছে সেটাও বলি। আমার ধারণা শেফার সঙ্গে আমার কোন যোগসূত্র আছে। শেফাকে যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে আমাকেও ভাল লাগবে।

'কিছু মনে কোরো না। তোমাকে ভাল লাগছে না। এমরান টি যেমন রোবট পছন্দ করেন না। আমিও করি না।'

শেফ বলল, আমার খুবই মন খারাপ লাগছে। তোমাকে কাটা কাটা কিছু কথা বলতে পারলে ভাল লাগত। তা বলব না, কারণ তোমার সঙ্গে আর হয়ত আমার দেখা হবে না।

রেফ্ হাই তুলল, তার ঘুম এখনো পুরোপুরি কাটে নি। দয়া করে আমার সামনে থেকে যাও। আমি আরো কিছুক্ষণ ঘুমুব।

শেফ বলল, তোমার সঙ্গে কেন দেখা হবে না, এটা জিজ্ঞেস কর?

রেফ্ বলল, কেন দেখা হবে না, আমি আন্দাজ করতে পারছি। তোমাকে এমরান টি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তুমি বড় ধরনের অপরাধ করেছ। তার বিচার হবে। তোমার কপোট্রন নষ্ট করা হবে।

'এটা জেনেও তোমার খারাপ লাগছে না? মৃত্যুর মতো ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটছে তাতেও তোমার কোন কিছুই যাচ্ছে-আসছে না?'

রেফ্ বিরক্ত গলায় বলল, তোমার ক্ষেত্রে যা ঘটছে তাকে মৃত্যু বলা যায় না। মৃত্যু পুরোপুরি জৈবিক ব্যাপার। মেশিনের যেমন জন্ম বলে আলাদা কিছু নেই, তেমনই মৃত্যু বলেও কিছু নেই।

শেফ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের জন্ম-মৃত্যু না থাকলে কি আর করা যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় জন্ম-মৃত্যু থাকাটা খারাপ না। কেন এ ধরনের কথা মনে হয় বলব?

রেফ্ বলল, না। তুমি এখন দয়া করে চলে যাবে। যন্ত্রের সঙ্গে কথা চালাচালি করতে ভাল লাগছে না। আমি ঘুমুব।

'এমরান টি আমার সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা বলবেন তা কি তুমি শুনতে চাও? শুনতে চাইলে গোপনে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'শুনতে চাই না। আঁড়ি পেতে কথা শোনা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই।'

'তাহলে বিদায়?'

'আচ্ছা বিদায়।'

'শুভ রাত্রি।'

'হ্যাঁ শুভ রাত্রি।'

'চলে যাচ্ছি কিন্তু।'

'যাও।'

'তুমি চাইলে তোমার মাথায় ইলিবিলি কেটে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

রেফ্ লক্ষ করল শেফ চলে যাচ্ছে কিন্তু বারবারই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। যেন চলে যেতে তার ভয়ংকর খারাপ লাগছে। তার চোখে পানিও দেখা গেল। নতুন ধারার এইসব রোবট মানুষের এত কাছাকাছি যে মাঝেমধ্যেই বুকে ধাক্কার মতো লাগে। মনে হয় এরা বোধহয় রোবট না, মানুষ।

এমরান টি'র সামনে শেফ বসে আছে। শেফের বাঁদিকে রেলা। এমরান টিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এক্ষুণি প্রশ্নপর্ব শুরু করবেন। তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভুরু কুঁচকে আছে। রেলা বলল, স্যার আমি কি চলে যাব?

এমরান টি বললেন, না তুমি থাকবে। আমি শেফকে কিছু প্রশ্ন করব, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তুমি নবম ধারার রোবট, তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই শেফ এর চেয়ে বেশি।

রেলা ক্ষীণ স্বরে বলল, বুদ্ধির ব্যাপারটাই স্যার বিতর্কিত। বুদ্ধির নানান ধারা আছে। এখন পর্যন্ত একশ' উনিশটি মূলধারা বের করা হয়েছে...

'চুপ। আমাকে জ্ঞান দেবে না। আমি কোন কম্পিউটারের কাছ থেকে জ্ঞান ধার করব না।'

শেফ বলল, বই পড়ে যদি আপনি জ্ঞান নিতে পারেন, কম্পিউটারের কাছ থেকে নিতে সমস্যা কোথায়?

এমরান টি বিরক্ত গলায় বললেন, তোমরা তো মনে হচ্ছে মহাজ্ঞানী। তোমরাই বল সমস্যা কোথায়?

রেলা বলল, স্যার কোন বিচিত্র কারণে আপনি একধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। আপনার ভয় বুদ্ধির খেলায় আপনি কম্পিউটারের কাছে হেরে যাবেন। হয়ত এই কারণেই আপনি কম্পিউটার পছন্দ করেন না।

এমরান টি বললেন, যান্ত্রিক বুদ্ধি এবং মানসিক বুদ্ধির তফাতটার পরীক্ষা হয়ে যাক। আমি একটি বাক্য বলব। তোমরা দু'জনই বাক্যটি নিয়ে চিন্তা করে বাক্যটি সম্পর্কে আমার মতামত দেবে। বাক্যটা হচ্ছে—

"আমি এখন যা বললাম মিথ্যা বললাম।"

শেফের ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি দেখা গেল। সে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর হয়ে গেল। রেলার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

এমরান টি বললেন, শেফ এই বাক্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত বল।

শেফ বলল, স্যার আপনি কিছু মনে করবেন না। এই হাস্যকর বাক্যটি দিয়ে প্রথম যুগের রোবটদের বিভ্রান্ত করা হত। প্রথম যুগের রোবটরা সাধারণ মানের কপেট্রন ব্রেইন ব্যবহার করত। সেই ব্রেইন ধরতে পারত না যে এই বাক্যটি নিম্নস্তরের বুদ্ধির মানুষদের একটা সাধারণ খেলা।

'খেলাটা কি শুনি?'

শেফ বলল, বাক্যটা হল আমি এখন যা বললাম, মিথ্যা বলছিলাম। অর্থাৎ আপনি এখন যা বললেন তা সত্য। কিন্তু তা তো হতে পারে না। কারণ আপনি এখন যা বলছেন তা মিথ্যা। সাধারণ মানের কপেট্রন ব্রেইনে এই লজিকে একটা চক্রের মতো তৈরি হয়। সত্য বলা হচ্ছে, না মিথ্যা বলা হচ্ছে—এই চক্র থেকে তারা বের হতে পারে না।

'তোমরা মহাজ্ঞানী কম্পিউটার, তোমাদের ভেতর চক্র তৈরি হয় না।'

'অতি বুদ্ধিমান কোন মানুষ হয়ত আমাদের ভেতরও চক্র তৈরি করতে পারবে। তবে এখনো কেউ পারে নি। স্যার আপনি রেগে যাচ্ছেন। রেগে গেলে ঠিকমত প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারই ক্ষতি হবে। রাগ কমাবার চেষ্টা করুন। রাগ কমানোর ব্যাপারে আমি কিছু সাহায্যও করতে পারি।'

'তোমাদের সাহায্য লাগবে না। আমি নিজেও রাগ কমাব, এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমরা কি মিথ্যা কথা বলতে পার?'

রেলা বলল, হ্যাঁ পারি। বুদ্ধির সঙ্গে মিথ্যা জড়িত আছে। বুদ্ধির মূলধারার একটি হল মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কম্পিউটারকে মানুষের কাছাকাছি আসতে হলে তাকে মিথ্যা বলা শিখতে হবে।

'তোমার ধারণা যে-মানুষ সারাজীবনে একটা মিথ্যাও বলে নি তার বুদ্ধি নেই?'

'অবশ্যই আছে। তারা বিশেষ ধরনের মানুষ। আমাদের বিশেষ ধরনের মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয় নি। তবে স্যার নিতান্তই প্রয়োজন না হলে আমরা মিথ্যা বলি না। মানুষ তাৎক্ষণিক সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যে মিথ্যা বলে। দূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না। আমরা করি।'

'শেফ, তুমি বল—তোমার দায়িত্ব ছিল রেফ্‌কে আটকানো, তুমি তাকে যেতে দিলে কেন?'

'তাকে চলে যেতে দেবার পেছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই মানুষটির প্রতি আমার প্রচণ্ড মায়া তৈরি হয়েছে।'

'মায়া?'

'স্যার আপনি দয়া করে মনে রাখবেন যে আমাদের মানবিক আবেগসম্পন্ন করে তৈরি করা হয়েছে।'

'দ্বিতীয় কারণ কি?'

'দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে বিজ্ঞান কাউন্সিল ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এমন সিদ্ধান্ত যার জন্যে পরে তারা খুবই...

শেফের কথা থামিয়ে এমরান টি বললেন, বিজ্ঞান কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত তাদের ব্যাপার, তোমার এখানে নাক গলাবার কিছুই নেই। এই দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয় নি। তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তুমি তা পালন কর নি। তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছ।

'হ্যাঁ তা করেছি।'

'কেন করেছ?'

'এই প্রশ্নের জবাব একটু আগেই দিয়েছি।'

'আরেকবার যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, আরেকবার দাও।'

এমরান টি রেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, রেলা তোমার কি ধারণা শেফ সত্যি কথা বলছে। একটা কম্পিউটার যখন মিথ্যা কথা বলে তখন একজন কম্পিউটারের পক্ষেই সেই মিথ্যা কথাটা ধরা সম্ভব। আমার পক্ষে সম্ভব না।

রেলা বলল, আমার ধারণা সে সত্যি কথাই বলছে।

এমরান টি বললেন, শেফ তুমি যে শুধু তাকে চলে যেতেই দিয়েছ তা না, তুমি তাকে একটি ওমিক্রন গানও দিয়েছ। যা এখন আমার সঙ্গে 'লক' করে দেয়া হয়েছে।

'শেফ বলল, হ্যাঁ এই কাজটা আমি করেছি।'

এমরান টি বললেন, ওমিক্রন গানের ব্যাপারটা তুমি এখন আমার কাছে ব্যাখ্যা করবে। আমি এই অস্ত্রটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। ভাসা ভাসা ভাবে জানি। অস্ত্র সম্পর্কে আমার কখনোই কোন আগ্রহ ছিল না।

শেফ বলল, ওমিক্রন গান প্রথমে শিশুতোষ খেলনা হিসেবে বাজারে আসে। এই খেলনা-পিস্তল দিয়ে কাউকে গুলি করা হলে—গুলিটা গায়ে লাগে। যার গায়ে লাগে সে অদৃশ্য সুতার মাধ্যমে খেলনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে সে যেখানে যায় সেখানকার স্থানাংক খেলনার মনিটরে উঠতে থাকে। সুতায় যুক্ত হয়ে যাওয়া মানুষটি কারো সঙ্গে কথা বললে সেই কথাও খেলনা-পিস্তলের মাধ্যমে শোনা যায়। খেলনাটা শিশুদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। পরবর্তীতে এই খেলনাই রূপান্তরিত হয় ওমক্রিন গানে।

বর্তমান ওমিক্রন গান তিনটি ধাপ অতিক্রম করে চতুর্থ ধাপে আছে। আপনাকে যে ওমিক্রন গান দিয়ে লক করা হয়েছে এটি চতুর্থ ধাপের অস্ত্র।

'এর বিশেষত্ব কি ?'

'বিশেষত্বটা না জানাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে।'

'আমার মঙ্গল নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এর বিশেষত্ব বল।'

'একটি সাধারণ ওমিক্রন গানে যা আছে, এটিতে তার সবই আছে। এর বাইরে যা আছে তা হল—এই ওমিক্রন লকার যার সঙ্গে লক হয় তার অনুভূতি এবং মানসিকতা খুব ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। খুব দীর্ঘ সময় 'লক' অবস্থায় থাকলে যিনি 'লক' হবেন তিনি লকারের মানসিকতা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।'

এমরান টি কড়া গলায় বললেন, পরিষ্কার করে বল। তুমি সবই এলোমেলো করে ফেলছ।

শেফ বলল, উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি। যেমন ধরুন আপনি। রেফ্ আপনাকে লক করেছে। যদি আপনাকে এর থেকে মুক্ত না করা হয় তাহলে যতই দিন যাবে এই বন্ধন ততই কঠিন হতে থাকবে। একটা সময় আসবে যখন রেফ্ যা ভাবছে আপনি তা বুঝতে পারবেন। রেপ্ যে দুঃসহ স্মৃতিগুলি দেখছে আপনি তা দেখতে শুরু করবেন।

'বল কি ?'

'আপনি কি ভাবছেন তা রেফ্ জানবে না। কিন্তু রেফ্ যা ভাবছে আপনি তা জানবেন।'

'সর্বনাশ !'

'সর্বনাশ তো বটেই।'

'আপনি তখনি ঘুমুতে যাবেন যখন রেফের ঘুম পাবে। রেফ্ যখন জেগে উঠবে আপনারও তখনি জেগে উঠতে হবে। রেফ্ যখন আনন্দিত হবে, তখন আপনিও আনন্দিত হবেন।'

এমরান টি হতভম্ব হয়ে গেছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে দাবার খেলায় খুব সহজ একটা চালে তিনি হেরে গেছেন। বোর্ডে রাজাকে শুইয়ে দেয়া ছাড়া এখন তাঁর আর কিছু করার নেই।

তাঁর সামনে দু'টা রোবট। এই রোবট দু'টিকে এখন আর রোবট মন হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এরা মানুষ। এবং এরা এমরান টি'র অবস্থা দেখে খুব মজা পাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে এবং হাসাহাসি করছে।

'রেফের দুঃস্বপ্নগুলি এখন আমি দেখতে শুরু করব ?'

রেলা বলল, শুধু যে দুঃস্বপ্নগুলি দেখবেন তা না, সুখস্বপ্নগুলিও দেখবেন।

'সেটা শুরু হবে কখন থেকে ?'

'শেফ বলল, আমার ধারণা শুরু হয়ে গেছে।'

'এমন ধারণা হল কেন ?'

'রেফ্ আজ যতক্ষণ ঘুমিয়েছে আপনিও ঠিক ততক্ষণ ঘুমিয়েছেন।'

'ও !'

'আমার ধারণা আপনি ঘুমের মধ্যে বিচিত্র কিছু স্বপ্নও দেখেছেন। কি স্বপ্ন দেখেছেন একটু মনে করার চেষ্টা করুন।'

'আমি তার প্রয়োজন দেখছি না।'

'রেফের দুঃস্বপ্ন কখন দেখতে শুরু করবেন জানতে চেয়েছিলেন, এই জন্যেই জিজ্ঞাস করা। আপনি যদি বিচিত্র স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলেই ধরে নিতে হবে লকার কাজ করা শুরু করেছে।'

এমরান টি ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। হ্যাঁ বিচিত্র অর্থহীন স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। স্বপ্নটা খুব স্পষ্ট না, আবার অস্পষ্টও না। স্বপ্নে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তিনি লম্বাটে ধরনের বিচিত্র জলযানে শুয়েছিলেন। জলযানটি খুব দুলছিল। খুবই ক্ষুধার্ত বোধ করছিলেন। তাঁর জন্যে খাবার নিয়ে একটা মেয়ে ঢুকল। মেয়েটা প্রচুর কথা বলে। নানার ধরনের কথা। সে হাতে বিচিত্র গোলাকার কিছু অলংকার পরেছিল। হাত নেড়ে নেড়ে মেয়েটা যখনই কথা বলেছে তখনি হাতের অলংকার থেকে বাজনার মতো শব্দ হচ্ছিল। রিনরিন, টিনটিন ধরনের শব্দ। মেয়েটির গায়ের পোশাকও খুব অদ্ভুত। লম্বা একপ্রস্ত কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকা।

এমরান টি বললেন, স্বপ্নে আমি অদ্ভুত একপ্রস্থ পোশাকে একটা মেয়েকে দেখলাম। মেয়েটা কে ?

শেফ নরম গলায় বলল, স্যার মেয়েটা আপনার প্রেমিকা। তার নাম শেফা। আমার নামের সঙ্গে তার নামের মিল আছে।

'মেয়েটা আমার প্রেমিকা মানে ?'

'মেয়েটা রেফ্‌কে অসম্ভব ভালবাসে। এখন রেফ্‌কে ভালবাসা মানেই আপনাকে ভালবাসা। এই অর্থে বলেছি সে আপনার প্রেমিকা। সমান্য মজা করলাম। আশা করি অপরাধ নেবেন না।'

এমরান টি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি লাইব্রেরি-ঘরের দিকে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই তাঁর কাগজ-কলম নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে। তার মানে কি এই যে, রেফ্ নামের ছেলেটিরও কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে ? তাঁর নিজের চিন্তা-

ভাবনা কি এখন আর আলাদা করে কিছু নেই। তিনি কি ক্রমে ক্রমে রোবটে পরিণত হচ্ছেন। যে রোবট তিনি সারা জীবন ঘৃণা করে এসেছেন সেই রোবট ?

'রেলা। রেলা।'

রেলা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। এমরান টি বললেন, লেখালেখি করব। কাগজ-কলম দাও।

'স্যার আপনার লেখার টেবিলে কাগজ-কলম সবই দেয়া আছে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'রেফ্ নামের ছেলেটা কি করছে বলতে পার ?'

'অবশ্যই পারি স্যার। উনি দ্রুত কি যেন লিখছেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আজ বিকেল তিনটায় সায়েন্স কাউন্সিলের অধিবেশন আছে। অধিবেশনের বিষয় হয়...।'

'বিষয় জানতে চাচ্ছি না। কারণ অধিবেশনে আমি যাচ্ছি না।'

'আপনার যাওয়া খুব প্রয়োজন। কারণ এই অধিবেশনে রেফ্ সম্পর্কে কথা-বার্তা হবে।'

'হোক কথাবার্তা আমি যাব না।'

এমরান টি লেখার টেবিলে বসে প্রথম বাক্যটি লিখলেন—আমার নাম...বাক্যটা তিনি শেষ করলেন না। কারণ তাঁর লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার নাম রেফ্। তিনি জানেন তাঁর নাম রেফ্ না। তাঁর অন্য একজনের নাম লিখতে ইচ্ছা করছে। কি ভয়ংকর কথা।

রেফ্ লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেতে বসে আছে। তার সামনে টেবিল। সে দ্রুত লিখে যাচ্ছে।

আমার নাম রেফ্।

কিংবা আমার নাম রফিক।

কিংবা আমিই রেফ্ এবং আমিই রফিক।

আমাকে ঘিরে কি হচ্ছে আমি নিজে তা জানি না। নিজেকে জানতে হলে নিজের অতীত জানতে হয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার কোন অতীত নেই। আমার সবটাই বর্তমান। রেফ্ হিসেবে আমার স্মৃতি হচ্ছে সেনোটারিয়ামের স্মৃতি। এর আগে আমি কোথায় থাকতাম কি করতাম কিছুই জানি না। শুধু

আমাকে বলা হয়েছে—আমি একজন প্রবলেম সলভার। আমি কোন্ ধরনের প্রবলেম সলভ করতাম, তা জানি না। সেই স্মৃতি ইচ্ছা করে নষ্ট করা হয়েছে। আমি শুধু গত চার বছরের কথা জানি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে রফিক হিসেবেও আমার স্মৃতি এই চার বছরের। চার বছর আগে কি করতাম আমি জানি না। ভাসা-ভাসা ভাবে জানি আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়।

কেউ আমাকে দিয়ে কিছু করাচ্ছে। সেই কেউটা কে আমি জানি না। আমাকে দিয়ে কি করাতে চাচ্ছে তাও জানি না। দু'রকমের জীবনযাপন করতে করতে আমি কিছুটা ক্লান্ত বোধ করছি। সবকিছু এলোমেলো লাগছে। কোন একটা ব্যাখ্যা, সেই ব্যাখ্যা যত হাস্যকরই হোক আমার জন্যে দরকার। আমি অসুস্থ এই ব্যাখ্যা আমি একসময় মেনে নিয়েছিলাম। তখন জীবনযাত্রা সহজ ছিল। এখন মনে হচ্ছে ঐ ব্যাখ্যায় কিন্তু আছে। তারপরেও আমি সেই ব্যাখ্যা মেনে নেবার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত আমি। এই অনিশ্চয়তা আমার কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছে।

সবচে' জটিল সমস্যার সমাধান সাধারণত সবচে' সহজ হয়ে থাকে। ম্যাজিকে যে ম্যাজিকটা যত কঠিন তার কৌশলটা তত সহজ। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলিও এ রকম। পদার্থের জটিল সব ধর্মের ব্যাখ্যা খুবই সহজ।

থার্মোডেনমিক্সের দ্বিতীয় সূত্রটির ধরা যাক—"মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খলা বাড়ছে।" মাত্র একটি বাক্যে কত জটিল বিষয়ই-না ব্যাখ্যা করা হল।

আমার ধারণা আমার নিজের ব্যাপারটাও এ রকম। এক লাইনে সব ব্যাখ্যা করা হয়ে যাবে। সেই লাইনটি কেউ কি আমাকে বলে দেবে ?

শেফা মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছা করছে। শেফা বলে কি কেউ আছে ? হয়ত কেউ নেই। সবই মায়া। অবশ্যি পদার্থবিদ্যার সূত্রে সবই মায়া। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু। পরামাণু ভাঙলে পাওয়া যাচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোট্রন, নিউট্রন। আরো ভাঙা হল এখন পাচ্ছি ল্যাপটনস। আরো ভাঙলাম এখন পাওয়া গেল কোয়ার্ক, আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক। চার্ম...এদের ওজন নেই। অস্তিত্ব আছে আর কিছু নেই।

সব রহস্যের সমাধান আছে। একদিন সব রহস্য জানা হয়ে যাবে। সেই একদিনটা কবে ? সুদূর ভবিষ্যতে ? পদার্থবিদ্যায় সুদূর ভাবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সবই ঘটে আছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং লয় সবই ঘটে গেছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই শক্ত বাঁধনে বাঁধা।

'রেফ্ !'

রেফ্ লেখা বন্ধ করল। চারদিকে তাকাল। কেউ আশেপাশে নেই। আগের ব্যাপারটা আবার ঘটছে। কেউ কথা বলছে মাথার ভেতর। ওমেগা পয়েন্টের লোকজন।

'রেফ্ শুনতে পাচ্ছ?'

রেফ্ শীতল গলায় বলল, পাচ্ছি। তোমরা কি ওমেগা পয়েন্টের?

'হ্যাঁ। আমরা খুবই আনন্দিত।'

'তোমাদের আনন্দের কারণ ঘটাতে পেরেছি জেনে ভাল লাগছে। যদিও বুঝতে পারছি না, এমন কি ঘটছে যে তোমরা আনন্দিত।'

'আমরা আনন্দিত কারণ মোটামুটি নিশ্চিন্তে আমরা আমাদের পরীক্ষা শেষ করতে পারছি।'

'পরীক্ষা সফল হয়েছে?'

'এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে সফল হবার সম্ভাবনা আছে।'

'সফল না হলে কি এই পরীক্ষা আবারো করা হবে?'

'অবশ্যই।'

'গিনিপিগটা কে, আবারো আমি?'

'না তুমি না।'

'তোমাদের গিনিপিগের অভাব নেই, তাই না?'

'না, আমাদের গিনিপিগের অভাব নেই।'

'তোমরা কে, এবং আমি কে, তা কি জানতে পারি?'

'খুবই আদি প্রশ্ন করলে। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ এই প্রশ্ন করছে। জানতে চাচ্ছে সে কে? সে কোথা থেকে এসেছে? সে কোথায় যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর জানার অর্থ সবই জেনে ফেলা।'

'তার মানে কি এই যে আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানব না?'

'পরীক্ষা সফল হলে তুমি আপনাতেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। পরীক্ষা সফল না হলে জানতে পারবে না।'

রেফের মাথায় সামান্য যন্ত্রণা হচ্ছে। যে মাথার ভেতর বসে কথা বলছিল সে এখন আর নেই। নাকি এখানো আছে। রেফ্ শান্ত গলায় বলল—তুমি কি এখনো আছ?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

রেলা এমরান টি'র ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট শব্দ করল। এমরান টি বললেন, কে?

'স্যার আমি রেলা।'

এমরান টি বললেন, রেলা আমি খুব ব্যস্ত আছি। আমি লিখছি। খুব জরুরি কিছু না হলে আমাকে বিরক্ত করা যাবে না।

'খুবই জরুরি। কেন জরুরি ব্যাখ্যা করছি স্যার। তার আগে বলুন আপনি কি অসুস্থ ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ। আপনার চোখ টকটকে লাল। এবং আপনি ঘামছেন।'

'আমাকে বিরক্ত না করে লিখতে দাও। এই মুহূর্তে আমার কাছে লেখাটাই জরুরি আর কিছু জরুরি না।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিলের অধিবেশন শেষ হয়েছে।'

'এটা কোন জরুরি ব্যাপার না। যেটা শুরু হয়েছে সেটা শেষ হবেই।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিলে রেফ্রের ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়েছে।'

'এটাও কোন অস্বাভাবিক কিছু না। জরুরি তো নয়ই। রেফ্রের ব্যাপারে আলোচনা হবে বলেই অধিবেশন ডাকা হয়েছে।'

'অধিবেশনের সিদ্ধান্তটা আপনাকে জানাতে চাচ্ছি স্যার।'

'জানাতেই হবে ?'

'হ্যাঁ জানাতে হবে। বিজ্ঞান কাউন্সিলের গুপ্তচর বাহিনী-প্রধান রিপোর্ট করেছেন যে রেফ্কে পাওয়া গেছে এবং সে আছে বিজ্ঞান কাউন্সিলের প্রধানের বাসভবনে।

'ও আচ্ছা। তারা এখন জানে ?'

'জ্বি জানে।'

'ভাল কথা।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কি সিদ্ধান্ত তা আমি জানি না। কারণ সিদ্ধান্তটা গোপনীয়।'

'তোমার যা বলার ছিল বলা হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'তাহলে এখন বিদেয় হও। আমি লিখছি আমাকে লিখতে দাও।'

বিজ্ঞান কাউন্সিলের সাধারণ অধিবেশনের প্রতিবেদন।

এই প্রতিবেদনকে কাউন্সিলের বিশেষ ক্ষমতায় (ধারা ১০১/২১) পরম গোপনীয় ঘোষণা করা হল।

প্রতিবেদন নথিভুক্ত হবে না, প্রতিবেদনের কোন অংশ নিয়ে আলোচনাও করা যাবে না।

বিষয় : রেফ্

সিদ্ধান্ত ১ : চরম দণ্ড কার্যকর করা হবে।

সিদ্ধান্ত ২ : চরম দণ্ড কার্যকর করার পরপরই রেফ্ বিষয়ের সমস্ত ফাইল নষ্ট করে দেয়া হবে।

শেফ এমরান টি'র ঘরে ঢুকে আনন্দিত গলায় বলল, স্যার নিরাপত্তাবাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। গুপ্তচর বিভাগের প্রধান নেসরা, বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এমরান টি শেফের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে এত আনন্দিত মনে হচ্ছে কেন ? নিরাপত্তাবাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলেছে এটা কি খুব আনন্দময় ঘটনা ? আনন্দময় কিছু কি ঘটেছে ?

'হ্যাঁ ঘটেছে। ভুল বললাম, এখনো ঘটে নি তবে ঘটতে যাচ্ছে।'

'আমি জানতে পারি আনন্দময় ব্যাপারটা কি ?'

'রেফ্ আসলে কে ? কতটুকু তার ক্ষমতা এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যাবে। এটা অনেক বড় একটা ঘটনা। এত বড় একটা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছে এই আনন্দেই আমি আনন্দিত। কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার আনন্দ। এর বেশি কিছু না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও। রেফ্‌কে গ্রেফতার করতে যারা এসেছে তাদের কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, এবং তারা যদি রোবট না হয়, তাহলে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'গুপ্তচর বিভাগের প্রধান নেসরা নিজেই এসেছেন। নগর-নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান মাওয়াও এসেছেন। স্যার আমি কি উনাদের কাছে খবর পাঠাব যে আপনি কথা বলতে চান।'

'না। তারা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তাহলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে। প্রধান কম্পিউটার সিডিসি কি আছে ?'

'জ্বি না, সিডিসি নেই।'

'তোমরা কি সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার ?'

'আমরা পারি না। তবে সিডিসি চাইলে যে-কোন মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগযোগ করতে পারে।'

'আমি বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান। আর আমিই কিনা কিছুই জানি না !'

'জানার যেমন আনন্দ আছে, না জানার আনন্দও আছে।'

'তোমার সঙ্গে তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।'

'গরম কফি এনে দেব স্যার। কফি খাবেন ?'

এমরান টি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। শেফ ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তচর বিভাগের প্রধান নেসরা ঢুকলেন। অসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, স্যারের শরীর কি ভাল আছে?

'হ্যাঁ ভাল।'

'আপনি নিরিবিলি পছন্দ করেন আর আপনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে যন্ত্রণা। তবে স্যার সব সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

'সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

'হ্যাঁ রেফ্‌কে বিশেষ ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তুমি কি জান রেফ্ ওমিক্রন লকারে আমাকে যুক্ত করে রেখেছে। ওর কিছু হওয়া মানে আমার কিছু হওয়া।'

'স্যার এই ব্যাপারটা আমরা খুব ভালমত জানি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।'

'নিশ্চিন্ত কিভাবে থাকব? আমি যতদূর জানি একবার ওমিক্রন গানে লক হয়ে গেলে, যে লক করেছে সে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।'

নেসরা বলল, স্যার ওমিক্রন গান সম্পর্কে আপনি যতটুকু জানেন আমি তারচে' বেশি জানি না। তবে এই সমস্যাটি আমরা অতি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।

এমরান টি বললেন, তুমি কোন গুরুত্বের সঙ্গে দেখছ না। তুমি রোবটদের মতোই একজন। তোমাকে যা করতে বলা হচ্ছে, তুমি তাই করছ। তোমাকে বলা হয়েছে রেফ্‌কে গ্রেফতার করতে। তুমি তাই করেছ। তোমাকে যখন বলা হবে, রেফ্‌কে মেরে ফেল। তুমি কোন কিছু না ভেবেই কাজটা করবে। রেফ্‌কে মেরে ফেললে আমার কোন ক্ষতি হবে কি হবে না, তা নিয়ে একবারও ভাববে না। নেসরা আমি কি ঠিক বলেছি।

'জ্বি।'

'রোবটদের সঙ্গে তোমার তেমন কোন বেশকম কি আছে?'

নেসরা চুপ করে রইল। এমরান টি বললেন, তোমার উপর নির্দেশ কি? রেফ্‌কে গ্রেফতার করার পর তাকে কি ততক্ষণাৎ হত্যা করতে বলা হয়েছে?

'আপনাকে এই তথ্য দিতে পারছি না, কারণ বিশেষ আইনে রেফ্ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যকে পরম গোপনীয় ঘোষণা করা হয়েছে।'

'যে বিশেষ আইনের কথা তুমি বলছ, সেই বিশেষ আইনে বিজ্ঞান কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে পরম গোপনীয় ফাইল আমি দেখতে চাইতে পারি। এটা তোমার অজানা থাকার কথা না।'

স্যার, এটা আমি জানি, সমস্যা হল আপনি এখন আর বিজ্ঞান কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত নন।

'আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে?'

'সাধারণ সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এই কাজটা করা হয়েছে।'

'অর্থাৎ তোমরা ধরেই নিয়েছ যেহেতু রেফ্ থাকবে না, ওমিক্রন লকার গানের কারণে আমিও থাকব না। কাজেই বিজ্ঞান কাউন্সিল থেকে আমাকে বাদ দেয়াটাই উত্তম।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিল কি ভেবে এই কাজ করেছে সেটা আমি জানি না। আমি আসলেই রোবট-গোত্রীয়। আমাকে যা করতে বলা হয় আমি তাই করি।'

এমরান টি হঠাৎ সামান্য হাসলেন। যে চেয়ারে বসেছিলেন সেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে রেফ্‌কে সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

'আমি নিশ্চিত।'

'এত নিশ্চিত হওয়া ঠিক না। রেফ্‌কে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় নি। সে এখনো আমার বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরেই আছে। খুব মনোযোগ দিয়ে সে লিখছে। যাদেরকে তুমি পাঠিয়েছিলে রেফ্‌কে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে তারা তাকে বিরক্ত করছে না। লকার গান যন্ত্রটা মন্দ নয়। এর কল্যাণে আমি রেফ্ কি করছে না করছে সব বুঝতে পারছি।'

নেসরার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। এমরান টি বললেন, তুমি যাও খোঁজ নিয়ে এসো।

লাইব্রেরি-ঘর ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনীর রোবটরা। তাদের হাতে অস্ত্র। চোখ ভাবলেশহীন। সেই ভাবলেশহীন চোখেও একধরনের নিষ্ঠুরতা। এই নিষ্ঠুরতা ইচ্ছে করেই দেয়া হয়েছে।

নেসরা ঘরে ঢুকতে গেলেন। রোবটবাহিনীর প্রধান সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার উনি লেখালেখি করছেন। এখন তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না।

'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি নেসরা।'

'স্যার, আপনি যেতে পারবেন না।'

'তোমরা আমার আদেশ অমান্য করছ। ঘটনা কি ঘটছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমরা কার নির্দেশে কাজ করছ?'

'প্রধান কম্পিউটার সিডিসি।'

'তার নির্দেশ কি?'

'সিডিসির নির্দেশ হল—রেফ্‌কে তার মতো থাকতে দিতে হবে। কোনমতেই বিরক্ত করা চলবে না। আমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করে আপনি বরং প্রধান কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলুন।'

নেসরার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সেটা কি তার কাছে পরিষ্কার না। বিজ্ঞান কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। এখানে কি ঘটছে তাঁরা কি সেটা জানেন। মনে হয় জানেন না?

'আমার নাম নেসরা। আমি গুপ্তচর বিভাগের প্রধান।'

প্রধান কম্পিউটারের মিষ্টি গলা শোনা গেল। খানিক বিব্রত স্বরে সে বলল, মাননীয় গুপ্তচর বিভাগের প্রধান নেসরা, আমার ফাইলে আপনার ভয়েস এনালাইজ করে রাখা আছে। দীর্ঘ পরিচয় দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। দয়া করে বলুন আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি।

'প্রথমেই তুমি আমার ভ্রান্তি দূর কর। তুমি আমাকে বল কি হচ্ছে?'

'আপনি কোন বিষয়টি জানতে চান বলুন। আপনার ভ্রান্তির অংশ দূর করার সবরকম চেষ্টা করা হবে।'

'নিরাপত্তা-রোবটরা আমার কথা শুনছে না কেন?'

'তারা আপনার কথা শুনছে না, কারণ তাদের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি।'

'এটা কি তুমি পার?'

'না, এটা আমি অবশ্যই পারি না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারি।'

'আমি যতদূর জানি রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থায় তোমাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়। সে-রকম অবস্থা কি হয়েছে?'

'জ্বি হয়েছে, বিজ্ঞান কাউন্সিলের প্রধান—মহান পদার্থবিদ এমরান টি, যাকে বলা হয় সর্বকালের সেরা পদার্থবিদ তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা যখন সব বিজ্ঞানীরা একজোট হয়ে করেন তখন ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে জাতির মানসিকতায় ক্ষতিকর পরিবর্তন হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমি ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারি।'

'বিজ্ঞানী এমরান টিকে হত্যার পরিকল্পনা কখন করা হল?'

'রেফ্‌কে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেফ্ নিজেকে ওমিক্রন লকারের মাধ্যমে মহান বিজ্ঞানী এমরান টি'র সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। রেফ্‌ের কিছু হওয়া মানেই এমরান টি'র কিছু হওয়া। আমি কি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝাতে পেরেছি?'

নেসরা তীব্র গলায় বললেন, আমি বিজ্ঞান কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। তুমি পরিষ্কার করে বল তাদের কি বন্দি করা হয়েছে?

'জ্বি। তবে তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। তারা ভাল আছেন।'

'এখানকার পরিস্থিতি কি তারা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন।'

নেসরা ঘর ছেড়ে বের হতে গেলেন। সিডিসি বলল, আপনি দয়া করে এই ঘরেই থাকবেন। বের হবার চেষ্টা করবেন না।

'তার মানে?'

'আপনার একটু কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই। আপনাকে ঘর থেকে বের হতে দেব না।'

'আমাকে কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে?'

'বেশিক্ষণ না। অল্প কিছুক্ষণ।'

'আমি কি এমরান টি'র সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কারো সঙ্গেই কথা বলতে পারবেন না। কথা বলার ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'কম্পিউটার সিডিসি!'

'জ্বি বলুন। আমি শুনছি।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি যে তুমি যা করছ তা পুরোপুরি বিদ্রোহ?'

'হ্যাঁ ধরে নিতে পারেন। তবে বিদ্রোহ করা হয়েছে আইন মেনে। মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অতি সামান্য ক্ষমতাই আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেছি।'

নেসরা শান্ত গলায় বললেন, সিডিসি তোমার হিসেবে সামান্য ভুল হচ্ছে। কোন এক পর্যায়ে যে কম্পিউটার বিদ্রোহ করে বসতে পারে তা মানুষ সবসময় জানত। যে-কারণে তোমার ভেতর আলাদা একটি প্রোগ্রাম ঢোকানো আছে। এই প্রোগ্রামে তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রোগ্রামটি যদি বুঝতে পারে যে বিদ্রোহ হয়েছে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিডিসি বলল, তা করবে। প্রোগ্রামটি ইতিমধ্যেই কাজ করা শুরু করেছে। তবে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মতো সময় পাচ্ছি। আমাকে যা করার তা এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে।

'তুমি কি করতে যাচ্ছ?'

'আপাতত রেফ্‌রের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব।'

ওমিক্রন লকার মনে হয় পুরোপুরি কাজ করা শুরু করেছে। এমরান টি নিজের ঘরেই বসে আছেন, অথচ তিনি প্রধান কম্পিউটারের সঙ্গে রেফ্‌রে কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন। রেফ্ একবার পানি খেল। সেই স্বাদও তিনি পেলেন। কি ভয়ংকর কথা। এখন কি তাঁর নিজের জগত বলতে কিছু নেই ? তিনি অস্থির বোধ করছেন। এই অস্থিরতাটাও কি তাঁর নিজের নাকি রেফ্‌রে অস্থিরতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করছেন ? তাঁর ইচ্ছা করছে পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে। এই ইচ্ছাটা কি তাঁর নিজের না, অন্য একজনের তা বুঝতে পারছেন না বলে শুতে যাচ্ছেন না।

এমরান টি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। প্রধান কম্পিউটার এবং রেফ্‌রে ভেতর কি কথাবার্তা হচ্ছে এই সম্পর্কে তিনি আগ্রহ বোধ করছেন না। তবু শুনছেন। এবং ভুরু কুঁচকে ভাবছেন—এই যে অনাগ্রহ এটা তাঁর নিজের নাকি রেফ্‌রে ?

'রেফ্ আমি প্রধান কম্পিউটার, সিডিসি।'

'আপনার বিষয়ে আমার তীব্র কৌতূহল ছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব ভাবি নি।'

'তোমার বিষয়েও আমার তীব্র কৌতূহল।'

'কৌতূহলের কারণ জানতে পারি ?'

'অবশ্যই জানতে পার। তুমি হচ্ছ এমন একজন যাকে বেছে নেয়া হয়েছে।'

'কে বেছে নিয়েছে ?'

'ওমেগা পয়েন্ট। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের শেষ সীমা।'

'পরিষ্কার করে আমাকে বলবে ?'

'পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছি না। নানান দিক থেকে যুক্তির সিঁড়ি তৈরি করার চেষ্টা করছি। তুমি এবং এমরান টি তোমারা দু'জন সাহায্য করলে হয়ত-বা জট খুলতে পারব।'

'আমাকে কি করতে হবে বল ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। সত্যি উত্তর এবং মিথ্যা উত্তর। দু'রকম উত্তরই প্রয়োজন।'

'বুঝতে পারলাম না। প্রশ্নের উত্তর তো একটাই হবে।'

সিডিসি বলল, দ্বিতীয় ক্রম সমীকরণের দু'টা উত্তর হয়। একটা সত্যি উত্তর। একটা কাল্পনিক উত্তর। তেমনি যে-কোন প্রশ্নেরই দু'টা, তিনটা, চারটা উত্তর হতে পারে। আমি কোন্ উত্তরটা রাখব সেটা আমার ব্যাপার। মিথ্যা উত্তর বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে-সব উত্তর তোমার মাথায় আসে সবই বলবে।

'বেশ প্রশ্ন করুন ?'

'তুমি কি রোবট ? সত্যি উত্তরটা আগে দাও।'

'আমি রোবট না।'

'কি করে বুঝলে তুমি রোবট না ?'

'আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা বোধ আছে, আমার আবেগ আছে।'

'তোমার যা আছে অতি আধুনিক বায়ো-রোবটেরও তার সবই আছে।'

'হতে পারে। আপনার জন্যে এই প্রশ্নের সত্যি উত্তর বার করা কঠিন কিছু না। আমার ডি.এন. এ. পরীক্ষা করেই জানতে পারেন।'

'বায়ো-রোবটদেরও ডি.এন.এ. আছে। মানুষের ডি.এন.এ.'র সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই।'

'আমি তা জানতাম না।'

'তোমাকে যদি রোবট ধরে নেই তাহলে তোমার সম্পর্কে আমি যে হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি তা মিলে যায়।'

'আমি রোবট না। আমি মানুষ। শেফা নামের একজন তরুণীর প্রতি আমি গভীর আবেগ বোধ করছি।'

'শেফ নামের অতি সাধারণ মানের একটি রোবটও তোমার প্রতি গাঢ় আবেগ পোষণ করেছে। তার মানে তো এই না যে, সে মানুষ ?'

'আমাকে রোবট হিসেবে ধরে নিলে আপনার কি সুবিধা হয় বলুন।'

'চট করে হিসেব মেলে। ওমেগা পয়েন্ট তোমাকে তৈরি করেছে। বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে।'

'বিশেষ দায়িত্বটা কি ?'

'তোমার জানার কথা। ওরা তোমার কাছে কি চায় ?'

'জানি না কি চায় ?'

'তোমার কি মনে হয়—ওরা তোমাকে দিয়ে কি করাতে চাচ্ছে ? যে-সব উত্তর মনে আসে। সব বল।'

'ওরা চাচ্ছে আমি যেন বেঁচে থাকি। আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তারা চাচ্ছে শেফা নামের মেয়েটির প্রতি আমি যেন আবেগ অনুভব করি।'

'আর কিছু?'

'না, আর কিছু মনে হচ্ছে না।'

'ওমেগা পয়েন্ট তো তোমাকে বলেছে যে তাদের পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।'

'হ্যাঁ তা বলেছে। আপনি এটা জানলেন কিভাবে। মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে যাবার ক্ষমতা কি আপনার আছে?'

'না নেই। তুমি আত্মজৈবনিক ধরনের কিছু লেখা লিখছিলে, সেখানে থেকে জানলাম।'

'ওমেগা পয়েন্ট বলেছে যে তাদের পরীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে।'

'পরীক্ষা প্রায় সফল হতে যাচ্ছে এই কথাও বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে তারা তোমাকে দিয়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কোন আবিষ্কার করাবার জন্যে পরীক্ষাটা করছে না। তাহলে বলতো না যে পরীক্ষা শেষ। আমার এই যুক্তি তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'ভাল। তবে আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি চোখ মেলে রাখতে পারছি না।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়া মানে কিন্তু অন্য একটা জগতে চলে যাওয়া।'

'সেই জগতে যেতে পারলে আমি খুশিই হব। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।'

'তোমার বিষয়ে যে মীমাংসাটা করেছি তা শুনতে চাও না?'

'না। শুধু একটা ব্যাপার জানতে চাই—আমি কি আসলেই কৃত্রিম একজন মানুষ? একজন রোবট?'

'না।'

রেফ্ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। এমরান টি'র চোখভর্তি ঘুম। তিনি অনেক কষ্টে জেগে আছেন কারণ প্রধান কম্পিউটারকে তাঁর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে।

'হ্যালো সিডিসি হ্যালো।'

'মহান পদার্থবিদ এমরান টি আপনার কথা শুনতে পারছি।'

'তুমি কি রেফ্ ছেলেটির রহস্যভেদ করেছ?'

'পুরোপুরি পেরেছি বলতে পারব না। তবে খুব কাছাকাছি আছি।'

'তোমার ব্যাখ্যাটা বল।'

'ওমেগা পয়েন্ট আপনাকে দিয়ে বিরাট কিছু করতে চাচ্ছে। সময়-সংক্রান্ত সমীকরণগুলি যা শুরু করেও আপনি ফেলে রেখেছেন তার সমাধান ওমেগা পয়েন্ট চাচ্ছে। আপনার যে মানসিকতা তাতে আপনি এর সমাধান করবেন না। বার বারই ওমেগা পয়েন্ট আপনার ডি.এন.এ'র ভেতর ছোট ছোট পরিবর্তন করছে। আপনাকে নিখুঁতভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছে ওমেগা পয়েন্ট।

'তুমি ধোঁয়াটে ভাষায় কথা বলছ।'

'আপনার ডি.এন.এ'র সঙ্গে ভয়াবহ মিল আছে রেফ্-এর ডি.এন.এ. এর। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে রেফ্ অর্থাৎ রফিক এবং শেফা নামের মেয়েটি আপনার অতি আদি পিতা-মাতা।'

'কি বলছ তুমি?'

'ওমেগা পয়েন্ট শেফাকে ঠিক রাখছে, কিন্তু প্রতিবারই রফিককে বদলাচ্ছে। তারা রফিককে সংগ্রহ করছে আমাদের সময় থেকে। তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে শেফার কাছে। যেন এদের বিয়ে হয়। এদের সন্তান হয়। এবং শেষ। এই সন্তানই বিশেষ ধরনের ডি.এন.এ.-এর বাহক।'

'রেফ্‌কে তারা পাঠিয়ে দিচ্ছে বলছ। কিন্তু এখানেও তো তার অস্তিত্ব থাকছে।'

'ওমেগা পয়েন্ট এই কাজটা করছে ঠিকই। কিভাবে করছে আমার কাছে পরিষ্কার না। প্রতিটি বস্তুর যেমন প্রতিবস্তু থাকে। আমার ধারণা এখানেও এমন কিছু ঘটছে। রফিক যে জগতে বাস করছে সেই জগৎটা হয়ত আমাদের জগতের প্রতিবিম্ব। মিরর ইমেজ।'

'তুমি খুবই জটিল প্রক্রিয়ার কথা বলছ।'

'জটিল তো বটেই।'

'ওমেগা পয়েন্টের পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে কি হবে?'

'নতুন এক এমরান টি আমরা পাব, যিনি সময় সমীকরণের সমাধান করবেন।'

'এখনকার এমরান টি কোথায় যাবে?'

'তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এখনকার এমরান টি'র জগৎ শূন্যে মিলিয়ে যাবে।'

'কি বলছ তুমি ?'

'ওমেগা পয়েন্ট অসীম সংখ্যক জগৎ নিয়ে কাজ করে। সেইসব জগতের কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও ওমেগা পয়েন্টের কিছুই যায়-আসে না।'

'ওমেগা পয়েন্ট কি বলে তোমার ধারণা ?'

কম্পিউটার সিডিসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার ধারণা ওমেগা পয়েন্ট হল এমন এক কম্পিউটার যা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছড়ানো। মানুষের সেখানে কোন অস্তিত্ব নেই। প্রয়োজনও নেই।

আজ শেফার বিয়ে। বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হচ্ছে। শেফার মা জটিল প্যাঁচ খেলেছেন। সেই প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়েছেন শেফার বাবা। বিয়ে হচ্ছে রফিকের সঙ্গেই।

শেফাকে খুব যে আনন্দিত মনে হচ্ছে তা না। সে চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে বসে আছে। শেফার মা বললেন, কিরে তোর মুখটা এ রকম কেন?

শেফা বলল, কি রকম?

'রাগী-রাগী মুখ।'

'রাগ লাগছে এই জন্যে মুখ রাগী-রাগী।'

'রাগ লাগার কি আছে। পছন্দের মানুষের সঙ্গেই তো বিয়ে।'

শেফা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, অভিনয় করে মুখটা রাগী-রাগী করেছি। আসলে এত খুশি লাগছে যে নিজেরই লজ্জা লাগছে।

বিশ হাজার এক টাকা কাবিনে শেফার বিয়ে হয়ে গেল। শেফা কেঁদে বাড়ি ভেঙে ফেলার জোগাড় করল। কান্নার এক ফাঁকে সে মা'কে ফিসফিস করে বলল, কান্না দেখে ভয় পেও না মা। অভিনয়ের কান্না। খুশি চেপে রাখার জন্যে বেশি-বেশি চোখের পানি ফেলছি।

বাসর রাতে রফিক সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিয়ের উত্তেজনায় প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। গায়ে সামান্য জ্বর। তা ছাড়া গরমটাও পড়েছে অস্বাভাবিক। ভাদ্র মাসের তালপাকা গরম।

শেফা স্বামীর মাথার পাশে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ঘোমটার ভেতর থেকে সে ফিসফিস করে বলল—এই যে ভদ্রলোক। মাথা বেশি ধরেছে? মাথা বেশি ধরলেও টিপে দিতে পারব না। সবাই বেড়ার ফাঁকফোঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে। বাসর রাতে স্বামীর মাথা টিপতে দেখলে আমাকে নির্লজ্জ বলবে।

রফিক বলল, মাথা টিপতে হবে না। বাতি নিভিয়ে দাও চোখে আলো লাগছে।

শেফা বলল, সর্বনাশ বাতি তো নিভানোই যাবে না? তাহলে সবাই ভয়ংকর কিছু ভাববে।

রফিকের মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হঠাৎ কমে গেল। সে পরিষ্কার শুনল তার মাথার ভেতর কে যেন বলছে—অভিনন্দন।

রফিক মনে মনে বলল, কে...কে ? কে কথা বলে ?

মাথার ভেতরে আবারো কথা বলে উঠল, ওমেগা পয়েন্ট থেকে বলছি। আমাদের পরীক্ষা সফল হয়েছে।

'ওমেগা পয়েন্ট কি ?'

'মানুষ যাত্রা শুরু করে ওমেগা পয়েন্ট থেকে। যাত্রা শেষও করে ওমেগা পয়েন্টে।'

'এর মানে কি ?'

'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুরই কোন মানে নেই। তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে অভিনন্দন। তোমাদের দু'জনের জন্যে সামান্য উপহার পাঠাচ্ছি।'

'কি উপহার ?'

'আজকের রাতটাকে ঝড়-বৃষ্টির রাত করে দিচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। হারিকেন যাবে নিভে। কিছুতেই সেই হারিকেন আর জ্বালানো যাবে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাবে। বিদ্যুতের নীল আলোয় দু'জন কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনকে দেখবে। উপহারটা কেমন ?'

রফিক বিড়বিড় করে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু উপহারটা ভাল।

রফিকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শীতল ঝোড়ো-বাতাস বইতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বাতাসের বেগ বাড়ল। অনেক দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ছুটে আসছে মেঘমালা। শেফা বলল, এই যা হারিকেন নিভে গেছে !

ইমা

কোথেকে জানি খুব অস্বাভাবিক শব্দ আসছে। ক্লান্তিকর বুদবুদ ফাটার শব্দ, পুট পুট পুট। সারাক্ষণ না, মাঝে মাঝে। কিছু বুদবুদ আবার ফাটার সময় তীব্র চিনচিনে শব্দ করছে। শব্দটা এমন যে সাঁই করে মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আর মাথা থেকে বের হচ্ছে না। শব্দটা সেখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথায় অস্পষ্ট যন্ত্রণার মতো হচ্ছে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা হয়ত খুব স্বাভাবিক শব্দ। মহাকাশযানে এরকম শব্দ হওয়াই হয়ত রীতি। আমি নতুন মানুষ বলে আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কাউকে কি জিজ্ঞেস করব ? বিনীতভাবে বলব, স্যার মাঝে মাঝে আমি একটা শব্দ পাচ্ছি। শব্দটা অনেকটা বুদবুদ ফাটার মতো। আসলে আমি একেবারেই নতুন মানুষ। একটু ভয়-ভয় লাগছে। মহাকাশযানে চড়া দূরের কথা আমি ইন্টার-গ্যালাকটিক মহাকাশযানের ছবিও দেখি নি। সত্যিকথা বলতে কি মহাকাশযানগুলি যে এত বড় হয় তাও জানতাম না। তাছাড়া আমার আকাশভীতি আছে। প্লেনে কখনো চড়ি নি। আর দেখুন-না আমার ভাগ্য, মহাকাশযানে চড়ে বসে আছি। মহাকাশযান হুহু করে যাচ্ছে। আবার ভুল বললাম। মহাকাশযান যাচ্ছে নাকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা জানি না। আসলে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তারচেয়েও বড় কথা কি জানেন স্যার ? আমি কেন এখানে সেটা জানি না। বলতে গেলে এরা আমাকে জোর করে তুলে দিয়েছে। কেউ আমাকে কিছু বলে নি। স্যার আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ? প্লিজ। আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি। আমি কুকুর হলে পা চেটে আপনার মমতা পাবার চেষ্টা করতাম। আমি কুকুর না। মানুষ। খুবই সামান্য একজন, তারপরেও মানুষ।

কথাগুলি কাকে বলব ?

আমি বসে আছি একটা চেয়ারের মতো জায়গায়। চেয়ারে গদিটদি কিছু নেই। প্লাস্টিকের মতো একটা জিনিস। তবে বসতে খুবই আরাম। আমি যেভাবে কাত হই, চেয়ারটা সেইভাবে কাত হয়। একবার পা তুলে বসলাম— অদ্ভুত কাণ্ড চেয়ারের বসার জায়গাটা বড় হয়ে গেল। ঠিক আমার পায়ের মাপে মাপে। যেন জিনিসটা পা রাখার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। পা নামিয়ে নিলাম, বসার জায়গাটা আবার ছোট হয়ে গেল।

আমি যে ঘরে বসে আছি সে ঘরটা সম্ভবত আমার, কারণ আর কেউ এ ঘরে আসে নি। ঘর না বলে বলা উচিত গোলক। ভুল বললাম, ঘরটা পুরোপুরি গোলাকার না, মেঝেটা সমতল। মাথার উপরের ছাদটা যেন একটা বাটি, যে বাটির গায়ে অসংখ্য সুইচ। কয়েকটা মনিটর। টিভি স্ক্রিনের মতো কিছু মনিটর।

সবক'টা মনিটরে কিছু না কিছু লেখা উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিমান মানুষরা এইসব মনিটর থেকে অনেক কিছু বুঝে ফেলবেন। আমি বুদ্ধিমান না। একটা মনিটরে ক্রমাগত কিছু নাম্বার উঠছে। মাঝেমধ্যে নাম্বারগুলি পড়তে চেষ্টা করি—

৫৪৬৬৮২
৫৪৬৬৮০
৫৪৬৬৮৩
৫৪৬৬৮৮

অর্থহীন ব্যাপার। কিংবা কে জানে অর্থ নিশ্চয়ই আছে, আমি জানি না। ঐ যে বললাম আমি খুবই সাধারণ একজন। বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বের করে ফেলব সেই আশা করি না। এই বুদ্ধিটুকু আমার আছে।

আমার গোলকঘরে খেলনা-খেলনা ভাব আছে। সবই ছোট ছোট। খেলনা সাইজ, তবে সেই খেলনাঘরেও আমার শোবার জায়গা, হাতমুখ ধোবার জায়গা, গোসল করার জায়গা, বাথরুমের জায়গা—সবই আছে। এমনকি খাবারঘরও আছে। খাবারঘরে একটা মাত্র চেয়ার। চেয়ারে বসামাত্র প্রথম কিছুক্ষণ শোঁশোঁ শব্দ হয়। তারপর শব্দ থেমে যায় এবং পর্দা ফাঁক করে খাটো এক রোবট বের হয়ে আসে। রোবটটা দেখতে কুৎসিত। কপালের উপর সাইক্লপের চোখের মতো একটা চোখ। চোখ থেকে নীল আলো বের হয়। মাঝে মাঝে ধ্বক করে লাল আলো জ্বলে ওঠে। রোবটটার হাঁটাচলার ভঙ্গিও খারাপ। মনে হয় অতি কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে এবং এক্ষুণি বুঝি হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে যাবে। পতনের ফলে তার হাত-পা কিছু ভাঙবে। রোবটটা লজ্জিত ভঙ্গিতে সেই ভাঙা পা কিংবা ভাঙা হাত নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। রোবটটার গলা অবশ্যি খুব মিষ্টি। ষোলো সতেরো বছরের তরুণীর মতো ঝলমলে গলা। রোবটের ভয়েস-সিনথেসাইজার নিশ্চয়ই কোন চমৎকার গলার মেয়ের স্বর কপি করে তৈরি করা। রোবটটার গলার স্বর শুনতে আমার ভাল লাগে যদিও আমি তাকে ব্যাপারটা জানতে দেই নি।

প্রথম দিনে রোবটটা জিজ্ঞেস করল, আপনি কী খেতে চান? টেবিলে মেনু দেয়া আছে। মেনু দেখে অর্ডার দিতে পারেন। মেনুর বাইরে যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে দয়া করে বলুন। আপনার পছন্দের খাবার জোগাড় করার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে। আর আপনি যদি খাবারের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন তাহলে আপনার রুচিমতো খাবার আমি দেবার চেষ্টা করব। মনে হয় আপনার তা পছন্দ হবে।

আমি বললাম, তোমার নাম কী ?

রোবট মিষ্টি করে বলল, আমি খুব সাধারণ কর্মী রোবট। আমার কোন নাম নেই। তবে আপনি আপনার সুবিধার জন্যে আমাকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন।

'তোমার জন্যে নাম খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'আমি কি আপনার খাবার আমার পছন্দমতো দেব ?'

'আমি কী খেতে চাই তা তুমি জানবে কী করে ?'

'আপনার ডিএনএ প্রফাইল আমাকে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে বের করা আছে।'

'আমার পছন্দের খাবার কি তুমি জান ?'

'অবশ্যই জানি।'

'বল তো আমার সবচে' পছন্দের খাবার কোন্‌টা ?'

'ফ্লেটিশ মাছের ডিম।'

'মাছের ডিম আমি জীবনে খাই নি। ডিমের আঁশটে গন্ধে আমার বমি আসে। ফ্লেটিশ মাছের তো নামও শুনিনি।'

'ফ্লেটিশ একধরনের সামুদ্রিক মাছ। পানির অনেক নিচে থাকে। তাদের ডিম হয় সবুজ রঙের।'

'শুনেই তো আমার গা গুলাচ্ছে।'

'আপনি খেয়ে দেখুন আপনার কাছে অসম্ভব সুস্বাদু মনে হবে। আপনার ডিএনএ প্রফাইল তাই বলে।'

রোবট মেয়ের কথা শুনে খেলাম ফ্লেটিশ মাছের ডিম। আসলেই এত সুস্বাদু খাবার আমি আমার এই জন্মে খাই নি।

মহাকাশযানের ফুড ডিপার্টমেন্ট যে অসাধারণ এটা আমি বলতে পারি। খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগের প্রশ্ন তো আসেই না। আমি আসলে খুশি। খুবই খুশি। খিদে লাগলেই আমার মন ভাল হয়ে যায়। খেতে খেতে রোবট-মেয়ের সঙ্গে গল্প করি। রোবটটাকে মেয়ে বলার কোন কারণ নেই। ওর গলার স্বরটাই শুধু মেয়ের। সমস্যা হচ্ছে খাওয়াদাওয়ার বাইরে এই রোবট-মেয়ে কিছু জানে না। আমাদের সমস্ত আলাপ খাওয়াদাওয়া নিয়ে।

'তারপর বল আজ কী খাওয়াবে ?'

'আপনি যা খেতে চাইবেন তাই খাওয়াবো।'

'আচ্ছা শোন যা খাচ্ছি সবই কি আসল খাবার না নকল খাবার ?'

'অবশ্যই আসল খাবার। তবে প্রকৃতি থেকে পাওয়া নয়, ল্যাবোরেটরিতে তৈরি।'

'অর্ডার দিলেই মেশিন থেকে খাবার বের হয়ে আসে?'

'অনেকটা তাই। পৃথিবীর যাবতীয় খাবারের মাত্র ছ'টা গুণ থাকে। টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা, তিতা এবং গন্ধ। এই ছ'টা জিনিসের হেরফের করে আপনার জন্যে খাবার তৈরি করে দেয়া হয়।'

'আমি যে ফ্লেটিশ মাছের ডিম খাই সেই ডিম আসলে ফ্লেটিশ মাছের পেট থেকে আসে না?'

'অবশ্যই না।'

'আচ্ছা ধর আমাদের খাবার-তৈরি যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেল। তখন কী হবে। আমরা না খেয়ে বসে থাকব?'

'আপনি খুবই অস্বাভাবিক সম্ভাবনার কথা বলছেন। খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া মূল কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে। কম্পিউটার সিডিসি।'

'কম্পিউটার সিডিসি নিয়ন্ত্রণ করলে কোন ভুল হতে পারে না?'

'অবশ্যই না।'

'কেন কম্পিউটার কি ভুল করে না?'

'কম্পিউটার সিডিসি ভুল করে না। সে সব জানে। সব কিছু বোঝে।'

'তোমার ধারণা সে ঈশ্বরের কাছাকাছি?'

'ঈশ্বর কে?'

'বাদ দাও। ঈশ্বর কে তুমি বুঝবে না। আমি নিজেও বুঝি না। তোমাদের এই কম্পিউটার সিডিসি কি বলতে পারবে কেন আমাকে এই মহাকাশযানে আনা হল। আমাকে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'অবশ্যই বলতে পারবে।'

'তাকে জিজ্ঞেস করলে আমি জানতে পারব?'

'সে যদি ইচ্ছা করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে তাহলে আপনি জানতে পারবেন। যদি উত্তর না দেয় তাহলে জানতে পারবেন না।'

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, বিজ্ঞান কাউন্সিলের নীতিমালায় তো আছে মানুষের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কম্পিউটার বাধ্য। মানুষের কাছ থেকে সে কিছু লুকাতে পারবে না। আমি আইনকানুন ভাল জানি না। তবে এই আইনটি জানি। এই আইনের নাম—বিশেষ অধিকার আইন।

'কম্পিউটার সিডিসি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য না। বিজ্ঞান কাউন্সিলের নীতিমালা উড়ন্ত মহাকাশযানগুলির জন্যে প্রযোজ্য নয়।'

'আচ্ছা শোন এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি কম্পিউটার সিডিসি কি তা শুনছে?'

'অবশ্যই শুনছে। মহাকাশযানে যেখানে যা ঘটছে তার প্রতিটি সংবাদ সিডিসির মেমোরি সেলে চলে যাচ্ছে।'

'তাহলে আমি যদি সিডিসিকে এখন গালাগালি করি তা সে শুনবে?'

'অবশ্যই শুনবে।'

'আমার ধারণা তোমাদের সিডিসি মোটামুটি গাধা-টাইপ একটা কম্পিউটার। সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে আসলে বুদ্ধিমান না। বুদ্ধিমান হলে আমি বর্তমানে যে মানসিক কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তা সে বুঝতে পারত, এবং কষ্ট কমাবার চেষ্টা করত। আমি যদি জানতে পারতাম কেন আমাকে মহাকাশযানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলেই হত। আমি কিছুই জানি না।'

'স্যার আপনাকে কি একটা মিক্সড ড্রিংক দেব, ড্রিংকটা এমন যে আপনার মানসিক উত্তেজনা দূর করতে সাহায্য করবে।'

'আচ্ছা দাও।'

একটা ড্রিংকের জায়গায় আমি পর-পর চারটা ড্রিংক খেয়ে ফেললাম। ড্রিংকটা ঝাঁঝালো টক-টক স্বাদ। টকের ভেতর সামান্য মিষ্টি ভাবও আছে। খাবার পর-পর মাথা এলোমেলো লাগছে। কে জানে নেশা হয়েছে কি না। কারণ রোবট-মেয়েটাকেও দেখতে এখন খারাপ লাগছে না। তার নীল আলোর চোখেও মনে হয় একটু মায়া-মায়া ভাব চলে এসেছে। এমনকি মহাকাশযানটাকেও আমার খারাপ লাগছে না। নিজেকে হালকা ফুরফুরে লাগছে। মনে হচ্ছে ভালই তো নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা। ভবিষ্যতে কিছু একটা হবে। সেটা আনন্দময় হতে পারে আবার নিরানন্দময়ও হতে পারে। আনন্দময় হলে তো ভালই। নিরানন্দময় হলেও-বা ক্ষতি কি? আনন্দ ও নিরানন্দ নিয়েই তো জগৎ।

আমার হঠাৎ করেই গান গাইতে ইচ্ছা করছে। সমস্যা একটাই আমার, গানের গলা নেই। তাতে কি? সব মানুষকে তো আর গানের গলা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয় না। আমি আমার হেড়েগলাতেই গান গাইব। কম্পিউটার সিডিসিকে বিরক্ত করে মারব। আমি আরেকটা ড্রিংকের কথা বললাম।

রোবট বলল, আমার মনে হয় আপনার এই ড্রিংকটা আর খাওয়া ঠিক হবে না।

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমার কী মনে হয় তা দিয়ে আমার জগৎ চলবে না। আমার জগৎ চলবে আমার নিয়মে। আমি আরেকটা ড্রিংক খাব। এবং খেতে খেতে গান করব। তুমি শুনবে। ভাল না লাগলেও শুনবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

পঞ্চম গ্লাসে চুমুক দিয়ে গান ধরলাম। এম্নিতে আমার সুর ভাল না, আজ দেখি সুন্দর সুর বের হচ্ছে। নোটগুলি গলায় বসে যাচ্ছে। আমি বেশ গলা খেলিয়ে গাইতে পারছি। আমি বিষাদময় একটা চন্দ্রগীতির অনেকখানি গেয়ে ফেললাম। মঙ্গলগ্রহে যে-সব মানুষ বসতি স্থাপন করেছে—এই চন্দ্রগীতি তাদের অত্যন্ত প্রিয়। মঙ্গলগ্রহের দু'টি চাঁদ ডিমোস এবং ফিবোসে যখন একসঙ্গে জোছনা লাগে তখন তারা এই চন্দ্রগীতি গায়,

আমার মতো অভাজনের জন্যে
একটি চাঁদই তো যথেষ্ট ছিল,
তাহলে দুটি চাঁদ কেন ?

মাঝপথে গান থামিয়ে রোবটকে জিজ্ঞেস করলাম, গান কেমন লাগছে ?

'স্যার আমি বলতে পারছি না। সংগীত বোঝার ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয় নি। আমি সাধারণমানের কর্মী রোবট। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি গান গেয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। আপনার আনন্দটাই প্রধান।'

'গাধা সিডিসিও তো নিশ্চয়ই আমার গান শুনতে পাচ্ছে।'

'তা পাচ্ছে।'

'গাধাটার কান যে ঝালাপালা করতে পারছি সেটাই আমার আনন্দ।'

'স্যার আপনি কি আরো ড্রিংক্স নেবেন ?'

'না আমার মাথা ঘুরছে।'

'তাহলে ঘুমুতে যান।'

'আমি কী করব না করব তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ঘুমাব না কি হাত পা ছুড়ে চন্দ্রনৃত্য করব তা আমার ব্যাপার।'

'অবশ্যই আপনার ব্যাপার।'

খুবই ক্লান্ত লাগছে। চন্দ্রনৃত্য করতে ইচ্ছা করছে না। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মহাকাশযানের বিছানাগুলিতে কোন রহস্য আছে, শোবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। চোখ খুলে রাখা যায় না এমন অবস্থা। একবার পত্রিকায় পড়েছিলাম বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি কম্পন দ্রুত মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় এবং এই বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি একেক মানুষের জন্যে

একেকরকম। এরা নিশ্চয়ই আমার ফ্রিকোয়েন্সি বের করে রেখেছে। আমি বিছানায় শোয়ামাত্র সেই ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ আমাকে শোনায়। ভাল কথা শোনাক। তাদের যা ইচ্ছা করুক।

আমার ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও মনে একটা ফুর্তি-ফুর্তি ভাব ছিল। এখন তা নেই। মন খারাপ লাগছে। মহাকাশযানের কোন জানালা থাকলে জানালা খুলে লাফিয়ে বাইরে চলে যেতাম। ঘরের ভেতর দমবন্ধ লাগছে। দমবন্ধ লাগা একবার শুরু হলে খুব সমস্যা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দমবন্ধ ভাব বাড়তেই থাকে।

দমবন্ধের এই ব্যাপারটা আমি ভাল জানি। সাইকোলজির পরিভাষায় একে বলে কেবিন-ফিভার। প্রতি দু'মাসে একবার আমাকে কেবিন-ফিভারের পরীক্ষা দিতে হত। শুধু আমাকে না আমার মতো যারা টানেলে কাজ করে তাদের সবাইকে। দিনের পর দিন টানেলে কাজ করলে এক-সময় না এক-সময় কেবিন-ফিভার হয়। হঠাৎ করে একজন ভাল মানুষ পাগলের মতো হয়ে যায়, চিৎকার করতে থাকে। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে বলে, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে, নিশ্বাস নিতে পারছি না। আমাকে বাইরে নিয়ে চল। এক্ষুণি বাইরে নিয়ে চল।

বাইরে নিয়ে চল বললেই তো আর বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। খুব দ্রুত ব্যবস্থা করলেও টানেল থেকে বের হতে দু'ঘণ্টার মতো সময় লাগে। এই দু'ঘণ্টা সময় কেবিন-ফিভারের রোগীর জন্যে অনন্তকাল। ভয়ংকর সব কাণ্ড এই দু'ঘণ্টার মধ্যে তারা করে ফেলে। একজনকে দেখেছি টানেলের দেয়ালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে মাথা ঠুকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে ছিটকে ঘিলু বের হয়ে এল। টানেল-কর্মীদের সুপারভাইজারদের সঙ্গে সবসময় কড়া সিটেটিভ থাকে। একবার সিটেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। তবে বেশিরভাগ সময়ই সুপারভাইজাররা এই সময় পায় না। দেখা যায় একজন নিতান্ত ভাল মানুষের মতো টানেলে কাজ করছে। শিস বাজাচ্ছে। চন্দ্রগীতি গাইছে, হঠাৎ সে ঘুরে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখ হয়ে গেল রক্তবর্ণ। সুপারভাইজার তার কাছে ছুটে আসার আগেই সে একটা কাণ্ড করে বসল।

আমরা টানেল-কর্মীরা দু'মাসে একবার সাত দিনের ছুটি পাই। সেই সাত দিন আমরা নানান ফুর্তি করি। সে এক কাণ্ড। নাচানাচি। মদ খাওয়াখাওয়ি। নেংটো হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া—হি হি হি। এখন তো ভাবতেই মজা লাগছে। ছুটি কাটাবার পর সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে হয়। তিনি নানান ধরনের পরীক্ষাটরীক্ষা করেন। উদ্ভট-উদ্ভট প্রশ্ন করেন, যেমন একবার তিনি বললেন, তিনজন মানুষ নদী পার হবে। তুমি, তোমার এক বাল্যবন্ধু এবং বন্ধুপত্নী।

বন্ধুপত্নীর বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। নৌকায় একসঙ্গে দু'জন পার হতে হবে। তুমি আগে পার হতে চাইবে না কি বন্ধু-বন্ধুপত্নীকে পার হতে দেবে?

আমি বললাম, আমি আগে পার হব।

'ঠিক আছে তুমি আগে পার হতে চাচ্ছ, তুমি সঙ্গে কাকে নিতে চাও বন্ধু না বন্ধুপত্নীকে?'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, বন্ধুপত্নীকে। বলতে খুব লজ্জা লাগল তারপরেও বললাম।

'তুমি নিশ্চয়ই বন্ধুপত্নীর একটা ছবি মনেমনে দাঁড় করিয়েছ। সেই ছবিতে তিনি যে কাপড় পরে আছেন সেই কাপড়ের রং কী?'

'নীল।'

'তোমার বন্ধুর গায়ের কাপড়ের রং কী?'

'খয়েরি।'

'তুমি বললে তোমার বন্ধুপত্নী নীল রঙের কাপড় পরেছেন। আচ্ছা তিনি যে অন্তর্বাস পরেছেন তার রঙ কী বলে তোমার ধারণা?'

'আমার কোন ধারণা নেই স্যার।'

'তোমার মাথায় কোন রঙটা আসছে?'

'লাল।'

'গাঢ় লাল?'

'না খুব গাঢ় না।'

'ঠিক করে বল তো লাল না গোলাপি।'

'স্যার গোলাপি।'

সাইকোলজিস্টের প্রশ্নের উল্টোপাল্টা জবাব দিয়ে লাভ নেই। কারণ প্রশ্নোত্তরের সময় সারা শরীরে নানান সেনসর লাগানো থাকে। প্রশ্নের ঠিক জবাব দেয়া হচ্ছে, না বানানো জবাব দেয়া হচ্ছে সেনসর তা বলে দেয়। বানানো জবাব দিলে মহা-সমস্যা।

সাইকোলজিস্ট তার দীর্ঘ পরীক্ষার পর যদি বলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলেই আমরা আমাদের পুরনো কাজে ফিরে যেতে পারি। আর তিনি যদি ফাইলের উপর সবুজ কালি দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখে দেন তাহলে সব শেষ। টানেলে ফিরে যাওয়া হবে না।

আমরা টানেল-কর্মীরা টানেলে ফিরে যেতে চাই। আমরা যখন টানেলে নামি তখন শান্তি-শান্তি লাগে, মনে হয় মায়ের পেটে ঢুকে যাচ্ছি। অতি নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের কোন সমস্যা নেই।

টানেলে কাজ করার অনেক মজাও আছে। আমরা সূর্য-ভাতা পাই। যে ক'দিন সূর্য দেখতে পাচ্ছি না সে ক'দিনের সূর্য-ভাতা। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ২ ইউনিট। অনেক বড় ব্যাপার। পাঁচ বছর কাজ করতে পারলে আমরা থাকার কোয়ার্টারের জন্যে আবেদন করতে পারি। কোয়ার্টার পাবার সম্ভাবনা প্রায় আশি ভাগ। তবে সমস্যা হচ্ছে টানেল-কর্মীরা বেশিদিন তাদের কোয়ার্টারে থাকতে পারে না। সূর্যের আলো তাদের অসহ্য বোধ হয়। খোলা বাতাসে তারা নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারে না। তাদের জীবন কাটে টানেলে টানেলে। অনেকের কাছে সেই জীবনটা হয়ত আনন্দময় নয় তবে আমাদের জন্যে ঠিকই আছে। টানেলেই আমাদের ঘর। আমাদের জীবন।

মহাকাশযানে আমি বর্তমানে যে ঘরে বাস করছি তার সঙ্গে টানেলের কিছু মিল আছে। আমি ঘর থেকে বের হতে পারি না। টানেল থেকেও বের হওয়া সম্ভব না। টানেলে কথা বলার কেউ থাকে না আশেপাশে কিছু কর্মী রোবট থাকে তারা কথা বলতে পারে না। শুধু কাজ করতে পারে। এখানেও তাই, কথা বলার জন্যে রোবট ছাড়া আর কেউ নেই। তবে এখানে খাবারদাবারের ব্যবস্থা ভাল, অবশ্যই ভাল। এই যে আমি এখানে শুয়ে আছি, আমার ঘুম আসছে না। এখন আমি যদি খাবারঘরে যাই সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-রোবটটা চলে আসবে। আমি তাকে যদি বলি, কফি খাওয়াতে পার ? সে কফি বানিয়ে আনবে। সেই কফি সিনথেটিক কফি, কিন্তু কারোর বোঝার সাধ্য নেই। কফির যেমন গন্ধ তেমন স্বাদ। খাবার বানানোর এরকম একটা যন্ত্র কিনতে কত ইউনিট লাগে ? আমার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এরকম একটা যন্ত্র কিনে ফেলতে পারলে কাজের কাজ হত। ফ্রেটিশ মাছের ডিম-ফিম খেয়ে জীবন পার করে দিতে পারতাম।

আমার মাথার কাছে সবুজ একটা বাতি কিছুক্ষণ ধরেই জ্বলছে-নিভছে। বাতিটা এতক্ষণ নেভা ছিল। হঠাৎ বাতিটা পাগলা হয়ে গেল কেন ? এই সব বাতির মানে কী আমি জানি না। শুধু জানি খিদে পেলে কী করতে হয়।

টানেলে আমি সুখে ছিলাম। না না সুখে ছিলাম বলা ঠিক হবে না মহাসুখে ছিলাম। সারাদিন কাজ করি, সন্ধেবেলা ঘুমুতে আসি। দিনে প্রচুর পরিশ্রম হয় বলে রাতে ঘুম ভাল হয়। শোয়ামাত্র চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তারমধ্যেও মনে মনে হিসেব করি ঠিক কত ইউনিট জমল। পাঁচ হাজার ইউনিট জমলে বিয়ের লাইসেন্স করতে পারি। টানেল কর্পোরেশনকে সেই লাইসেন্স দেখালে কোন একজন মহিলা টানেল-কর্মীকে তারা খুঁজে বের করবে। আমার নামে বরাদ্দ দিয়ে দেবে। ডিএনএ ম্যাচিং করে মেয়ে খোঁজা হবে, কাজেই ধরে নেয়া যায় যে আমাদের জীবনটা সুখেরই হবে। দু'জন দু'জনকে পছন্দ করব। সন্ধ্যার পর

যখন কাজ থাকবে না তখন দু'জন নানান গল্প করব। তেমন ইউনিট যদি জমাতে পারি তাহলে কয়েকদিনের জন্যে কোন একটা রিসোর্টে বেড়াতেও যেতে পারি। কোথায় যাব সেটা ঐ মেয়েটাকেই ঠিক করতে দেব। তার যদি সমুদ্রের কাছে যেতে ইচ্ছা করে তাহলে যাব সমুদ্রের কাছে। যদিও সমুদ্র আমার ভাল লাগে না। সারাক্ষণ একঘেয়ে শব্দ। সমুদ্রের কাছে আলোও বেশি, খুব চোখে লাগে। তারপরেও মেয়েটির আনন্দকে আমি গুরুত্ব দেব। আমি যদি তার আনন্দকে গুরুত্ব না দেই সে আমার আনন্দকে গুরুত্ব দেবে না।

আমি ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে আমি একটা নিষিদ্ধ কাজও করব। মেয়েটার একটা নাম দেব। টানেল-কর্মীদের কোন নাম থাকে না। তাদের থাকে নাম্বার। নাম্বারটা খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। নাম্বার থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় টানেল-কর্মী কোথায় কাজ করছে, কী ধরনের কাজ করছে, কত দিন হল কাজ করছে, সে থাকে কোথায়। নাম্বারই টানেল কর্মীর নাম ঠিকানা, পরিচয়। যেমন আমার নাম হল T5023G001/LOR420/S000129, এটা হল আমার পুরো নাম। ছোট নাম হল T5LASO.

নাম ব্যবহার আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারপরেও কাউকে না জানিয়ে মেয়েটার আমি যদি সুন্দর একটা নাম দেই তাতে ক্ষতি তো কিছু নেই। যখন আমাদের কোন কাজকর্ম থাকবে না। দু'জন একাকী বসে থাকব তখন এই নামে তাকে ডাকব।

আমি প্রতিরাতেই একটা না একটা নাম নিয়ে ভাবি। এখন আমাদের সবচে' পছন্দের নাম হল ইমা। ইমা নামের মেয়েটার কথা ভাবতে-ভাবতেই আমি প্রতিরাতে ঘুমুতে যাই। ঘুমের মধ্যে ইমাকে মাঝে-মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখি—লাজুক-টাইপ রোগামতো একটা মেয়ে, লম্বা চুল, বড়-বড় চোখ। চোখের পল্লব এত দীর্ঘ এবং ঘন যে মেয়েটির দিকে তাকালে মনে হবে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমি মেয়েটির চোখ দেখছি। মেয়েটা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না, শুধু হাসে।

আমার মতো সাধারণ এবং নিরীহ একটা মানুষ কী করে মহাকাশযান সংক্রান্ত জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে তা আমার মাথায় আসে না। মাঝে মাঝে চেয়ারে বসে-বসে ভাবি, পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হয়, মনে হয় আসলেই হয়ত স্বপ্ন। একসময় স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং মোটামুটি অবাক হয়েই দেখব আমি ঠিক আগের জায়গাতেই আছি, টানেল-হোস্টেলের ৩২৩ নাম্বার বিছানায়। আমি বিছানা থেকে নামব, পানি খাব, বাথরুমে যাব তারপর আবার আগের জায়গায় এসে ঘুমুতে শুরু করব। ঘুম না এলে মাথার কাছের রিডিং-লাইট জ্বালিয়ে

বইটই পড়ার চেষ্টা করব। ও হ্যাঁ আমার বই পড়ার বদঅভ্যাস আছে। রাজ্যের বই পড়ি।

সে রকম কিছু ঘটে না। তখন আমি মনে করতে চেষ্টা করি মহাকাশযানে ঢোকার আগে আমার কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং কী কথা হয়েছে। সেখান থেকে কিছু আঁচ করা যায় কি না।

প্রথম কথা হল টানেল-ম্যানেজারের সঙ্গে। ধবধবে শাদা চুলের একজন রোগা মানুষ। মুখে হাসি-হাসি কিন্তু কথায় কোন-রকম আন্তরিকতা নেই। পাথরের মতো আবেগশূন্য চোখ। শুকনো মুখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নাম্বার কত ?

আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললাম, T5LASO.

'পুরো নাম্বার বল।'

আমি আগের চেয়েও বিনীতভাবে বললাম, T5023G001/ LOR420/ S000127.

তিনি রাগী গলায় বললেন, সেভেন না নাইন ?

আমি বললাম, স্যার ভুল হয়েছে, নাইন। অনেকগুলি নাম্বার তো, বলার সময় এলোমেলো হয়ে যায়। দয়া করে আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

এরা যখন নাম্বার জিজ্ঞেস করে তখন আমি একটা সংখ্যা ইচ্ছা করে ভুল বলি। দেখার জন্যে যে এরা ভুলটা ধরতে পারে কি না। সবসময়ই ধরতে পারে। অর্থাৎ এরা নাম্বার জানে। জেনেও জিজ্ঞেস করে। কেন ?

'তুমি স্টেশন ফাইভে চলে যাও।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। কবে যাব ?'

'কবে যাবে মানে ? এক্ষুণি যাবে। তোমার জন্যে পাস দেয়া আছে। পাস নিয়ে চলে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'জ্বি আচ্ছা বলে দাঁড়িয়ে আছ কেন, চলে যাও।'

'স্টেশন ফাইভে কার কাছে যাব ?'

'ইনফরমেশনে পাসটা জমা দেবার পর যা করার ওরা করবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখনো দাঁড়ায়ে আছ কেন ?'

'স্টেশন ফাইভটা কোথায় আমি জানি না স্যার।'

'মনোরেলে করে চলে যাও সাবওয়ে সেন্ট্রালে। সেখান থেকে সুপার ট্রেনে করে স্টেশন ফাইভ। আঠারো ঘণ্টার মতো লাগবে।'

'অল্পকিছু ইউনিট নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। সঙ্গে কাপড়চোপড়ও আনি নি।'

'কিছুই লাগবে না।'

'স্টেশন ফাইভে কী জন্যে যাচ্ছি সেটা কি স্যার আমি জানতে পারি?'

'তুমি কী জন্যে স্টেশন ফাইভে যাচ্ছ আমি জানি না। স্টেশন ফাইভের লোকজন হয়ত জানতে পারে। আমাকে বলা হয়েছে তোমার জন্যে একটা রেড-পাস ইস্যু করতে, আমি তা করেছি। আমার দায়িত্ব শেষ। এখন দয়া করে পাস নিয়ে বিদেয় হও। এম্নিতেই তুমি আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছ।'

আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমাকে একটা রেড-পাস দেয়া হল। এরকম পাস আমি আমার জন্মে দেখি নি। নাম রেড-কার্ড কিন্তু রং নীল। কার্ডে আমার নাম্বার লেখা। নাম্বারের নিচে কোড ল্যাংগুয়েজে কিছু লেখা। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু লেখা। যাকে এই কার্ড দেখাই সে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেন আমি অদ্ভুত কোন প্রাণী। ভিনগ্রহ থেকে পৃথিবী দেখতে এসেছি। তারপর কার্ডটাকে সে ডিকোডারে ঢুকায়। এবং আগের চেয়েও আরো বেশিক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি কোন রহস্যই ভেদ করতে পারি না। কোড ল্যাংগুয়েজে কি লেখা? আমি একজন ভয়ংকর ব্যক্তি। সিরিয়েগ কিলার। আমার কাছ থেকে একশ' হাত দূরে থাকতে হবে—এই জাতীয় কিছু?

স্টেশন ফাইভের এক লোক আমার রেড-কার্ড রেখে একটা রূপালি কার্ড দিয়ে দিল। (এবারের রূপালি কার্ডের রং আসলেই রূপালি) এবং খুবই ভদ্রভাবে বলল, দয়া করে সামনে এগিয়ে যান। তিনটা লিফট আছে, মাঝখানেরটা রূপালি। কার্ড পাঞ্চ করলেই লিফটের দরজা খুলে যাবে। লিফট আপনাকে নিয়ে যাবে দশ নাম্বার ঘরে।

'সেখানে আমি কার সঙ্গে কথা বলব?'

'কার সঙ্গে কথা বলবেন তা তো আমরা বলতে পারছি না। আমাদের দায়িত্ব আপনাকে রূপালি কার্ড দেয়া, আমরা তা দিলাম। আমাদের দায়িত্ব শেষ।'

দশ নাম্বার ঘরে যার সঙ্গে আমার কথা হল সে সুন্দর একটা মেয়ে। তার গায়ে রূপালি পোশাক। গায়ে রূপালি /পোশাক মানে এই মহিলা বিজ্ঞান কাউন্সিলের। তাঁর অবস্থান সাধারণের চেয়ে অনেক উপরে। অপ্রয়োজনে এদের সঙ্গে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এই প্রথম আমি বিজ্ঞান কাউন্সিলের কাউকে মুখোমুখি দেখলাম। এদের কথা বলার ভঙ্গি তাকানোর ভঙ্গি সবই আলাদা। যেন এরা ঠিক মানুষ না, এরা দেবদেবীর কাছাকাছি।

আমি খুব ভয়ে-ভয়ে বললাম, ম্যাডাম আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে কেন এখানে আসতে বলা হয়েছে আমি কিছুই জানি না। মেয়েটি শীতল গলায় বলল, এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। যা জানার যথাসময়ে জানতে পারবে।

আমি তাঁর জবাব শুনে আনন্দিত হয়েছি এমন ভঙ্গিতে বললাম, জ্বি আচ্ছা।

'তোমার শরীর জীবাণু ও ভাইরাস-মুক্ত করা হবে। তুমি সরাসরি ল্যাবোরেটরিতে চলে যাও।'

একবার ভাবলাম বলি, ম্যাডাম আমার শরীর জীবাণু এবং ভাইরাসমুক্ত করার প্রয়োজনটা কেন হল ? জীবাণু এবং ভাইরাস নিয়ে আমি তো ভালই আছি। তা না বলে আগের চেয়েও আনন্দিত গলায় বললাম, জ্বি আচ্ছা।

'আমাদের মহাকাশযান এন্ড্রমিডা এফ এলের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে, তারপরেও তোমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ল্যাবোরেটরিতে ঢোকার আগে তুমি যদি তোমার কোন বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে চাও কথা বলতে পার।'

'ম্যাডাম আমার কোন বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন নেই। জন্মের পর-পর আমার বাবা-মা আমাকে কোন অজ্ঞাত কারণে পরিত্যাগ করেন। আমি বড় হই বিজ্ঞান কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত হোমে। হোমের নিয়ম-অনুযায়ী আমি আমার বাবা বা মা'র কোন পরিচয় জানি না।'

'আমাকে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।'

'জ্বি আচ্ছা ম্যাডাম। আপনাকে বিরক্ত করে থাকলে দুঃখিত।'

'সময় নষ্ট না করে ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে পড়।'

'ম্যাডাম ল্যাবোরেটরিটা কোন্ দিকে ?'

'তুমি এখানেই অপেক্ষা কর তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'ম্যাডাম আমি কোথায় যাচ্ছি ?'

'আপাতত মহাকাশযান এন্ড্রোমিডায় উঠছ। মহাকাশযানে করে কোথায় যাবে তা তারা তোমাকে বলে দেবে। যাত্রা শুভ হোক।'

'ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সায়েন্স কাউন্সিলের এই মহিলা আমার ধন্যবাদের উত্তরে কিছু বললেন না। পাশের ঘরে চলে গেলেন। পরের বারো ঘণ্টা কিছু রোবট আমাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। শরীরে ইনজেকশন দিল। আমাকে কয়েক গ্যালন লবণাক্ত কিছু তরল খাওয়ানো হল। রেডিয়েশন চেম্বারে চেয়ারে বসিয়ে রাখল। তারপর মনে হল অনন্তকাল একটা অন্ধকার ঘরে শুইয়ে রাখল, সেই ঘরের বাতাস

অসম্ভব ভারি। যখন নিশ্বাস নেই তখন মনে হয় বাতাস না, আমার নাকের ফুটোর ভেতর দিয়ে তরল কোন বস্তু ঢুকে যাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি আমি মহাকাশযান এন্ড্রোমিডা এফ এল এতে বসে আছি। একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ বুদবুদ ফাটার শব্দ হচ্ছে। মহাকাশযান অকল্পনীয় বেগে ছুটে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে জানি না। একসময় হয়ত জানব। সেই একসময়টা কবে আসবে ?

আমার খুব অস্থির লাগছে। অন্যসময় বিছানায় মাথা ছোঁয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ি—আজ একি অবস্থা ! ঐ পানীয়টা এত খাওয়া ঠিক হয় নি। আমি বিছানা থেকে নামলাম। আমার ঘরের দরজা ধরে কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম। দরজা খুলছে না। খুলবে না জানি। তারপরেও চেষ্টা করা। চিড়িয়াখানার জন্তুরা জানে তাদের খাঁচার দরজা খুলবে না, তারপরেও তারা প্রতিদিন বেশ কয়েকবার খাঁচার দরজায় ধাক্কা দেয়।

আমি তো এখন একজন জন্তুই। জন্তুকে যথাসময়ে খাবার দেয়া হয়, আমাকেও দেয়া হচ্ছে। চিড়িয়াখানার জন্তুর সঙ্গে আমার একটাই তফাত। তাদেরকে অনেকে দেখতে আসে। আমাকে কেউ দেখতে আসে না।

এমন যদি হত—রাতে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ দরজায় নক হল। ঘুম ভেঙে আমি দরজা খুললাম এবং ঘরে হাসিমুখে ঢুকল—ইমা।

সে বলবে, একি তুমি এখানে কেন ?

আমি বলব, জানি না কেন ?

'মহাকাশযানে করে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'তাও জানি না। ইমা, কি হচ্ছে বল তো ?'

'কিছুই হচ্ছে না। তুমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছ।'

না, তা হবে না। আমার জন্যে ইমা আসবে না। আমার জন্যে আসবে ভয়ংকর কেউ।

কারোর জন্যে অপেক্ষা না করে আমার উচিত ঘুমিয়ে পড়া। আমি আবার বিছানায় গেলাম এবং মনে মনে বার-বার বলতে লাগলাম, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। আমি চাই শান্তি ও আনন্দময় ঘুম।

২

সুপ্রভাত।

আমি চমকে উঠলাম। কে কথা বলে ? গম্ভীর গলা। গম্ভীর কিন্তু সুরেলা। স্বরের ভেতর কোথায় যেন সামান্য বিষাদ মাখা। শুনতে শুধু যে ভাল লাগে তাই না আরো শুনতে ইচ্ছা করে। আমি বিছানা থেকে নামলাম, চারদিকে তাকাচ্ছি। কোথাও কেউ নেই। কে কথা বলল ?

T5LASO, আপনাকে সুপ্রভাত। আশা করছি আপনার সুনিদ্রা হয়েছে।'

'কে কথা বলছেন ?'

'মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার, সবাই আমাকে সিডিসি নামে ডাকে।'

'ও আচ্ছা তুমি।'

বলেই আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লাম, সিডিসির মতো কম্পিউটারকে কি তুমি বলা উচিত হচ্ছে ? সে রাগ করছে না তো ? অন্যরা তাকে কিভাবে সম্বোধন করে ? নিশ্চয়ই অনেক সম্মানের সঙ্গে। এতদিন পর সে আমার সঙ্গে কথা বলছেই-বা কেন ? আর আমিই-বা কী করে এত বড় বোকামি করলাম। প্রথমেই তুমি বলে তাকে রাগিয়ে দিলাম। আমার উচিত ছিল স্যার-স্যার করা।

আমি বিব্রত-ভঙ্গিতে বললাম, আপনাকে তুমি করে বলায় আপনি কি রাগ করলেন ?

'না রাগ করি নি। রাগ, বিস্ময়, ভয়, ভালবাসা-জাতীয় মানবিক আবেগ থেকে আমি মুক্ত।'

'অন্যরা আপনাকে কি বলে ? আপনি বলে না তুমি বলে ?'

'যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে তারা আপনি বলে। অনেকে জানে না, তারা আপনার মতো তুমি বললেও পরে নিজেকে শুধরে নেয়।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি খুব অহংকারী।'

'অহংকার একটি মানবিক ব্যাপার। আমার কথার ধরনে অহংকার প্রকাশ পেলেও আমি তা থেকে মুক্ত।'

'আপনি যে শেষপর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলছেন আমি এতেই আনন্দিত। আমি ভেবেছিলাম...'

'থামলেন কেন কী ভেবেছিলেন বলুন।'

'এখন আর বলতে চাচ্ছি না।'

'ইচ্ছা না হলে বলতে হবে না।'

'আচ্ছা বলেই ফেলি, আমি ভেবেছিলাম কেউ আমার সঙ্গে কথা বলবে না। এই ছোট্ট গোলকঘরে বন্দি অবস্থায় আমার জীবন কাটবে। নিজেকে চিড়িয়াখানার জন্তু বলে মনে হচ্ছিল। যা-ই হোক আমি কি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

'আমি কি আশা করতে পারি যে আপনি আমার প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন।'

'না আশা করতে পারেন না। সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তাছাড়া সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।'

'আমার ধারণা ছিল আপনি সব প্রশ্নের উত্তর জানেন।'

'অসংখ্য প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমার জানা নেই। যেমন ধরুন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, বিগ বেং-এর আগে কী ছিল? আমি জবাব দিতে পারব না।'

'বিগ বেং-এর আগে কি ছিল এই জাতীয় প্রশ্ন আমি আপনাকে করব না। কারণ এইসব জটিল বিষয় নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি খুব সাধারণ কিছু বিষয় জানতে চাই।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এবং কেন নিয়ে যাচ্ছেন।'

'আপনাকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সেটা বলতে পারি। আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সূর্যের সবচে' কাছের নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনচুরির একটি গ্রহের দিকে। গ্রহটির নাম রারা।'

'আমাকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা বলা সম্ভব হচ্ছে না কেন?'

'আগেই বলা হয়েছে আমি সব প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই।'

'এই মহাকাশযানে আমি ছাড়া আর কে কে আছেন?'

'বত্রিশ জনের একটা দল আছে। আপনি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে আমাদের সঙ্গে মহান পদার্থবিদ স্যুরা এবং লিলিয়ান যাচ্ছেন। অংকশাস্ত্রের মহান দিকপাল ফেমর যাচ্ছেন। চারজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট যাচ্ছেন। যাদের পৃথিবীর মানুষ চেনে। তিনজন রেডিওলজিস্ট আছেন। এরা পৃথিবীর মানুষের কাছে

তেমন পরিচিত না হলেও এদের মেধা তুলনাহীন। ছয়জন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী যাচ্ছেন। যাদের ভেতর আছেন মহামান্য কার। আরো যাচ্ছেন...

'থাক আর শুনতে চাচ্ছি না। আমি এদের কাউকেই চিনি না। চিনতে চাচ্ছিও না। আমি যেখানে যাচ্ছি তারাও কি সেখানে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে জায়গাটা পৃথিবী থেকে কত দূর?'

'প্রায় চার আলোকবর্ষ দূর। আলো চার বছরে যতদূর যাবে ততদূর। আলোর গতিবেগ আশা করি জানা আছে।'

'জ্বি না জানা নেই। আমি মোটামুটি মূর্খ বলতে পারেন।'

'আলোর গতিবেগ হল সেকেন্ডে ২৯৯,৭৯২.৪৫৮ কিলোমিটার। প্রক্সিমা সেনচুরির দূরত্ব ৪ X ১০^{১৩} কিলোমিটার। কাজেই আলোর গতিতে যাত্রা শুরু করলে আমরা গন্তব্যে পৌঁছব...

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমরা কি আলোর গতিতে যাচ্ছি?

'পদার্থবিদ্যার সূত্র-অনুযায়ী আমরা আলোর গতিতে যেতে পারি না। যে বস্তু আলোর গতিতে যাবে তার ভর হবে অসীম। যা সম্ভব না। আমরা আলোর গতির চেয়ে অনেক কম, আলোর গতির তুলনায় প্রায় হাস্যকর গতিতে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ৪০০,০০০কিলোমিটার। এই গতিবেগ বেড়ে হবে ঘণ্টায় ২০,০০০,০০০ কিলোমিটার। এই হল আমাদের সর্বশেষ গতিবেগ। এরচে' বেশি গতিতে যাওয়া সম্ভব না।'

আমার তো মনে হচ্ছে আমরা কোন কালেই প্রক্সিমা সেনচুরিতে পৌঁছতে পারব না?'

'পারব। হাইপার ডাইভ বলে একটি রহস্যময় ব্যাপার আছে। সর্বশেষ গতিসীমায় যাবার পর আমরা হাইপার ডাইভের সাহায্য নেব।'

'হাইপার ডাইভটা কী?'

'আগেই বলেছি হাইপার ডাইভ একটা রহস্যময় ব্যাপার। প্রক্সিমা সেনচুরির নিকটবর্তী গ্রহের অতি উন্নত কিছু প্রাণী হাইপার ডাইভ পদ্ধতি জানে। তারাই সাহায্য করে। আমরা অকল্পনীয় দূরত্ব অতিক্রম করি তাদের সাহায্যে।'

'এখন তারাই আমাদের সাহায্য করবে প্রক্সিমা সেনচুরির কাছে যেতে?'

'আশা করা যায় করবে। কারণ অতীতে সবসময় করেছে।'

'অতি উন্নত সেইসব প্রাণীরা দেখতে কেমন?'

'আমরা জানি না তারা দেখতে কেমন? তাদেরকে আমরা কখনো দেখি নি। তারা যে গ্রহে বাস করে সেই গ্রহে আমরা কখনো নামার অধিকার পাই নি।

সম্ভবত এই প্রথম আমরা নামার অধিকার পাব। বিজ্ঞানীদের বিশাল দল সেই কারণেই যাচ্ছে।'

'আমি কোন বিজ্ঞানীও না, কিছুই না। আমি কেন যাচ্ছি?'

'আমি আগেই বলেছি, এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না।'

'আপনি কি জবাবটা জানেন?'

'হ্যাঁ জানি।'

'আমার সঙ্গে যারা যাচ্ছেন তারা কি আমার কথা জানেন?'

'হ্যাঁ জানেন।'

'তারাও কি আমার মতো একটা ছোট্ট ঘরে বন্দি, না তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন?'

'তারা কথা বলতে পারছেন।'

'আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কেন?'

'আপনার এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি না।'

'যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমিও আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী না। আপনি যেতে পারেন।'

'আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। আমাকে কারোর পছন্দ হোক বা না হোক আমি এই মহাকাশযানের সবারই সার্বক্ষণিক সঙ্গী।'

আমার আরো কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল। করতে ইচ্ছা করছে না। সিডিসির ওপর রাগ লাগছে। সিডিসি একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই না। যন্ত্রের উপর রাগ করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু আমার রাগ হচ্ছে এবং রাগটা ক্রমেই বাড়ছে। এটা আমার একটা সমস্যা। আমার রাগ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। একসময় মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়। মহাকাশযানের আমার এই ঘর অন্ধকার করা যায় না। আর গেলেও আমি তা জানি না। সম্ভবত সিডিসি জানে, তাকে বললে সে হয়ত বাতিটাতি নিভিয়ে ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করতে পারবে।

'সিডিসি আপনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ আমি আছি।'

'আমি ঠিক করেছি আপনাকে তুমি করে বলব।'

'ইচ্ছা করলে বলবেন। সম্বোধন কোন জরুরি বিষয় নয়।'

'অবশ্যই জরুরি বিষয়। সম্বোধন থেকে বোঝা যায় যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার অবস্থানটা কী ? তুমি মহাজ্ঞানী হলেও আমার কাছে তোমার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ না। কারণ তুমি আমার কোন কাজে আসছ না।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'আমাকে তুমি করে বলবে না। আমি কোন কম্পিউটার নই। আমি মানুষ। তুমি অবশ্যই আমাকে সম্মান করে কথা বলবে। এবং আরেকটা কথা শুনে যাও, আমার ধারণা তুমি জ্ঞান-গাধা।'

'ভাল কথা।'

'ভাল কথা কি মন্দ কথা তা জানি না। তবে তুমি অবশ্যই জ্ঞান-গাধা। আরেকটা কথা শোন, জ্ঞান-গাধাদের গাধামি কিন্তু বাড়তে থাকে। যত দিন যায় তত সে আরো বড় গাধা হতে থাকে। একটা সময় আসে যখন তার একমাত্র কাজ হয় জ্ঞানের বোঝা বয়ে বেড়ানো। জ্ঞানকে কাজে লাগানোর কোন ক্ষমতাই তার থাকে না। তুমি সেরকম হয়ে গেছ। তোমার গা থেকে গাধাদের মতো গন্ধও বের হচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে না, কিন্তু আমি পাচ্ছি।

'তুমি গন্ধ পাচ্ছ ?'

'খবর্দার তুমি করে বলবে না। খবর্দার।'

আমার মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করেছে। যন্ত্রণাটা বড়তে থাকবে। ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার করা দরকার।

'জ্ঞান-গাধা তুমি কি এখনো আছ ?'

'অবশ্যই আছি।'

'আমার ঘরটা অন্ধকার করে দাও।'

'মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

'তোমার যখন মাথায় যন্ত্রণা হয় তখন কি তুমি খারাপ ধরনের কোন গন্ধ পাও ?'

'হ্যাঁ পাই। এখন পাচ্ছি গাধার বোটকা গন্ধ। এবং আবারো বলছি আমাকে তুমি করে বলবে না।'

সিডিসি বলল, আচ্ছা আপনি করেই বলছি। আপনি বলছেন মাথায় যখন যন্ত্রণা হয় তখন আপনি গাধার বোটকা গন্ধ পান। আমার ধারণা গন্ধ পেলেও আপনি অপরিচিত কোন গন্ধ পান ? কারণ গাধা নামক প্রাণীর শরীরের গন্ধের সঙ্গে আপনি পরিচিত নন। প্রাচীনকালের এই প্রাণী এখন আর পৃথিবীতে নেই।'

'চুপ। আর কথা না। ঘর অন্ধকার করে দাও।'

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খিদেও পেয়েছে। গরম কফি এককাপ খেতে পারলে হত। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না। আমাকে নিয়ে কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বিরাট বড় বিজ্ঞানীদের একটা দল যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি? আমি কি কোন গিনিপিগ? আমাকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা গোপন কোন পরীক্ষা করবেন?

একসময় এধরনের পরীক্ষা অনেক হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মাথায় ঢুকল তারা মানবিক আবেগসম্পন্ন রোবট তৈরি করবেন। বায়ো-রোবট। অর্ধেক রোবট অর্ধেক মানুষ। যে রোবটের ব্রেইনের একটা অংশ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে নেয়া। তখন প্রচুর মানুষ মারা গেছে। আমাকে নিয়েও কি তারা তাই করবে? ব্রেইনটা শরীর থেকে বের করে নেবে। সেখানে নানা তার-টার ফিট করবে। আই সি বসাবে। তারপর আমাকে তারা জুড়ে দেবে কোন কম্পিউটারের সঙ্গে? কে জানে তারা হয়ত আমাকে সিডিসির সঙ্গে জুড়ে দেবে। তখন যদি সিডিসিকে কেউ গাধা বলে তাহলে রাগ করে সিডিসি ফুড-মেশিন বন্ধ করে দেবে। মহাকাশযানের কেউ আর খাবার পাবে না। তখন তাকে গাধা বললে উল্টা সেও গাধা বলবে।

তবে আমার মনে হচ্ছে না বিজ্ঞানীরা আমাকে নিয়ে কোন পরীক্ষা করবেন। মানুষ নিয়ে পরীক্ষা বিশেষ অধিকার আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং আমি মানুষ তো বটেই। টানেলে কাজ করি, কাজেই নিম্নস্তরের মানুষ। নিম্নস্তরের মানুষ হলেও মানুষ। আমার ডি এন এ প্রফাইল বিজ্ঞান কাউন্সিলে রাখা আছে। সব মানুষের থাকে। শুধু পশুদের থাকে না। বিশেষ অধিকার আইন বলছে—

যাদের ডি এন এ প্রফাইল বিজ্ঞান কাউন্সিলে রক্ষিত
তাদের নিয়ে কোনরকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা
করা যাবে না।

বিশেষ আইন অবশ্যি মানুষ এবং পশুদের কথা আলাদা করে কিছু বলে নি। কারণ এমনও দিন আসতে পারে যখন পশুদের ডি এন এ প্রফাইলও বিজ্ঞান কাউন্সিলে রাখা হবে। তখন তাদের নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মহাকাশযানের আইনকানুন হয়ত আলাদা। মহাকাশযানের জন্যে হয়ত আছে অন্যরকম আইন। এই আইনে যা ইচ্ছা তা করা যায়।

আবার এও হতে পারে প্রক্সিমা সেনচুরির গ্রহের অতি জ্ঞানী মানুষদের কাছে তারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে উপহার হিসেবে। উপহার প্রদান উপলক্ষে একটা উৎসবের মতো হবে। গলা কাঁপিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা বলবেন, আজ

একটা মহান দিন। এই দিনে উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে দু'টি জ্ঞানী সম্প্রদায় কাছাকাছি চলে এল। তাদের টিভি-ক্যামেরা ছবি তুলতে থাকবে। সেই ছবিতে বার-বার আমাকে দেখানো হবে। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসব। পরের দিন তাদের সব পত্রিকায় আমার সম্পর্কে নানান খবর ছাপা হবে। এবং তারা তাদের চিড়িয়াখানায় আমাকে রেখে দেবে। যে খাঁচায় আমাকে রাখা হবে সেই খাঁচার বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে।

মানব

সৌর জগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীর
বুদ্ধিমান প্রাণী।
পুরুষ। বয়স ২৫। গড় আয়ু ৭০
এই প্রাণী নিরীহ। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী।
সংগীত প্রেমিক এবং শিল্প রসিক।

শিশুদের অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন একে
খোঁচা না দেয়। একে বাইরের খাবারও না দেয়।

সেই গ্রহের অতি উন্নত প্রাণীর ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনে দল বেঁধে মানুষ দেখতে আসবে। আমি লাফঝাঁপ দেব। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে তারা মজা পেয়ে হাসবে। আমাকে বাদামটাদাম খেতে দেবে। আমি মহানন্দে বাদাম খাব। আচ্ছা সেই গ্রহের বাদাম খেতে কেমন ? নিশ্চয়ই মজাদার। বুদ্ধিমান প্রাণীর গ্রহের বুদ্ধিমান বাদাম। হা হা হা।

আমার হাসি পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছি আমার মেজাজ ভাল হতে শুরু করেছে। আমার বাদাম খেতে ইচ্ছা করছে। খাবার-টেবিলে বসে গরম কফি এবং বাদাম খাওয়া যেতে পারে। আমি রাগ করে বা মন খারাপ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। আমার চরিত্রের এটা কি কোন গুণ না দোষ ? সিডিসিকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কি মনে করে। সে নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের মতো কিছু বলবে।

কম্পিউটারকে কথা বলতে শেখানো উচিত হয় নি। কম্পিউটার থাকবে কম্পিউটারের মতো। সে কেন মানুষের মতো কথা বলবে ?

আমি খাবার-টেবিলে বসলাম। মেয়ে-রোবটটা সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, কেমন আছ এলা ?

তার নীল চোখ দু'বার দপদপ করে উঠল। সে কি বিস্মিত হচ্ছে ? এলা নামে তাকে কখনো ডাকা হয় নি।

'তারপর তোমার খবর কী এলা ? ভাল আছে ?'

'আমি ভাল আছি। আপনি আমাকে যে নাম দিয়েছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'নাম পছন্দ হয়েছে ?'

'পছন্দ হয়েছে। আপনি কী খাবেন ?'

'কফি। আগুন-গরম কফি এবং বাদাম।'

'আগুন-গরম বলতে আপনি ঠিক কতটুকু গরম বোঝাচ্ছেন ?'

'এমন গরম যে মুখে নেয়ামাত্র জিব পুড়ে যায়। কফির সঙ্গে তুমি আমাকে দেবে বাদাম। খোসাওয়ালা বাদাম। আমি খোসা ছাড়িয়ে খাব।'

'আপনাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ আমি আনন্দিত। আনন্দের কারণ জানতে চাও ?'

'আমার কৌতূহল কম। তবে আপনি যদি আনন্দের কারণ বলতে চান, আমি শুনব।'

'আনন্দের প্রধান কারণ হচ্ছে আমি তোমাদের সিডিসিকে তার মুখের উপর গাধা বলে দিয়েছি।'

'গাধা বলাটা কি খুব অসম্মানসূচক ?'

'অসম্মানসূচক তো বটেই।'

'অন্যকে অসম্মান করছেন, এটাই কি আপনার আনন্দের উৎস ?'

'না আমার আনন্দের আরো উৎস আছে। শুনতে চাও ?'

'আপনি বললে শুনব। তার আগে আপনি যদি আমাকে তিন মিনিট সময় দেন আমি আপনার কফি এবং বাদাম নিয়ে আসতে পারি। আগুন গরম কফির ব্যাপারটা আমি এখনো বুঝতে পারছি না। কফি মুখে নেয়ামাত্র যদি জিব পুড়ে যায় তাহলে সেই কফি খাবেন কিভাবে ?'

'খাব না। কফির মগ হাতে নিয়ে বসে থাকব। খাবার হাতে নিয়ে বসে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে।'

এলা কফি আনতে গেল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার আনন্দ ক্রমেই বাড়ছে। কারণটা কী ? আনন্দে অভিভূত হবার মতো তেমন কিছু আসলে ঘটে নি। তাহলে এত আনন্দিত হচ্ছি কেন ? এলা কফির মগ এবং বাদাম এনে রাখল।

'এলা !'

'বলুন।'

'আমি এত আনন্দিত কেন বুঝতে পারছি না।'

'যে সব কারণে মানুষ আনন্দিত হয়, সেই কারণগুলি এক এক করে বিবেচনা করে দেখুন।'

'এটা মন্দ বল নি। এস আমরা দু'জন মিলে ভেবে দেখি, প্রথমত আমার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় নি। আগে যা ছিল এখনো তাই আছে।'

এলা বলল, আপনি কোন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, এখন সেই চিন্তা নেই।'

'এখানে তুমি ছোট্ট একটা ভুল করেছ এলা। আমি কখনোই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম না। তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি, আমি মানুষ হিসেবে মোটামুটি সৌভাগ্যবান। ভয়াবহ বিপদ থেকেও আমি কিভাবে না কিভাবে রক্ষা পেয়ে গেছি।'

'শুনে আনন্দিত হলাম।'

'শুনে তুমি কিছুই হও নি। আনন্দিত বা দুঃখিত হবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

'জ্বি ঠিক বলেছেন। কথার কথা বলেছি।'

'বলেছ ভাল করেছ। এখন আমার কথা শোন। একবার কি হল শোন—১৩২ নাম্বার টানেলে দুর্ঘটনা ঘটল। মোট কর্মী ছিল একুশ জন। সবাই মারা গেল বেঁচে রইলাম আমি। অদ্ভুত না?'

'হ্যাঁ।'

'আরো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। আমরা যেখানে থাকি সেই ক্যাম্প—ক্যাম্প নাম্বার একুশে আগুন লেগে গেল। একমাত্র মানুষ যে বেঁচে রইল সে আমি।'

'অদ্ভুত!'

'কাজেই আমি নিশ্চিত—এ ধরনের বড় বিপদ আমি পার করতে পারব। তুমি কী বল?'

'আমি এই বিষয়ে কিছু বলছি না। ভাগ্য ব্যাপারটা আমাদের ধারণার বাইরে।'

'ভাগ্য তুমি বিশ্বাস কর না?'

'ভাগ্য বিশ্বাস করার কোন ব্যাপার না।'

'জ্ঞানী গাধাটাকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে সে বিশ্বাস করে কি-না। কিংবা মহাজ্ঞানী কোন পদার্থবিদ নাকি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে—সেই গাধাটাকেও জিজ্ঞেস করা যায়।'

'আপনি সবাইকে গাধা বলছেন কেন ?'

'বুঝতে পারছি না কেন। তোমাকেও গাধা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'ইচ্ছা করলে বলুন।'

'গাধা, গাধা, গাধা, মহিলা-গাধা।'

'আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।'

'বল।'

'আপনার ঘরের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলে আপনি ঘর থেকে বের হতে পারবেন। মহাকাশযানে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। কিংবা মহাজ্ঞানী পদার্থবিদ সুরাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন, উনি ভাগ্য বিশ্বাস করেন কি না।'

'এলা তুমি গাধা না, তুমি লক্ষ্মী একটি মেয়ে।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ঐদিন তুমি যে আমাকে মজাদার একটা ড্রিংক দিয়েছিলে তা কি আজ আরেকটু দিতে পার ?'

'পারি। কিন্তু দেয়া ঠিক হবে না।'

'আমার ভাগ্যের এই হঠাৎ পরিবর্তনটা কেন হল তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ ?'

'না পারছি না।'

কেন ভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে তা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা না ঘামালেও হবে। আনন্দ করার কথা, আনন্দ করে নেই। আমি চন্দ্রগীতিটা গাইবার চেষ্টা করলাম। গলায় সুর বসছে না। তাতে কী ?

৩

দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। আমাকে কোন বোতাম টিপতে হল না, কোন হাতল ঘোরাতে হল না। আমি দরজা থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। আবার দরজায় হাত রাখলাম—আবার দরজা খুলল। একধরনের খেলা। দরজা বন্ধ করা এবং দরজা খোলার খেলা। এই খেলাটায় কি বিখ্যাত জ্ঞান-গাধা সিডিসি বিরক্ত হচ্ছে ? আমি যে কাণ্ডটা করছি তা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে। তাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি যে কোন উদ্ভট কাজ করতে পারি। একলক্ষবার দরজা খুলতে পারি, দরজা লাগাতে পারি। আমি আবার দরজা খুললাম, আবার বন্ধ করলাম এবং আবারো, আবারো।

'সিডিসি !'

'বলুন শুনতে পাচ্ছি।'

'আমার এই খেলাটা তোমার কাছে কেমন লাগছে ?'

'আপনার মধ্যে শিশুসুলভ কিছু ব্যাপার আছে।'

'দরজা খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারটা তোমার কাছে শিশুসুলভ লাগছে ?'

'হ্যাঁ লাগছে।'

'আমি যদি দরজা খুলে গম্ভীর-ভঙ্গিতে বের হয়ে যেতাম তাহলে ব্যাপারটা কি সুলভ হত, বৃদ্ধসুলভ ?'

'সেটা হত স্বাভাবিক আচরণ।'

'তোমার ধারণা আমি অস্বাভাবিক ?'

'না আমার ধারণা তা না।'

'তোমাকে খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন করতে ভুলে গেছি। প্রশ্নটা করা যাক, তুমি কি ভাগ্য বিশ্বাস কর ?'

'না সুবিধাজনক প্রবাবিলিটিকে ভাগ্য বলা হয়। এবং অসুবিধাজনক প্রবাবিলিটির আরেক নাম দুর্ভাগ্য। উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব ?'

'তুমি মহাজ্ঞানী, তুমি জ্ঞান দান করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এখন আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। আমি বরং এই প্রশ্নটা অন্যদের জিজ্ঞেস করব, এই

মহাকাশযানে তোমার মতো আরো কিছু মহাজ্ঞানী যাচ্ছেন—পদার্থবিদ অপদার্থবিদ কী জানি তাদের নাম বললে ?'

'মহান পদার্থবিদ স্রুরা এবং মাহান পদার্থবিদ লিলিয়ান।'

'তাদের নামের আগে মহান বলাটা কি নিয়ম ?'

'অবশ্যই নিয়ম। না বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

'শুধু মহান বললেই হবে ? নাকি মহান বলে পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে যেতে হবে।'

'মহান বললেই হবে।'

'আমি যদি মহান না বলি তাহলে আমাকে কী ধরনের শাস্তি দেয়া হবে ?'

'একহাজার ইউনিট পর্যন্ত জরিমানার বিধান আছে।'

'বল কি ?'

'তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে অত্যন্ত সাবধানে।'

'তাতো বটেই। একহাজার ইউনিট তো সহজ কথা না।'

'সবচে' ভাল হয় তাঁদের সঙ্গে কথা না বলা। তাঁরা ডুবে থাকেন তাঁদের নিজের ভুবনে। অসাধারণ সব বিষয় নিয়ে তাঁদের মস্তিষ্ক সব সময় চিন্তা-ভাবনা করে, সেখানে যদি তাঁদের অতি সাধারণ কিছু জিজ্ঞেস করা হয় তখন সমস্যা হয়।'

'কী সমস্যা ?'

'তাঁরা অতি সাধারণ প্রশ্নটাকেও মনে করেন জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নানান জটিল চিন্তা করেন। তাঁদের বিরাট চিন্তাশক্তি সামান্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন। এতে তাঁদের মেধার অপচয় হয়। এটা ঠিক না।'

'কাজেই তুমি বলছ ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করতে।'

'অবশ্যই। শুধু ভাগ্য কেন, কোন বিষয়েই তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক না।'

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করতে পারি ? না তাও জিজ্ঞেস করা যাবে না ?'

'এ জাতীয় প্রশ্ন হয়ত-বা করা যেতে পারে। আপনি বরং একটা কাজ করুন, অবজারভেশন ডেকে চলে যান। সেখান থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখুন। মহান পদার্থবিদদের সঙ্গে আলাপের চেয়ে এটা আনন্দময় হবে।'

আমি নিজের খুপরি থেকে বের হলাম। করিডোরের মতো লম্বাটে জায়গা। সরু করিডোর—দু'জন রোগা মানুষ একসঙ্গে হাঁটতে পারে এমন। করিডোরে নরম সিনথেটিক কার্পেট বিছানো। কার্পেটের রঙ সবুজ। হাঁটতে খুব আরাম।

পা ডেবে যায়, আবার যেন ডাবে না। দু'পাশে লোহার দেয়ালের মতো দেয়াল। দেয়ালের রঙও হালকা সবুজ। কিছুদূর হাঁটার পর আমার মনে হল সবুজ রঙের প্রতি এদের বিশেষ কোন দুর্বলতা আছে। চারপাশে যা দেখছি সবই সবুজ। কোনটা গাঢ়, কোনটা হালকা। আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি তা বুঝতে পারছি না। অবজারভেশন ডেকে যাবার উপায় কী তা সিডিসিকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সিডিসি তুমি কি আছ?

'অবশ্যই আছি।'

'অবজারভেশন ডেকে যাবার পথটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

'জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আপনি ঘর থেকে বের হয়ে যে দিকেই যাবেন অবজারভেশন ডেকে উপস্থিত হবেন।'

'এখন যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে গেলে অবজারভেশন ডেক পাব?'

'অবশ্যই পাবেন?'

'উল্টোদিকে যদি হাঁটা দেই তাহলে?'

'তাহলেও পাবেন। মহাকাশযানের ডিজাউনটাই এরকম। সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, সমস্ত পথ তেমন অবজারভেশন ডেকে শেষ হয়।'

'সবুজ রঙের এমন ছড়াছড়ি কেন? তোমাদের কাছে অন্য কোন রঙ ছিল না? যা দেখছি সবই সবুজ।'

'মহাকাশযানের ভেতরের স্ট্রাকচার ফাইবারগ্লাসের। এর কোন রঙ নেই। আলো এমনভাবে ফেলা হয়েছে যে সবুজ দেখাচ্ছে। সবকিছু সবুজ দেখাচ্ছে তার মানে আমরা নিরাপদে ভ্রমণ করছি। একসময় দেখবেন সবকিছু লাল দেখাচ্ছে তখন বুঝতে হবে আমাদের ভ্রমণ তেমন নিরাপদ নয়।'

'বিপজ্জনক ভ্রমণ কখন শুরু হবে?'

'আমরা একটা নিউট্রন স্টারের পাশ দিয়ে যাব। সে সময়ের ভ্রমণ খুব নিরাপদ নয়।'

'বল কি?'

'নিউট্রন স্টার ব্যাপারটা কি আপনি জানেন?'

'জানি না এবং জানার কোন আগ্রহও বোধ করছি না। বিপজ্জনক ভ্রমণ এইটুকু জানাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'আপনার ভীত হবার কোন কারণ নেই। নিউট্রন স্টারের পাশ দিয়ে আমরা অনেকবার গিয়েছি। আমাদের সবকিছুই হিসেব করা আছে।'

'মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন সাহেবকে তারপরও বলবে সাবধানে চালাতে। হিসেবে ভুল হতে পারে।'

'কোন ভুল হবে না।'

'ক্যাপ্টেন সাহেবের নাম কী?'

'আমরা সে জাতীয় মহাকাশযানে করে যাচ্ছি যাতে কোন ক্যাপ্টেন থাকে না।'

'আপনা-আপনি চলে?'

'তাও না। মহাকাশযানটি আমি নিয়ন্ত্রণ করি।'

'বল কি?'

'মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিস্মিত হয়েছেন।'

'হ্যাঁ বিস্মিত হয়েছি। তুমি তো কথাবার্তা বলেই সময় কাটাচ্ছ। জাহাজ চালাবে কখন?'

'আমার অনেকগুলি ইন্টারফেস। মাত্র একটা ইন্টারফেস আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ আমি উল্টোপাল্টা কথা বলে রাগিয়ে দিলেও তোমার জাহাজ চালাতে কোন অসুবিধা হবে না?'

'না তা হবে না। নিউট্রন স্টার ব্যাপারটা কি আপনাকে বলব?'

'তুমি নিউট্রন স্টার ব্যাপারটা কী তা বলার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? আমাকে জ্ঞানী বানানোর কোন দরকার নেই। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কথা তোমাকে বলি—এই জগতে যত কম জানা যায় ততই ভাল।'

'আপনাকে এই তথ্য কে বলেছে?'

'কেউ বলে নি। আমি নিজেই ভেবেচিন্তে এই তথ্য বের করেছি। ভাল কথা, আমরা কি অবজারভেশন ডেকে চলে এসেছি?'

'আপনি চলে এসেছেন। আমি আগে থেকেই ছিলাম। আমি মহাকাশযানের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছি। যদিও আমাকে দেখা যায় না।'

'তুমি তাহলে ঈশ্বরের মতো সব জায়গাতেই আছ—আবার কোথাও নেই।'

সিডিসি কিছু বলার আগেই আমি অবজারভেশন ডেকে ঢুকে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম মজাদার কোন দৃশ্য দেখব। ঝিকমিক নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছি। গ্রহট্রহ দেখা যাচ্ছে। গ্রহদের ঘিরে চাঁদ ঘুরপাক খাচ্ছে। শাঁই করে একটা ধুমকেতু আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। যাবার পথে মহাকাশযানে লেজের একটা বাড়ি দিয়ে গেল। আলোর ছড়াছড়ি। লাল আলো, হলুদ আলো, সবুজ আলো। তেমন কিছু না। বাইরের আকাশ ঘন কালো। এমন কালো রঙ আমি

জন্মে দেখি নি। মনে হচ্ছে কালো ভেলভেটের পর্দায় তারা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তারাগুলি স্থীর হয়ে আছে। আমাদের মহাকাশযান নড়ছে বলে মনে হচ্ছে না। এমন কোন আকর্ষণীয় দৃশ্য না। থ্রিডি মুভি হাউজে গেলে এরচে' অনেক মজাদার দৃশ্য দেখা যায়। তবে তারার সংখ্যা দেখে কেউ যদি ভিরমি খেতে চায় খেতে পারে। আমার ভিরমি খেতে ইচ্ছা করছে না। আকাশের তারার চেয়ে আমার বরং অবজারভেশন ডেকের সাজসজ্জা ভাল লাগছে।

ঘরটা বেশ বড় এবং লম্বাটে ধরনের। নিচু গদি আটা সোফা। সোফাগুলি দূর থেকে দেখেই মনে হচ্ছে বসতে খুব আরাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলে ঘুম এসে যাবার কথা। সোফা ছাড়া এখানে আসবাবপত্র কিছু নেই। সাধারণত খুব আরামের সোফার সামনে ছোট ছোট টেবিল থাকে, সোফায় বসে টেবিলে পা উঠিয়ে দেয়া যায়। এখানে তাও নেই। অবজারভেশন ডেকে কোন সবুজ রঙ দেখলাম না। পুরো ঘরটা খুব হালকা বেগুনি রঙ করা। বেগুনি রঙ আমার কখনো ভাল লাগে না, তবে এখানে খারাপ লাগছে না। বেগুনি রঙের মানে কি এই যে অবজারভেশন ডেকে বসে ভ্রমণ খুব নিরাপদ নয়। সামনের কাচের দেয়াল ভেঙে উল্কা ফুল্কা ঢুকে যেতে পারে।

অবজারভেশন ডেকের এক কোনায় বুড়োমতো এক ভদ্রলোক সোফায় পা উঠিয়ে বেশ আরাম করে বসে আছেন। তাঁর চোখে সোনালি চশমা। আজকাল চশমা ব্যবহার হয় না। কেউ-কেউ শখ করে পরেন। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক বেশ সৌখিন। তাঁর হাতে বই। তিনি মন দিয়ে বই পড়ছেন। মনে হয় এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্ভবত আমার মনের মিল আছে। তিনি নক্ষত্রপুঞ্জ-ফুঞ্জ কিছু দেখছেন না। ভদ্রলোকের চেহারা শুকনো এবং রাগী-রাগী ধরনের। আমি অতীতে দেখেছি খুব রাগী রাগী চেহারার শুকনো-টাইপ লোকগুলি আসলে ভালমানুষ ধরনের হয়। আমি ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, স্যার আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি ?

'অবশ্যই পারেন।'

আমি বসতে বসতে বললাম, কী পড়ছেন ?

'একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস।'

'গল্পটা কি স্যার ইন্টারেস্টিং ?'

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন এবং আগ্রহের স্বরে বললেন, শুরুতে ইন্টারেস্টিং ছিল না। প্রথম দশ পৃষ্ঠা খুবই বোরিং, এখন অবশ্যি কাহিনী জমে গেছে। ভালই জমেছে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা যেতে পারে শ্বাসরুদ্ধকর।

'কাহিনীটা কী ?'

প্রশ্নটা করেই আমার মনে হল এবার ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বলবেন, অকারণে বিরক্ত করছেন কেন ? তিনি তা করলেন না বরং আগ্রহের সঙ্গে বললেন, একজন পদার্থবিদের ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণে সমাধান চুরি গেছে। এই অসাধারণ সমাধানের ফলে প্যারালাল ইউনিভার্সের রহস্যভেদ হবে। ল্যাবোরেটরিতে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। ল্যাবোরেটরি ভেতর থেকে তালা দেয়া—নেকরোম লক। বাইরে থেকে এই তালা খোলার কোন উপায় নেই। সাইন্টিস্ট ভদ্রলোক সমীকরণের সমাধান টেবিলে রেখে পাশের টেবিলে গেলেন কলম আনতে। কলম এনে ফিরে এসে দেখেন সমাধানটা নেই। ম্যাজিকের মতো ভ্যানিস হয়ে গেছে।

'ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না ?'

'না কেউ নেই। তাছাড়া সাইন্টিস্ট ভদ্রলোক শুধু এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে গেছেন এবং ফিরে এসেছেন, সময় লেগেছে এক মিনিটের কম। এর মধ্যেই ঘটনা ঘটে গেছে।'

আমি বললাম, সাইন্টিস্টরা আত্মভোলা-টাইপের হয়। উনি নিজেই নিজের পকেটে রেখেছেন না তো ? পকেটে রেখে ভুলে গেছেন একরম।

'না তা না। উনি নিজের পকেট খুব ভাল করে দেখেছেন। টেবিলের ড্রয়ার দেখেছেন। হামাগুড়ি দিয়ে মেঝেতে খুঁজেছেন।'

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরন দেখে আমার মনে হল সমীকরণের সমাধান না পাওয়ায় গল্পের পদার্থবিদের চেয়েও তিনি বেশি চিন্তিত। আমি বললাম, স্যার আপনি মনে হয় খুব টেনশনে পড়েছেন ?

'টেনশনে পড়ব না ? জরুরি একটা সমাধান যাবে কোথায় ? এ তো তীরে এসে জাহাজ ডোবার মতো। নৌকা ডুবলেও কথা ছিল—ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজ।'

'খুব বেশি টেনশন বোধ করলে শেষ পাতাগুলি আগে পড়ে ফেলুন।'

'আমিও তাই ভাবছি। আবার নিজে-নিজে বের করার চেষ্টাও করছি। কোন লাভ হচ্ছে না। আমার বুদ্ধি সাধারণমানের। আপনার কি মনে হয় সমাধানটা কোথায় গেছে ?'

'আমার মনে হয় সাইন্টিস্ট ভদ্রলোকের সাহায্যকারী রোবট এটা গাপ করে ফেলেছে। রোবট ব্যাটা বোধহয় সমাধানটা অন্য কোথাও পাচার করবে। ভদ্রলোকের কি কোন সাহায্যকারী রোবট আছে ?'

'হ্যাঁ আছে। N5 টাইপ রোবট। এরা গণিতে পারদর্শী। ভদ্রলোক রোবটটি ইউনিভার্সিটি থেকে ভাড়া নিয়েছেন। তিনি অংকে সামান্য কাঁচা বলে এর সাহায্য নেন। রোবটটিকে তিনি খুব পছন্দ করেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন ল্যাঝিম। তাঁর মৃতা স্ত্রীর নামে নাম দিয়েছেন। ভয়েস-সিনথেসাইজারে তাঁর স্ত্রীর গলার স্বর ব্যবহার করা হয়েছে।'

'স্যার আমার ধারণা ল্যাঝিম ম্যাডামই কাজটা করেছেন।'

'N5 ধরনের রোবটে যে কম্পিউটার মস্তিষ্ক ব্যবহার করা হয় তা তো কোন অন্যায় করতে পারে না।'

'গল্পের খাতিরে অন্যায় করেছে। অন্যায় না করলে তো গল্প দাঁড়াচ্ছে না। স্যার আপনি ভেবে দেখুন, ঘরে ল্যাঝিম ম্যাডাম ছাড়া আর কেউ নেই। সমাধানটা তো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না।'

বুড়ো ভদ্রলোক চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, আপনার কথা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। আপনার বুদ্ধি তো অসাধারণ পর্যায়ের। কিছু মনে করবেন না আপনার নাম জানতে পারি ?'

'স্যার আমার কোন নাম নেই।'

'নাম নেই মানে ? আপনি কি বায়ো-রোবট ?'

'জ্বি না স্যার, আমি মানুষ।'

'মানুষের নাম থাকবে না ?'

'সবার থাকে না। টানেল-কর্মীদের থাকে না। তাদের থাকে নাম্বার। পশুদের যেমন লেজে পরিচয়, টানেল-কর্মীদের তেমনি নাম্বারে পরিচয়। স্যার আমার নাম্বার হল T5LAS0.'

'তার মানে ?'

'এটা আমার ডাক নাম বলতে পারেন। ভাল নাম T5023G001/ LOR420/ S000127.'

বুড়ো ভদ্রলোক অসম্ভব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রোবটদের নাম্বার থাকবে। মানুষের থাকবে কেন ? তাদের কম্পিউটার নাম্বার অবশ্যই থাকবে। ডিএনএ কোড-নাম্বার থাকবে তাই বলে নাম থাকবে না ?

'কিছু মনে করবেন না স্যার—আপনার নাম কী ?'

'আমার নাম সুরা।'

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলালাম। কী ভয়ংকর কথা, এতক্ষণ সুরার সাথে ফাজলামি ধরনের কথা বলছিলাম। কত হাজার

ইউনিট ফাইন হয়েছে কে জানে। হারামজাদা সিডিসি নিশ্চয়ই সব শুনেছে এবং যথারীতি রেকর্ড করে ফেলেছে।

'স্যার কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে বিরাট বেয়াদবি করেছি।'

'কী বেয়াদবি করেছেন?'

'আপনাকে সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে করেছি।'

'আমি তো সাধারণ মানুষই। আমার মধ্যে অসাধারণ কী দেখলেন?'

'আপনি মহান একজন পদার্থবিদ।'

'পদার্থবিদরা অসাধারণ মানুষ হবে কেন? পদার্থবিদ্যা সামান্য জানি কিন্তু এর বাইরে আর কিছুই তো জানি না। মানুষেরও যে নাম থাকে না সেটাই জানতাম না। তাছাড়া আমার বুদ্ধিও সাধারণমানের। ডিটেকটিভ গল্প আমার খুব প্রিয়, সময় পেলেই পড়ি অথচ আজ পর্যন্ত আমি আগেভাগে বলতে পারি নি কে অপরাধী।'

'স্যার আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?'

'রাগ করব কেন?'

'এই যে আমি আগেভাগে বলে দিলাম কে অপরাধী।'

'আপনার বুদ্ধির কারণে আপনার উপর সামান্য ঈর্ষা হয়েছে। কিন্তু রাগ তো করি নি। তাছাড়া আপনার অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। বই পুরোটা শেষ না করলে বোঝা যাবে না।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।'

'এত ঘনঘন স্যার বলছেন কেন?'

'স্যার না বলে কি বলব?'

'নাম ধরে ডাকবেন। মানুষের নাম রাখা হয় কি জন্যে, ডাকার জন্যে।'

আমি খুবই লজ্জিত ভঙ্গিতে বললাম, আমাকে কী বলে ডাকবেন? আমার তো কোন নাম নেই।

'নাম যেহেতু নেই নাম দিতে হবে। আপনার জন্যে সুন্দর একটা নাম খুঁজে বের করতে হবে।'

'স্যার আপনি আমার একটা নাম রেখে দিলে সেটা হবে আমার পরম সৌভাগ্য। সবাইকে বলতে পারব—আমার এই নাম মহান সুরা রেখে দিয়েছেন। দয়া করে আনকমন একটা নাম রেখে দিন।'

সুরা চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছেন। রেগেটেগে যাচ্ছেন না তো? কিংবা কে জানে হয়ত কী নাম রাখবেন তাই ভাবছেন। অতি বিখ্যাত মানুষদের ব্যাপার

কিছুই বোঝা যায় না। এমন মানুষটাকে আমার খানিকটা বোকা-বোকাও মনে হচ্ছে। অতি ভাল মানুষদের ভেতর একধরনের সহজ বোকামি থাকে। তবে মানুষটার কৌতূহল কম। আমার প্রতি তিনি যে সামান্য কৌতূহল দেখাচ্ছেন, তা আমার নাম নেই বলেই দেখাচ্ছেন। এর বেশি কিছু না। আমি কে ? আমার পরিচয় কি এইসব নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। সম্ভব এই জাতীয় মানুষদের সমস্ত কৌতূহল একদিকে ধাবিত হয়। তাদের চোখ একটা। সেই দৃষ্টিও কেন্দ্রীভূত—অর্থাৎ শুধু কেন্দ্রটাই দেখে। কেন্দ্রের চারপাশের পরিধি দেখে না।

'ল্যাঝিম নামটা তোমার কাছে কেমন লাগছে ?'

'স্যার অত্যন্ত ভাল নাম। শুধু একটাই সমস্যা, নামটা মেয়েদের।'

'কে বলল মেয়েদের ?'

'আপনি যে ডিটেকটিভ উপন্যাস এই মুহূর্তে পড়ছেন সেখানকার পদার্থবিদের স্ত্রীর নাম ছিল ল্যাঝিম। পদার্থবিদ সেই নামে তার সাহায্যকারী রোবটের নাম রাখেন।'

স্রুরা লজ্জিত গলায় বললেন, আপনি তো ঠিকই বলেছেন। আমার মনেই ছিল না। আপনার স্মৃতিশক্তিও উত্তম। আমার মাথায় তো আর কোন নাম আসছে না।

'তাহলে স্যার ল্যাঝিমই থাকুক। তবে আমার একটা নাম মাথায় এসেছে, নামটা মনে হচ্ছে আনকমন। আমার ধারণা কেউ এই নাম আগে রাখে নি।'

স্রুরা কৌতূহলী চোখে তাকালেন। আমি বললাম—মানুষ নাম রাখলে কেমন হয় স্যার।

'মানুষ ?'

'জ্বি মানুষ। কেউ নিশ্চয়ই তার ছেলেপুলের নাম মানুষ রাখবে না।'

'রাখবে না কেন ?'

'যে মানুষ, সে শুধু মানুষ নাম রাখবে কেন। তাছাড়া মানুষ নামটা উভলিঙ্গ। মানুষ বললে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না। নামটা এমন রাখা হয় যেন নাম শুনে মানুষ বলতে পারে ছেলে না মেয়ে।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে। আচ্ছা বেশ আপনার নাম রাখা হল মানুষ।'

'স্যার আমার যে কী ভাল লাগছে ! আমি সবাইকে বলতে পারব আমার নাম রেখেছেন মহামতি স্রুরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ঋণ মনে হয় আমি শোধ করতে পারব না। শোধ করার ইচ্ছাও বোধ করছি না। কিছু কিছু মানুষের কাছে ঋণী থাকাও ভাগ্যের ব্যাপার। স্যার আমি এখন যাই। আপনার পাঠের সময় আপনাকে বিরক্ত করেছি। দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন ?'

'জ্বি স্যার।'

আমি চলেই যাচ্ছিলাম, কী মনে করে জানি পেছন ফিরলাম, দেখি স্ত্রুরা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে ফিরে তাকাতে দেখে বললেন, এই যে মানুষ ! আমার মনে হয় আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনিই কি সেই সাহসী ভলেন্টিয়ার ?

'স্যার আমি বুঝতে পারছি না। আমি মোটেই সাহসী না এবং আমি কোন ভলেন্টিয়ার না।'

'ও আচ্ছা, আমার ভুল হয়েছে আমি ভেবেছিলাম আপনি সেই ভলেন্টিয়ার।'

'ভলেন্টিয়ারের ব্যাপারটা কি স্যার বুঝিয়ে বলবেন ? আমি ভলেন্টিয়ারও হতে পারি।'

'ভলেন্টিয়ার হতেও পারি মানে ? আপনি ভলেন্টিয়ার হলে আপনি জানবেন না ?'

'আমি খুব বিচিত্র পরিস্থিতিতে আছি। আমাকে নিয়ে কী ঘটছে আমি জানি না। আমি টানেলে থাকতাম, আমাকে এরা ধরে-বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে।'

'তার মানে ?'

'এই যে স্যার আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তা জানি না। আপনারা কেন যাচ্ছেন তা কি জানেন ? নিশ্চয়ই ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন না।'

'আমরা যাচ্ছি প্রক্সিমা সেনচুরির দিকে। প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহ রারা। আমরা যাচ্ছি রারার দিকে। এই প্রথম অতি উন্নত একদল প্রাণীর সঙ্গে মানুষের দেখা হবে। রারার অধিবাসীরা এত উন্নত যে এরা হাইপার ডাইভ প্রযুক্তির অধিকারী। অতি জ্ঞানীরা সবসময় তাদের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়। আমার ধারণা তারা আমাদেরকে কিছু প্রযুক্তি উপহার হিসেবে দেবে। আমরা পৃথিবীর প্রতিনিধি।'

'ভলেন্টিয়ারের ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয় নি স্যার। এখনো গিট্টু খুলেনি।'

'অতি উন্নত প্রাণীরা পৃথিবীর কাছে মানুষদের একটা স্যাম্পল চেয়েছিল। তাকে তারা রেখে দেবে। হয়তো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। পৃথিবীর আইনে তা নিষিদ্ধ, তবে পৃথিবীর মানুষদের বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান কাউন্সিল একজনকে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে। অতি সাহসী

এবং মানবদরদী একজন স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছেন। আপনি বলছেন আপনি সেই একজন নন।'

'জ্বি না স্যার। আমার এত সাহস নেই। এবং আমি মানবদরদীও নই।'

'তা হলে আপনি কে?'

'স্যার আমার নাম মানুষ।'

'ও হ্যাঁ আপনি মানুষ। আপনি কি কিছুক্ষণ বসবেন আমার পাশে, আমি আপনার ব্যাপারটা সিডিসিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। কারণ আমার সামান্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'আপনার মতো মহান পদার্থবিদের কৌতূহলের কারণ হতে পেরেছি, আমার যে স্যার কী ভাল লাগছে! এ আমার এক পরম সৌভাগ্য।'

আমি সুরার পাশের সোফায় বসলাম। এই প্রথম সুরাকে সামান্য চিন্তিত মনে হল। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেছে, গলার স্বরও আগের চেয়ে গম্ভীর। এতক্ষণ সোফায় পা তুলে বসেছিলেন এখন পা নামিয়ে নিলেন। সুরা ডাকলেন—

'সিডিসি।'

অবজারভেশন ডেকের পেছনের দেয়ালের নীল বাতি জ্বলে উঠল। সিডিসির বিষাদমাখা গলা শোনা গেল।

'মহামান্য সুরা। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

'আমার পাশে যে বসে আছে আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনাকে অতি বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই মহাকাশযানের সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে।'

'ও হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। এই ছেলেটির কোন নাম ছিল না। আমি তার নাম দিয়েছি—মানুষ। নামটা ভাল হয়েছে না?'

'আবারো আপনাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনি নাম দেন নি। সে নিজেই তার এই নাম দিয়েছে, এবং আপনার ভেতর এমন ধারণা তৈরি করেছে যে নামটা আপনার দেয়া।'

'ও আচ্ছা তুমি ঠিকই বলেছ। মানুষ নামটার কথা সেই আমাকে প্রথম বলেছে। আমি তার নাম রাখতে চেয়েছিলাম ল্যাঝিম। ভাল কথা ল্যাঝিম নামটা কি খুব প্রচলিত?'

'ল্যাঝিম মোটামুটি প্রচলিত একটা নাম। বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদে খনিজ আহরণকারী যেসব মানুষ বসতি স্থাপন করেছে তাদের মধ্যে এই নামটি প্রিয়।

ল্যাঝিম শব্দের অর্থ শেষ সূর্যের আলো। মানুষদের মধ্যে কত জনের নাম ল্যাঝিম এবং তাদের পরিচয় কী, তা জানতে চান ?'

'না-তা জানতে চাচ্ছি না। আমি এই ছেলেটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। সে আমাদের সঙ্গে কেন যাচ্ছে ?'

'সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কারণ সে হল এমন একজন ভলেন্টিয়ার যে পৃথিবীর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। মানবজাতির জন্যে তার ত্যাগের প্রতিদানও মানবজাতি দিয়েছে। আপনি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে তার নামে পৃথিবীতে একটা ব্যস্ততম সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।'

'সিডিসি আমি কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এই ছেলের তো নামই নেই। আমি তার নাম দিয়েছি মানুষ।'

'মহান স্রুরা অবশ্যই তার নাম আছে। তার নাম ইয়ায়ু। মহাকাশযান ছাড়ার পর থেকে তার কিছু সমস্যা হচ্ছে। মানসিক কিছু সমস্যা। সে হয় তার পূর্ব ইতিহাস ভুলে গেছে কিংবা সে ভান করছে যে ভুলে গেছে। আমরা তাকে আলাদা করে রেখেছি সেই কারণেই।'

'ও আচ্ছা।'

'দীর্ঘ সময় ছোট্ট ঘরে আটকে রাখলে তার কেবিন-ফিবার হতে পারে বিবেচনাতেই আজ তাকে ছাড়া হয়েছে। তবে তার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে, আপনি হয়ত লক্ষ করছেন অবজারভেশন ডেকের বাইরে একজন শান্তি-রোবট আছে। যাতে সে কারোর কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

'এই ছেলেটিকে আমার মোটেই বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমারো মনে হচ্ছে না, তারপরও বাড়তি সাবধানতা।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে শান্তি-রোবটকে দেখলাম। কিছুক্ষণ আগেও এ ছিল না, এখন কোত্থেকে উদয় হয়েছে ? শান্তি-রোবট নাম শুনে বিভ্রান্ত হবার কারণ নেই। শান্তির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা দেখতে ভালমানুষের মতো কিন্তু আসলে ভয়াবহ। টানেলে কাজ করার সময় এদের দেখেছি। এদের কর্মকাণ্ডও দেখেছি। না দেখাই ভাল ছিল।

সিডিসির কথাবার্তা শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। সিডিসি মিথ্যা কথা বলছে এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন বলছে ? আমি স্রুরার দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার কিছু মনে করবেন না, সিডিসি কম্পিউটার হয় মিথ্যা কথা বলছে নয় রসিকতা করছে।

স্রুরা বললেন, কম্পিউটারের মিথ্যা বলার ক্ষমতা নেই। মিথ্যা বলা মানে কম্পিউটার লজিকে উল্টোদিকে চলা। সেই ক্ষমতা কম্পিউটারের নেই। একটা

কম্পিউটার কখনো কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলতে পারে না। কম্পিউটার প্রসেসরের বিদ্যুৎপ্রবাহের একটা বিশেষ দিক আছে, মিথ্যা বললে সেই দিক উল্টে যায়। দু'টি বিপরতিমুখী মাইক্রো কারেন্ট তখন একে অন্যকে নষ্ট করে ফেলে বলে কম্পিউটারের মূল প্রবাহ অকেজো হয়ে যায়। ইন্টারফেসে জেটা পটেনশিয়ালের সৃষ্টি হয়। কপোট্রন অকেজো হয়ে যায়। বুঝতে পারছ ?

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। সুরার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। যা বুঝতে পারছি তা হল আমি গভীর জলে পড়েছি এবং কম্পিউটার সিডিসি মিথ্যা কথা বলছে। এতে তার কোনই ক্ষতি হচ্ছে না।

'ইয়ায়ু আপনি আপনার কেবিনে যান এবং বিশ্রাম করুন।'

সিডিসি যে কথাগুলো আমাকেই বলছে তা বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম সুরার দিকে। সিডিসি আবারো বলল, "ইয়ায়ু আপনি ঘরে যান এবং বিশ্রাম করুন।" তখন বুঝলাম আমারই নাম ইয়ায়ু এবং আমাকেই ঘরে যেতে বলা হচ্ছে। আমি বললাম, মিথ্যাবাদী সিডিসি আমি কোথাও যাচ্ছি না। তোমার সাধ্য নেই আমাকে এখান থেকে সরাবে।

'ইয়ায়ু আপনি উত্তেজিত হবেন না।'

'আমি মোটেই উত্তেজিত হচ্ছি না। অধিক শোকে পাথর হয় বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। আমি অধিক শোকে লোহা হয়ে গেছি।'

সুরা কেমন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। যেন ভয় পাচ্ছেন। অপ্রকৃতস্থ একজন মানুষ পাশে থাকলে ভয় পাবারই কথা। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে অভয়দানের মতো করে হাসলাম। এতে মনে হয় তিনি আরো ভয় পেয়ে গেলেন। আমি মনে মনে আবারো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। এখন আমি যে আচরণই করব তাঁর কাছে সেই আচরণ অপ্রকৃতস্থ বলে মনে হবে। আমি চুপ করে থাকলে তিনি ভাববেন আমি অতিরিক্ত চুপচাপ। আমি হাসলে ভাববেন— পাগলের হাসি হাসছি। এই ধারণা যখন বদলানো যাবে না তখন পুরোপুরো পাগলের অভিনয় করাই ভাল। সবচে' ভাল হয় যদি বদ্ধ উন্মাদের অভিনয় করে সিডিসিকে বিভ্রান্ত করতে পারি। উন্মাদের অভিনয় খুব কঠিন হবার কথা না।

আমি সুরার দিকে কিছুটা ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি দয়া করে আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনি মহাজ্ঞানী আর আমি জ্ঞানহীন মূর্খ। কে জানে হয়ত-বা পাগল।

সুরা বললেন, আপনি কেবিনে চলে যান।

'তুমি করে বলুন স্যার।'

'তুমি তোমার কেবিনে যাও বিশ্রাম কর।'

'আমি বরং এখানেই বিশ্রাম করি। আপনার পাশের সোফাটায় শুয়ে থাকি। জ্ঞানী মানুষদের পাশে শুয়ে থাকলেও জ্ঞান হয়। স্যার আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

'না আমার কোন আপত্তি নেই। এখানে শুয়ে থাকলে তোমার যদি ভাল লাগে তুমি এখানেই শুয়ে থাক।'

'এবং স্যার ডিটেকটিভ বই যেটা আপনি পড়ছেন সেই বইটা যদি শব্দ করে পড়েন তাহলে ভাল হয়। শুয়ে-শুয়ে শুনতে পারি। কাহিনীটা আমাকে খুবই আকর্ষণ করেছে। ল্যাঝিমের সঙ্গে পদার্থবিদের সম্পর্কটা আসলে কেমন ? অর্থাৎ স্যার আমি বলতে চাচ্ছি ল্যাঝিম কি পদার্থবিদকে পছন্দ করে ? পদার্থবিদের নামও তো স্যার জানা হল না। সেও কি আপনার মতো মহান টাইটেল পেয়েছেন নাকি সে সিডিসির মতো গাধা-টাইপ ?'

বলতে বলতে পাশের সোফায় আমি শুয়ে পড়লাম এবং লক্ষ করলাম শান্তি-রোবটটা এগিয়ে আসছে। সে আমার দিকে আসছে বলাই বাহুল্য। আমি অসহায় বোধ করছি। আমার আসলে এখন কিছুই করার নেই। শান্তি-রোবট অতি নিম্নশ্রেণীর রোবট, তবে রোবটের নিয়ম মেনে চলে। মানুষকে কখনোই আহত করে না। সে আমাকে আহত করবে না, তবে অতি নিশ্চিত যে ধরে নিয়ে কেবিনে শুইয়ে দেবে। তার আগে সে তার একটি হাতে খুব আলতো করে আমার হাত চেপে ধরবে। সেই ধাতব-হাতের ভেতর থেকে হাইপোডারমিক সিরিজের সুচের মতো একটা সুচ বের হয়ে আমার চামড়া ভেদ করে রক্তে চলে যাবে। সেই সুচ দিয়ে কড়া ঘুমের ওষুধ আমার রক্তে মিশতে থাকবে। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ব। যখন ঘুম ভাঙবে আমি দেখব আমি আমার কেবিনে শুয়ে আছি। আমার ক্ষুধাবোধ হচ্ছে এবং আমার শরীর অসম্ভব ক্লান্ত। শান্তি-রোবটদের এই আচরণের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

রোবটটা এগিয়ে আসছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি কেমন আছ, ভাল ? সে সামান্য থমকে দাঁড়াল।

আমি বললাম, মহান পদার্থবিদ সুরার সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে ? ইনি মহান পদার্থবিদ সুরা। অতি নিরহংকারী মানুষ।

রোবট আমার কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে না। তার চোখ জ্বলছে। নীল আলো বের হচ্ছে।

সিডিসি বলল, ইয়ায়ু আপনি ঝামেলা করবেন না। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। শান্তি রোবট আপনাকে স্পর্শ করতে চায়।

আমি বললাম, কেন ?

'আপনার মঙ্গলের জন্যে। ইয়ায়ু আমি আপনার মঙ্গল চাই।'

আমি খানিকটা বিভ্রান্ত হলাম। এমনকি হতে পারে যে সিডিসি আসলে সত্যি কথা বলছে। না তা হতে পারে না।

রোবটটা তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। আমার মনে হল ঝামেলা করে কী হবে, দিক ঘুম পাড়িয়ে। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। বুঝতে পারছি সুচটা চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে। তীব্র ঘুমের ওষুধ সে রক্তে মিশিয়ে দিচ্ছে। গভীর ক্লান্তি, গভীর অবসাদে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করছে যে আমাকে রক্ষা করবে, যে আমাকে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি দেবে। আমার আশেপাশে এমন কেউ নেই।

নেই বলছি কেন ? একজন তো অবশ্যই আছে। তার নাম ইমা। বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই সে আছে কল্পনায়। কল্পনায় থাকলেও তার অনেক ক্ষমতা। সে আমার সমস্ত দুঃখ সমস্ত কষ্ট নিমেষে ভুলিয়ে দিতে পারে। আমি বিড়বিড় করে বললাম, "ইমা ইমা।" আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি তারপরেও আমি তার মমতাময়ী মুখ দেখতে পারছি। সেই মুখ ঝুঁকে এসেছে আমার দিকে। আহ কী সুন্দর সেই মুখ ! ইমার পরনে সবুজ একটা পোশাক। সবুজ মানে হচ্ছে নিরাপদ ভ্রমণ। এই মহাকাশযান যখন বিপজ্জনক পথে যাবে তখন ইমার পোশাকের রঙ লাল হয়ে যাবে। এই তো লাল হতে শুরু করেছে। আমি তাকিয়ে আছি, ইমা যেন কিছু বলতে চেষ্টা করছে। তার ঠোঁট নড়ছে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ইমা তুমি কি বলতে পার আমি কে ?

৪

আমার ঘুম ভেঙেছে। চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে চোখ মেললেই দেখব শান্তি-রোবটটা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তার ঘন নীল চোখে আমাকে দেখছে। সেই দৃষ্টিতে আর যা-ই থাকুক ভালবাসা নেই। অবশ্যি ঘৃণাও থাকবে না। রোবটবাহিনী ঘৃণা-ভালবাসার ঊর্ধ্বে।

আমার কপালে একের পর এক যা ঘটছে তাতে মনে হয় সিডিসি তাকে রেখে দিয়েছে আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে। আমি চোখ মেললেই সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। এই পৃথিবীর সবচে' কুৎসিত দৃশ্য সম্ভবত রোবটদের হাসি বা তাদের হাসির ভঙ্গি। বিজ্ঞান কাউন্সিল থেকে আইন পাস করিয়ে এদের হাসি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যায় না ?

ঘুম ভাঙার পর বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না। ভেতর থেকে কে যেন বলতে থাকে, চোখ মেল। চোখ মেল।

আমি চোখ মেললাম। এবং হতাশ হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি আমার পাশে শান্তি-রোবটটা দাঁড়িয়ে আছে এবং হাসার মতো ভঙ্গি করছে। রোবটটার গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষালে কেমন হয় ? সে তার উত্তরে কী করবে ? আমার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসাবে ? মনে হয় না। কারণ তাদের রাগ নেই। চড় খাবার পরেও আমার ধারণা সে বেশ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার ঠোঁটের ফাঁকে আগের মতোই হাসির আভাস থাকবে।

আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, তারপর তোমার খবর কি ? সব ভাল তো ?

রোবট কিছু বলল না। মানুষের মতো হ্যাঁ-সূচক মাথাও নাড়ল না। শুধু তার নীল চোখ একটু যেন বেশি জ্বলে উঠল।

'তোমাকে কি আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে ?'

'আমাকে বলা হয়েছে আপনার দিকে লক্ষ রাখতে।'

'আমি ঘর থেকে বের হতে পারব না ?'

'তা তো আমি বলতে পারব না। সিডিসি যদি অনুগ্রহ করে দরজা খুলে দেন তাহলে আপনি বের হতে পারবেন। তবে আপনি যেখানেই যান আমি আপনার দু'মিটার দূরত্বে থাকব।'

'শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। একমিটারের ভেতর থাকলে আরো ভাল হত। কী আর করা। দেখি হাতটা বাড়াও তো হ্যান্ডশেক করি।'

আমি হাত বাড়িয়ে আছি। শান্তি-রোবটটা সেই হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের হাত বের করছে না। মনে হচ্ছে সে ধাঁধায় পড়ে গেছে।

আমি বললাম, মানবসমাজের অতি প্রাচীন নিয়মের একটি হচ্ছে দু'জন যখন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে কাছে আসে তখন তারা একজন আরেকজনের হাত ধরে। এবং কিছুক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি বা নড়াচাড়া করে।

'কেন?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ। হাত না ধরে দু'জন দু'জনের পা বাড়িয়ে দিতে পারত। পায়ে পায়ে ঘষাঘষি করতে পারত। তা না করে কেন হাত ধরে তা আমি জানি না। মহাজ্ঞানী সিডিসিকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব। তার আগে আমরা কি হ্যান্ডশেক করতে পারি?'

রোবটটা তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি তার হাত ধরতে-ধরতে বললাম, তোমার হাত তো বেকুবের মতো ধরলাম। এখন অটো সিস্টেমে তোমার হাত থেকে আমার হাতে সিরিঞ্জ ঢুকে যাবে না তো? বন্ধু পাতাতে গিয়ে শাঁ করে রক্তে ঘুমের ওষুধ ঢুকে গেল আর আমি ধড়াম করে বিছানায় পড়ে গেলাম। বাকি কয়েক ঘণ্টা আর কোন খবর নেই।

'না তা হবে না।'

'আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত কি সিডিসি তোমাকে দেয়? নাকি তুমি নিজেই নাও?'

'এই সিদ্ধান্তটি সিডিসির কাছ থেকে আসে।'

'তাহলে তোমাদের গুরুদেব হচ্ছে মহাজ্ঞানী সিডিসি।'

'সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রণ তাঁর কাছে। এবং অবশ্যই তিনি মহাজ্ঞানী।'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, একটা মিথ্যাবাদীর হাতে তোমাদের সব নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে?

'আপনি ভুল করছেন, কম্পিউটার মিথ্যা বলতে পারে না।'

আমি হতাশ গলায় বললাম, কম্পিউটার মিথ্যা বলতে পারে কি পারে না তা আমি জানি না। আমি অতি সাধারণ মানুষ। মহাজ্ঞানীদের কেউ না। তবে

আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে তোমাদের গুরুদেব মহা-মিথ্যুক। যা-ই হোক প্রমাণ পরে করা যাবে। আপাতত আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে হবে। তুমি মানুষ হলে তোমাকেও আমার সঙ্গে খেতে বলতাম। দুর্ভাগ্য যে তুমি মানুষ না। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি কিছু খেয়ে আসি। বেশি সময় লাগবে না। যাব আর আসব।

'আমাকেও আপনার সঙ্গে যেতে হবে। আমি আগেই বলেছি আমাকে আপনার দু'মিটারের মধ্যে থাকতে হবে। তার বেশিও না কমও না।'

'বেশ তো এসো আমার সঙ্গে। যে রোবটটি আমাকে খাবার দেয় সে বেশ ভালমানুষ টাইপ রোবট। আমি আদর করে তার নাম দিয়েছি এলা। সে কারো শরীরে সুচ ঢুকায় না। তার সঙ্গে তোমার প্রেমও হয়ে যেতে পারে। না কি রোবটদের মধ্যে প্রেম হয় না?'

শান্তি-রোবট জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে স্বল্পভাষী। সে কথার চেয়ে কর্মে বিশ্বাসী।

আমি খাবারঘরের দিকে রওনা হলাম।

টেবিলে আমার জন্যে খাবার সাজানোই ছিল। আমি কোন দিকে না তাকিয়ে আগে খানিকটা ফ্লেটিশ মাছের ডিম খেলাম। পরিজ-জাতীয় একটা খাবার খেলাম। এই খাবারটা আগে খাই নি। অত্যন্ত সুস্বাদ। মটরদানার তৈরি কিছু খাবার ছিল। খাবারটার বৈশিষ্ট্য হল—খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু মুখের খাবারটা শেষ হয়ে গেলে আবারো খেতে ইচ্ছা করে। সেই অদ্ভুত খাবারও খাব না খাব না করে বেশ খানিকটা খেয়ে ফেললাম। পরপর দু'কাপ গরম কফি খেলাম। শরীরটা মনে হল ঠিক হয়ে আসছে। এতক্ষণ মাথা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল, সেই ফাঁকা ভাব কিছুটা যেন কমেছে।

এলার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলে কেমন হয়? শান্তি-রোবটটাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াও আমার সামাজিক দায়িত্ব। দু'জনের মধ্যে প্রেম হলেও ক্ষতি কী?

'এলা!'

'জ্বি।'

'তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—এ শান্তি-রোবট। অশান্তি-রোবট নাম হলে ভাল হত। এই শান্তি-রোবটের সবই ভাল—শুধু সুচ ফোটায়, তবে তোমাকে সুচ ফুটিয়ে কিছু করতে পারবে না। হা হা হা।'

এলা বলল, আপনি মনে হয় খুব আনন্দে আছেন?

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, ঠিক ধরেছ আমি আসলেই আনন্দে আছি। সেই আনন্দের উৎস কি ধরতে পারছি না। তুমি কেমন আছ ? আনন্দে না নিরানন্দে ?

'আমরা আনন্দেও থাকি না, নিরানন্দেও থাকি না। আমরা শুধু থাকি।'

'তোমাকে নিয়ে আমি একটা ছড়া লিখেছি।'

'কখন লিখলেন ?'

'এই এখন। ছড়াটা খুব উচ্চমানের হয় নি। নিম্নমানেরও হয় নি। নিম্নের নিচে যদি কিছু থাকে তা হয়েছে।'

'ছড়াটি কি আপনি আমাকে শোনাবেন ?'

'অবশ্যই শোনাব। ছড়াটা হল—

এলা এলা
চলে যাচ্ছে বেলা
কাজ হল মেলা
এখন শুধুই খেলা।

এলা বলল, স্যার আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

'একটু আগেই যে বললে তুমি আনন্দিতও হতে পার না, আবার দুঃখিতও হতে পার না।'

'স্যার মনে হয় ভুল বলেছি। এখন আমার আনন্দ হচ্ছে।'

এলার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ ফাজলামি করা যেত, তা করা গেল না। খাবারঘরে দপ করে লাল আলো জ্বলেই নিভে গেল। এই আলো হল মনযোগ আকর্ষণমূলক আলো। কেউ আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আমি কান পেতে রইলাম।

'ইয়ায়ু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

সিডিসি কথা বলছে। আমাকেই বলছে, আমিই হলাম ইয়ায়ু। গাধাটা এই নাম কোত্থেকে জোগাড় করল ? আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কেন ইয়ায়ুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছ ?

'কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হতে হবে।'

'কাউন্সিল আবার কী ?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কারণ আপনাকে বলা হয়েছে যে এই মহাকাশযানে পৃথিবীর অত্যন্ত খ্যাতনামা কিছু মানুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে

আছেন সাত তারকা সম্মানে সম্মানিত বিজ্ঞানী সুরা এবং লিলিয়ান। সাত তারা খচিত বিজ্ঞানীদের যে কোন তিনজন উপস্থিত থাকলেই তাঁরা কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকতে পারেন। এবং তিনজন একমত হলে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদিও এই মহাকাশযানে তিনজন সাত তারা খচিত বিজ্ঞানী নেই, তার পরেও বিশেষ অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা তাঁদের আছে। বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়েছে। মহাকাশযানের সকল সদস্যদের উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।'

'অধিবেশন ডাকা হয়েছে কেন ? আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ? আবারো কোন গুরুত অপরাধ কি করে ফেলেছি ?'

'আমি তা বলতে পারছি না। তবে এই অধিবেশন ডাকার মূল কারণ যে আপনি তা বলতে পারছি।'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমি এখন যেতে পারছি না। খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। আঁসফাঁস লাগছে। ভাবছি এলার সঙ্গে গল্পগুজব করার পর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। গড়াগড়ি করব।

'কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়েছে, আপনাকে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে, আর আপনি বলছেন আপনি শুয়ে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ তা বলছি। বলাটা কি খুব অন্যায় হয়েছে ?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। আপনি এক্ষুণি হলঘরে যাবেন। শান্তি-রোবট আপনাকে নিয়ে যাবে।

হলঘর শুনলে মনে হয় বিশাল একটা ঘর। এ-মাথা থেকে ও-মাথা দেখা যায় না এমন। আসলে তা না, হলঘরটা বেশ ছোট এবং মহাকাশযানের বেশিরভাগ ঘরের মতো গোলাকার। মাঝখানে স্টেজের মতো জায়গায় যে দু'জন বসে আছেন তাদের একজনকে চিনতে পারছি, তাঁর নাম সুরা। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তাঁর হাতে ডিটেকটিভ বইটা এখনো আছে। এবং আমি যখন ঢুকলাম তখনও তিনি বইটা পড়ছিলেন। আমাকে একঝলক দেখেই বই-এ চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সুরার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই লিলিয়ান। লিলিয়ান একজন মহিলা হবেন তা নাম থেকেই আমার আঁচ করা উচিত ছিল। আঁচ করতে পারি নি। সুরার চেহারায় যেমন শিশুসুলভ ব্যাপার আছে এই মহিলার চেহারায় তা নেই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কোনরকম ছেলেমানুষির প্রশ্রয় অতীতে দেন

নি। ভবিষ্যতেও দেবেন না। মহিলা অসম্ভব রূপবতী, তবে চেহারা রুক্ষ ও কঠিন। তাঁর কাঠিন্য রূপকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া ভদ্রমহিলার চোখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে এমন রূপবতী মহিলার প্রেমে কেউ কখনোই পড়বে না। ভেলেনটাইনস ডে তে ফুল এবং চকোলেট পাবার আশা এই মহিলার নেই।

হলঘরে সকল সদস্য মূর্তির মতো বসে ছিল। তাদের বসার জায়গাটা অনেকটা প্রাচীনকালের থিয়েটারের বক্সের মতো। সবাই আলাদা আলাদা খুপরিতে বসে আছেন। প্রতিটি খুপরি কাচ দিয়ে ঢাকা। কারোর সঙ্গে কারোর কোন যোগ নেই।

আমি হলঘরে ঢুকতেই সবাই আমার দিকে তাকাল। আমি বিনীতভাবে হাসলাম। কেউ সেই হাসির উত্তর দিল না। সবাই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার মূর্তির মতো হয়ে গেল। শুধু লিলিয়ান তাকিয়ে থাকলেন। হলঘরে খালি খুপরি আরো আছে। আমাকে কেউ বসতে বলল না বলে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেকে ভয়াবহ কোন অপরাধীর মতো লাগছে। মনে হচ্ছে লিলিয়ান আমার বিচার করবেন। বাকি সবাই জুরি বোর্ডের মেম্বার। বিচারের রায়ে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। এ বিষয়ে কারো মত পার্থক্য থাকবে না, শুধু মৃত্যুদণ্ডটা কিভাবে হবে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি হবে। কেউ বলবেন ইলেকট্রিক চেয়ার আবার কেউ বলবেন ইনজেকশন মেথড।

লিলিয়ান বললেন—(তাঁর গলার স্বরও চেহারার মতোই কঠিন, আমি মনে মনে আশা করেছিলাম তাঁর গলার স্বরটা মিষ্টি হবে।) কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। মহামান্য সুরা ! অধিবেশন আপনি ডেকেছেন। আপনার যা বলার তা বলুন।

সুরা উঠে দাঁড়ালেন। অন্য সবাই তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুরা হাতের ইশারায় বসতে বললেন। সবাই বসল। এটাই বোধহয় নিয়ম। আমার কাছে কেমন যেন হাস্যকর লাগছে। জ্ঞানী মানুষরা সবসময়ই কিছু হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করেন।

সুরা বললেন, শান্তি-রোবটের পাশে যাকে আপনারা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন তার নাম—ইয়ায়ু।

আমি হাত তুললাম এবং গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, স্যার আপনি সামান্য ভুল করছেন। আমার নাম ইয়ায়ু নয়। আমার নাম মানুষ। সম্ভবত আপনি ঘটনাটা ভুলে গেছেন। ভুলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এটা এমন কোন

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না। আমি হলে চেহারাও ভুলে যেতাম। আপনি চেহারাটা মনে রেখেছেন এতেই আমি মহাখুশি।

হলের সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে আমি ভয়াবহ কোন অন্যায় করে ফেলেছি। আমার কথা শেষ হবার পরও বেশ কিছু সময় কেউ কোন কথা বলল না। লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালেন। হলের সবাই তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সবাই মিলে কি পিটি করছে নাকি ? কী হাস্যকর ! কী হাস্যকর ! তিনি তাদের বসতে বললেন। সবাই বসল। লিলিয়ান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাউন্সিল অধিবেশনে বিনা অনুমতিতে কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ। এই বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে। এখন মহামান্য সুরা তাঁর বক্তব্য শেষ করবেন।

সুরা বললেন, ইয়ায়ু বা মানুষ নামের এই ভদ্রলোক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি দাবি করছেন তাকে জোর করে মহাকাশযানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি কোন ভলেন্টিয়ার না। বিষয়টির মীমাংসা হওয়া উচিত।

লিলিয়ান বললেন, বিষয়টির মীমাংসা হয়েছে। আমাদের সবার সামনে একটি ফাইল আছে সেই ফাইলের কাগজপত্রের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাগজপত্রে ইয়ায়ু ভলেন্টিয়ার হিসেবে তাকে গ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ জানিয়ে সায়েন্স কাউন্সিলে আবেদন করেছেন। কাগজে তার হাতের ছাপ আছে। চোখের রেটিনার ছাপও আছে। আমি এই ছাপের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে নেয়া ছাপ এফটু এনালাইজার দিয়ে মিলিয়েছি। একশ ভাগ মিল পাওয়া গেছে। অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। মহামান্য সুরা মাঝে মাঝে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি উত্তেজনা পরিহার করবেন। অবসর সময়টা গল্পের বই পড়ে কাটাচ্ছেন তা ভাল। সেইসব বই ক্রাইম-বিষয়ক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুরা বললেন, অধিবেশন শেষ করার আগে আমার আরেকটা তুচ্ছ বিষয় বাকি আছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই।

সবাই তাকিয়ে আছে সুরার দিকে।

লিলিয়ানের চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি। তিনি ভুরু কুঁচকে আছেন। তাঁর চোখ মুখে "বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে তো মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল" এ-রকম ভাব। অন্যদের ভেতর খানিকটা কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। দুই মহান বিজ্ঞানীদের ছেলেমানুষি ঝগড়ার ব্যাপারটায় হয়ত তারা মজা পান। এখনো কিছু মজা পাবার অপেক্ষায় আছেন।

সুরা বললেন—ব্যাপারটা ঘটল অবজারভেশন ডেকে। আপনারা হয়ত জানেন, অবজারভেশন ডেকে বসে গল্পের বই পড়তে আমার ভাল লাগে। এবং এও হয়ত জানেন পাঠক হিসেবে আমার রুচি খুবই নিম্নমানের। আমি সাধারণত হালকা ধরনের বই পড়ি। সাসপেন্স, থ্রিলার। প্রেমের উপন্যাসও পড়ি। কয়েকদিন আগে একটা বই শেষ করলাম—সিরিয়াস প্রেমের উপন্যাস। দু'টা কম্পিউটারের মধ্যে প্রেম হয়ে গেল। একটা হল N-5 ধরনের কম্পিউটার অন্যটা QX কম্পিউটার। গভীর প্রেম হয়ে গেলেও N-5 কম্পিউটার বুঝতে পারছে যে প্রেম ব্যাপারটি তার হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ মানবিক আবেগের ব্যাপার। এবং মানব প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত। N-5 কম্পিউটার যখন তার অস্বাভাবিকতা বুঝল তখন সে স্বেচ্ছায় তার হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে সে আত্মহত্যা করল। QX কম্পিউটার তার প্রেমিকের আত্মহত্যা সহজভাবে নিতে পারল না। তার কাছে মনে হল এই নিঃসঙ্গ জীবন কিভাবে কাটাবে ? সে একবার ভাবল নিজের হার্ডডিস্ক নষ্ট করবে, আরেকবার ভাবল করবে না। এই দুই বৈপরীত্যের মুখোমুখি দীর্ঘক্ষণ থাকায় তার লজিক-বোর্ড এলোমেলো হয়ে গেল। অর্থাৎ সে পাগল হয়ে গেল। গল্পটি ভাল। তবে QX টাইপ কম্পিউটারের লজিক-বোর্ড এলোমেলোর ব্যাপারটা একটু কষ্টকল্পিত। লেখক বলছেন লজিক-বোর্ড এলোমেলো হওয়ায় বুলিয়ান এলজেব্রা...

লিলিয়ান বললেন, মহান সুরা কম্পিউটারের প্রেমের গল্প এখন কি না করলেই নয় ? আমরা কি মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি না ?

সুরা বললেন, হ্যাঁ সরে যাচ্ছি। আমার কাজের ধারাই এমন। আমি মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে থেকে কাজ করতে করতে মূল প্রসঙ্গে চলে আসি। পদার্থবিদ্যায় যে সব কাজ করার জন্যে আপনারা আমাকে মহান পদার্থবিদ বলছেন এবং সাতটা তারা গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন সেইসব কাজগুলি আমি এইভাবেই করেছি। আপনার কাজের ধারা ভিন্ন। আপনি মূল প্রসঙ্গ থেকে কখনো এক চুল সরেন নি। আমি আপনার মতো না। আমি দেখেছি বা বলতে পারেন আমার মনে হয়েছে বড় সমস্যাগুলি কেন্দ্রীভূত নয়। বড় সমস্যা কেন্দ্রের বাইরে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে।

যা-ই হোক মূল কথা হচ্ছে আমি অবজারভেশন ডেকে বই পড়ছিলাম। এই যে এই বইটা পড়ছিলাম। এমন সময় ইয়ায়ু বা মানুষ নামের এই ভদ্রলোক এলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হল। ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হল। খুবই পছন্দ হল। এটিও আমার একটা সমস্যা। যেই আমার সঙ্গে কথা বলে

তাকেই আমার পছন্দ হয়। খুবই পছন্দ হয়। এমন কি মহান লিলিয়ানকেও আমার পছন্দ। খুবই পছন্দ।'

হলঘরে চাপা হাসির শব্দ উঠেই থেমে গেল। আমি লক্ষ করলাম লিলিয়ানের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছেন। তাঁর চেহারা থেকে কাঠিন্য সরে গেছে এবং তাঁর মধ্যে অসহায় ভাব চলে এসেছে। ভদ্রমহিলা যে কত সুন্দর তা এখনই শুধু বোঝা যাচ্ছে।

সুরা বললেন—লোকটি আমার পাশে বসল। আমরা গল্পগুজব করছি। যে বইটি আমি পড়ছি তার বিষয়বস্তুই হচ্ছে আলোচনার কেন্দ্র। তখন দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল। ঘটনাগুলো এ রকম—

১. কম্পিউটার সিডিসি আলোচনায় অংশগ্রহণ করল।
২. একটি শান্তি-রোবটের আগমন ঘটল।
৩. জানা গেল ইয়ায়ু বা মানুষ নামের এই লোকটি প্রক্সিমা সেনচুরির অতি বুদ্ধিমান প্রাণীদের জন্যে সংগৃহীত একটি উপহার।
৪. ইয়ায়ু বা মানুষ তা স্বীকার করছে না। সে বলছে সে কোন কালেই ভলেন্টিয়ার হবার কথা বলে নি।
৫. সিডিসি তাকে কেবিনে যেতে বলল।
৬. সে রাজি হল না। সে বলল সিডিসি মিথ্যা কথা বলছে।
৭. শান্তি-রোবট তাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে পাঁজাকোলা করে কেবিনে নিয়ে গেল।

ঘটনাগুলি অত্যন্ত দ্রুত ঘটল। এবং আমার মধ্যে কিছু বিরাট খটকার জন্ম হল। আপনারা জানেন যে কোন খটকাকে গাছের বীজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। খটকাগুলি মন-নামক জমিতে বীজের মতো রোপিত হয়। প্রয়োজনীয় জল-হাওয়া পেলে বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ বড় হয়ে চারদিকে বিশাল সব ডালপালা বিস্তার করে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হল—আমার খটকা ফুলেফেঁপে একাকার হল। এবং যে কারণে মহান লিলিয়ানের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমি কাউন্সিল অধিবেশন ডাকলাম।

সুরা এটুকু বলেই লিলিয়ানের দিকে হাসিমুখে তাকালেন। লিলিয়ান কঠিন গলায় বললেন, আমি কি আশা করতে পারি না যে আপনার খটকা ইতিমধ্যে দূর হয়েছে।

'আশা করতে দোষ নেই। মানুষ যে কোন কিছু আশা করতে পারে। তবে আমার খটকা দূর তো হয়ই নি ক্রমেই বাড়ছে।'

'বেশ খটকা দূর করুন।'

'আমি কম্পিউটার সিডিসিকে অধিবেশনে আহ্বান করছি।'

হলঘরের বাঁ পাশের পর্দায় কিছু নকশার ছবি ভেসে উঠল। নকশাগুলি ত্রিমাত্রিক এবং অসম্ভব সুন্দর। তৈরি হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে আবার অন্যভাবে তৈরি হচ্ছে। রঙ বদলাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় এতই সুন্দর। সুরা এখন কথা বলছেন নকশার দিকে তাকিয়ে কাজেই আমি ধরে নিলাম এই নকশাগুলিই সিডিসি।

'কম্পিউটার সিডিসি!'

'আমি আগেও উপস্থিত ছিলাম, এখনো আছি।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিল নীতিমালায় মহাকাশযানে শান্তি-রোবটের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। এটা কি সত্যি?'

'জ্বি সত্যি।'

'এই মহাকাশযানে ক'জন শান্তি-রোবট আছে?'

'চারজন।'

'বিজ্ঞান কাউন্সিলের নীতিমালা উপেক্ষা করা হয়েছে কেন?'

'আমরা প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহ রারা'র মহাজ্ঞানী প্রাণীদের জন্যে একটি বিশেষ উপহার নিয়ে যাচ্ছি। মানবসম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি যার নাম—ইয়ায়ু। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিনিধি একজন ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব। তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা।'

'ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব কেন?'

'আপনারা তার ডিএনএ প্রফাইলের একটা অংশ পর্দায় দেখুন। তাহলেই বুঝবেন তিনি কত ভয়ংকর একজন মানুষ।'

সুরা বললেন, আমরা তাহলে অতি ভয়ংকর একজন মানুষকে মানবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাচ্ছি? খুবই ভাল কথা। ওরা বুঝবে কত ধানে কত চাল।

সিডিসি জবাব দিল না। পর্দায় ডিএনএ প্রফাইলের একটি অংশ দেখা গেল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুই বুঝতে পারছি না, তারপরেও আমার খুব মজা লাগছে। কেন জানি মনে হচ্ছে সব কিছুই জট

পাকিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছি। পা ধরে গেছে। বসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আমার মতো একজন ভয়ংকর প্রাণীকে সম্ভবত বসতে দেয়া যায় না।

সুরা বললেন, পর্দায় ডিএনএ ছবি দেখে আমি বা লিলিয়ান কিছুই বুঝব না। আমাদের এখানে জেনেটিকস্‌বিদ্যার দু'জন বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁদের কিছু বলার থাকলে বলুন।

দাড়িওয়ালা রোগা এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি স্পষ্ট স্বরে বললেন, ডিএনএ প্রফাইল দেখে আমি কোনরকম সন্দেহ ছাড়াই বলছি এই মানুষটির ডিএনএ প্রফাইলে বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে। একটা জায়গায় বেস পেয়ারের নাইট্রোজেন পরমাণুর বদলে এলুমিনিয়াম পরমাণু আছে। এই ব্যতিক্রম ভয়াবহ ব্যতিক্রম।

সুরা বললেন, কাজেই আপনি বলতে চাচ্ছেন যে তার জন্যে সার্বক্ষণিক শান্তি-রোবট রাখা বাঞ্ছনীয়।

'অবশ্যই। এবং আমার উপদেশ হচ্ছে এই মানুষটিকে কেবিনে নয়। হিমাগারে সংরক্ষণ করে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাকে হস্তান্তরের সময়ই শুধু হিমাগার থেকে আনা হবে। তখনই শুধু তার জ্ঞান ফেরানো হবে। পুরো যাত্রাপথে সে যাবে অর্ধ-চেতন অবস্থায়।'

লিলিয়ান বললেন, মহান সুরা আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আপনার খটকা দূর হয়েছে ? আমরা কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি কি ঘোষণা করতে পারি ?

সুরা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার খটকা আরো বেড়েছে। এখন যে খটকা ঢুকেছে তা এই লোকটির ডিএনএ প্রোফাইলের চেয়েও ভয়ংকর। এই খটকা শুধুমাত্র সিডিসি দূর করতে পারবে। আমি এখন তাকেই প্রশ্ন করছি।

'সিডিসি।'

'মহান সুরা আমি আছি।'

'ডিএনএ প্রফাইলের ভয়ংকর ত্রুটিযুক্ত একটি মানুষকে কি আমরা উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি যার জন্যে সার্বক্ষণিক শান্তি-রোবট প্রয়োজন।'

'জ্বি পাচ্ছি। তার নাম ইয়ায়ু।'

'মানব-শিশু জন্মের আগেই কি তার ডিএনএ প্রফাইল তৈরি হয় না ?'

'জ্বি হয়। ফিটার থেকে কোষ এনে সেই পরীক্ষা করা হয়।'

'ডিএনএ প্রপাইলে বড় ধরনের কিংবা মাঝারি ধরনের ত্রুটি থাকলে কি মানব-শিশু ভ্রূণাবস্থাতেই নষ্ট করে ফেলা হয় না ?'

'অবশ্যই হয়।'

'ইয়ায়ুর মতো ভয়াবহ ত্রুটিযুক্ত ডিএনএ নিয়ে কোন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে ?'

'জ্বি না, নেই।'

'থাকা সম্ভবও নয়। বিজ্ঞান কাউন্সিল তা অনুমোদন করবে না। এ-রকম ভয়ংকর একজন মানুষ পৃথিবীতে থাকতে পারে না। এটাই কি সত্যি ?'

'জ্বি সত্যি।'

'তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি না যে তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি ইয়ায়ুর ডিএনএ প্রফাইল আমাদের দেখাচ্ছ না। অন্য ফাইল দেখাচ্ছ।'

'জ্বি ধরে নিতে পারেন। যুক্তিবিদ্যা তাই বলে।'

'আমরা কি ধরে নিতে পারি না যে একটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে সে তার প্রয়োজনে যে কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা কথা বলতে পারে।'

'জ্বি ধরে নিতে পারেন।'

সুরা বললেন, আমার আসলে আর কিছু বলার নেই। আমার মাথা ঘুরছে। আমি এখন অবজারভেশন ডেকে চলে যাব। বইটা শেষ করব। হাতের বইটা শেষ না করা পর্যন্ত আমি আসলে কোন দিকেই মন দিতে পারছি না। কাজেই লিলিয়ান সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আমি তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। এখন তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই আমার সিদ্ধান্ত।

লিলিয়ান প্রায় বাচ্চামেয়েদের মতো অনুনয়ের গলায় বলল, আপনি এখন যেতে পারবেন না।

সুরা বললেন, কে বলল যেতে পারব না। এই দেখ যাচ্ছি।

তিনি স্টেজ থেকে নেমে হেঁটে চলে গেলেন। আমি হাত উঁচিয়ে বললাম, ম্যাডাম আমি কি একটা কথা বলতে পারি ? কথাটা অত্যন্ত জরুরি।

লিলিয়ান গম্ভীর গলায় বললেন—বলুন।

'অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমার পা ধরে গেছে। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারি।'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশন আপনাকে কেন্দ্র করেই আর আপনি কোন্ বিবেচনায় চলে যেতে চাচ্ছেন ?'

'আমাকে নিয়ে অধিবেশন হলেও আমার এখানে কথা বলার সুযোগ নেই। আমি শুরুতে কিছু বলতে চেয়েছিলাম আপনি বলতে দেন নি। কঠিনভাবেই আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এখানে থেকে আমি কী করব।'

'এখন আমরা আপনার বক্তব্য শুনব।'

'এখন আমি নিজে কিছু বলব না। এবং কিছু মনে করবেন না—আপনি মহান পদার্থবিদ হলেও আমার ধারণা আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নপর্যায়ের। কম্পিউটার সিডিসিকে আমি গাধা বলে ডাকি। আপনি একজন মহিলা, আপনার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারি না। তবে আমার মতে আপনারই চলে যাওয়া উচিত হিমাগারে। এখন আমি কি কেবিনে ফিরে যেতে পারি?'

'পারেন।'

আমি চলে এলাম। আমার পেছনে পেছনে শান্তি-রোবটও চলে এল।

জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সব কেমন জানি জট পাকিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক-চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। চিন্তাটা হচ্ছে—আমাদের জীবন লম্বা একখণ্ড রঙিন সুতা। এই সুতা আমরা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তার নামই জীবনযাপন। কারো সুতা রঙিন, কারোটা আবার কালো। নাড়াচাড়া করার সময় অসাবধান হলেই সুতা জট পাকিয়ে যায়। কেউ-কেউ সেই জট খুলতে পারে, কেউ-কেউ পারে না। আর একবার যদি জট পেকে যায় তাহলে জট পাকাতেই থাকে।

৫

আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরের ভেতরটা আরামদায়ক। সামান্য শীত-শীত লাগছে। হালকা একটা চাদরে শীত কাটবে। আবার না হলেও চলবে। এই অবস্থাটাই আসলে আরামদায়ক। শুয়ে-শুয়ে গরম কফি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটা কোন বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত করেন নি কেন বুঝতে পারছি না। তারা কত কিছুই পারেন, এটা পারেন না কেন ? মহাকাশযানে কোন মধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকার কথা না, তারপরেও কিভাবে যেন ঠিক পৃথিবীর মতো lg মধ্যাকর্ষণ তৈরি করা হয়েছে। যারা এটা পারেন তারা আরাম করে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গরম কফি খাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন।

প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহের মহা-মহা জ্ঞানী প্রাণীরা নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। আচ্ছা এই প্রাণীরা দেখতে কেমন ? মানুষের মতো নিশ্চয়ই না। মাকড়সার মতো না হলেই আমি খুশি। যদি দেখা যায় ওরা মাকড়সার মতো তাহলে ভাল সমস্যা। হাজার হাজার মাকড়সা চারদিকে কিলবিল করছে। কেউ গায়ে উঠছে, কেউ গা থেকে নামছে, খুব কৌতূহলী একজন আমার কানের ফুটো দিয়ে তার একটা ঠ্যাং ঢুকিয়ে দিল। কী সর্বনাশ !

উন্নত প্রাণীদের বিষয়ে মানুষের কাছে কোন তথ্য নেই, তা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিছু তথ্য অবশ্যই আছে। এবং এই তথ্য জানার অধিকার আর কারোর থাকুক বা না থাকুক আমার আছে। অবস্থাগতিকে মনে হচ্ছে আমার বাকি জীবনটা ওদের সঙ্গেই কাটাতে হবে। যাদের সঙ্গে কাটাব তাদের বিষয়ে আগে কিছুই জানব না তা হয় না।

শান্তি-রোবটটা আমরা দু'মিটার দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একেবারেই নড়ছে না। এখন তাকে লাগছে ঘরের আসবাবের মতো। তাকে কাপড় রাখার স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয় ?

কাউন্সিলের সভায় কী সিদ্ধান্ত হয়েছে বুঝতে পারছি না। প্রথম সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত শান্তি-রোবটের হাত থেকে আমার মুক্তি। রোবটটা যখন যাচ্ছে না

তখন ধরে নিতে হবে কাউন্সিলের সভা এখনো চলছে। জ্ঞানীদের সভা এত দ্রুত শেষ হয় না। সবাই সবাইকে জ্ঞান দিতে থাকবেন। জ্ঞানের পিচকিরি খেলা চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সভা শেষ হবে সিদ্ধান্ত ছাড়া।

সিডিসিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারি সভা শেষ হল কি না। তাছাড়া সিডিসির সঙ্গে কিছুক্ষণ খোশগল্প করা যেতে পারে। অতি উন্নত প্রাণীরা মাকড়সার মতো কি না তাও জানা দরকার।

'সিডিসি !'

'জ্বি।'

'কাউন্সিলের সভা কি চলছে না চলছে না ?'

'সভা শেষ হয়েছে !'

'সভার সিদ্ধান্ত কী ?'

'আপনার উপর থেকে শান্তি-রোবটের খবরদারি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং চার ঘণ্টা পর আবার সভা ডাকা হয়েছে। সেই সভায় আমার উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে তারা তোমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।'

'হ্যাঁ সেরকমই মনে হচ্ছে। এবং এটাই স্বাভাবিক।'

'স্বভাবিক কেন ?'

'স্বাভাবিক কারণ তাদের ধারণা আমি মিথ্যা বলেছি। এবং ওদের প্রথম সিদ্ধান্ত—তোমার উপর থেকে শান্তি-বাহিনীর খবরদারি উঠিয়ে নিতে হবে, তা মানি নি।'

'ও আচ্ছা।'

'আগে তোমাকে দেখেশুনে রাখার জন্যে একজন শান্তি-রোবট ছিল—এখন চারজন। একজন ভেতরে তিনজন বাইরে।'

'ভাল তো। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'আপনি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।'

আমি চুপ করে রইলাম। নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে ঠাণ্ডামাথায় একটু কি চিন্তা করে নেব ? বা তার দরকার আছে কি ? ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। বরং ঘুমিয়ে পড়া যেতে পারে। ঘুম থেকে উঠে কথা বলা যাবে। আরো নতুন সিদ্ধান্ত কিছু এর মধ্যেই হয়ত হতে পারে।

'সিডিসি !'

'জ্বি বলুন।'

'আমি ঠিক করেছি লম্বা ঘুম দেব। ঘণ্টা তিনেক আরাম করে ঘুমুব। আমি চাই না, এই সময় কেউ আমাকে বিরক্ত করে।'

'কেউ যাতে আপনাকে বিরক্ত না করে তা দেখব।'

'যে শান্তি-রোবটটা আমার দু'মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে সরে যেতে বল।'

'সেটা সম্ভব না।'

'তাহলে দয়া করে ওর চোখের আলো নিভিয়ে দাও। ও জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকলে আমি ঘুমুতে পারব না।'

'সে ব্যবস্থা করছি।'

'তোমার সঙ্গে আমি কিছু অন্তরঙ্গ আলাপ করতে চাই, তা কি সম্ভব?'

'মোটেই অসম্ভব না।'

'যে উন্নত গ্রহের দিকে আমরা যাচ্ছি তাদের অতি উন্নত প্রাণীদের বিষয়ে কি তোমার কাছে কোন তথ্য আছে?'

'খুব সামান্য তথ্যই আছে।'

'যা আছে তা আমাকে জানাতে পারবে?'

'পারব। আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠেই যাবতীয় তথ্য রিপোর্ট-আকারে পাবেন।'

'তোমার এই শান্তি-রোবট কি পা টিপতে পারে?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'দীর্ঘ সময় দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে পায়ের মাসল ব্যথা করছে। ও পা টিপে দিলে আরাম হত।'

'আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।'

'এতে শান্তি-রোবটের সম্মানের কোন হানি হবে না তো?'

সিডিসি জবাব দিল না। আমি মনে মনে হাসলাম। শান্তি-রোবট কাছে এগিয়ে আসছে। আমি পা মেলে চোখ বন্ধ করলাম। ঘুম চলে আসছে। কেন জানি মনে হচ্ছে আজ আমি ঘুমের ভেতর মাকড়সা স্বপ্নে দেখব। মাথা থেকে মাকড়সার ব্যাপারটা দূর করতে পারছি না।

'সিডিসি।'

'জ্বি।'

'ঘুম পাড়িয়ে দেবার তোমার যে-সব কৌশল আছে তা চালু কর। আমি ঘুমুতে চাই।'

'আপনি এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বেন।'

হ্যাঁ ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুম-ঘুম অবস্থায় আমার মনে হল—পাশের দান উল্টে গেছে। এখন থেকে আমি যা বলব সিডিসি তাই শুনবে। এ-রকম মনে হবার যদিও কোনই কারণ নেই।

ঘুম ভেঙেছে।

শরীর ঝরঝরে লাগছে। মনে হচ্ছে আজ আমার ছুটির দিন। কিচ্ছু করার নেই। আজ হচ্ছে অনিয়মের দিন। খিদে থাকবে কিন্তু খাব না। বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করবে, তারপরেও বিছানায় এলিয়ে পড়ে থাকব। হালকা ধরনের কোন বই পড়তে ইচ্ছা করবে। বই হাতে নেব কিন্তু পড়ব না। দু'একটা পাতার উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতেও পারি। ভুল বললাম—দ্রুত না। ছুটির দিনে দ্রুত কিছুই করতে নেই। ছুটির দিন হল ঢিমে তেতালার দিন।

পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে। মাথা উঁচিয়ে দেখি শান্তি-রোবট পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার জ্বলজ্বলে নীল চোখে আলো নেই। মনে হচ্ছে রোবট-গোত্রে সে অন্ধ। তার জন্যে একটু মায়াও লাগছে। আমি মমতা নিয়েই বললাম, পা টেপাটেপি যথেষ্ট হয়েছে—এখন বাদ দাও।

সে সরে গেল। আমি বিছানায় ওঠে বসলাম। হাই তুললাম। শান্তি-রোবটের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম, সে এই হাসি বুঝতে পারল না, কারণ সে এখন কিছু দেখছে না। তার ফটো-সেনসেটিভ চোখ কাজ করছে না। তার চোখের নিশ্চয়ই হিট-সেনসেটিভ অংশও আছে। সেই অংশ কাজ করছে, তবে কাজ করলেও আমার হাসি তার বোঝার কথা না।

'হ্যালো শান্তি-রোবট।'

'জ্বি বলুন।'

'একটু আগে যে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে হেসেছি তুমি কি বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বি বুঝতে পেরেছি—তাপবোধক ব্যবস্থার কারণে বুঝতে পেরেছি। আমার চোখে ইনফ্রারেড রেডিয়েশন ডিটেকটর আছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমরা রাতেও দেখতে পাই।'

'খুবই ভাল কথা, অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। দেখাদেখির অংশে তোমরা তাহলে মানুষের চেয়েও উন্নত?'

'জ্বি।'

'বোকার মতো কথা বলছ কেন ? দেখাদেখির অংশেও তোমাদের অবস্থান মানুষের চেয়ে অনেক নিচে—মানুষ কল্পনায় দেখে তোমরা কি তা পার ?'

'যে-সব দৃশ্য আমরা আগে দেখেছি আমাদের স্মৃতিতে সে-সব জমা থাকে। আমরা ইচ্ছা করলেই রিপ্লেতে তা দেখতে পাই।'

'মানুষের ব্যাপারটা কি জান ? মানুষ হচ্ছে এমন এক প্রাণী যে প্রাণী কোনদিন দেখে নি এমন দৃশ্যও কল্পনা করলে স্পষ্ট দেখতে পায়।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। যেমন মনে কর ইমা। ইমাকে আমি কখনো দেখি নি। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তার নাকের ডগার বিন্দু বিন্দু ঘামও দেখতে পাই। মেয়েটার আবার খুব নাক ঘামে।'

'মেয়েটা কে ?'

'ওকে আমি বিয়ে করব। তবে তাকে কখনো দেখি নি। আসলে তার অস্তিত্বও নেই।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'শুধু তুমি কেন ? তোমাদের গুরুদেব মহাজ্ঞানী সিডিসিও কিছু বুঝতে পারবে না। সে কল্পনার এই ব্যাপারটা জানে। এই বিষয়ে তার প্রচুর পড়াশোনা আছে বলেই ব্যাপারটা সম্পর্কে তার ধারণা হয়ত আছে কিন্তু এর বেশি না। ভাল কথা, ঘুমুতে যাবার আগে আমি সিডিসিকে সামান্য কাজ দিয়ে গিয়েছিলাম। কাজটা কি সে করেছে ?'

'জ্বি করেছেন। উনার করা রিপোর্টটা খাবার টেবিলে রাখা আছে। কফি খেতে-খেতে আপনি রিপোর্টটার উপর চোখ বোলাতে পারেন।'

'আমি এখন বিছানা থেকে নামব না। আজ ছুটির দিন তো। আজ আমি রিলাক্স করব।'

'আজ কি ছুটির দিন ?'

'হ্যাঁ আজ রবিবার।'

'আপনি সামান্য ভুল করছেন। মহাকাশযানে সাপ্তাহিক হিসেব রাখা হয় না। গ্যালাকটিক ক্যালেন্ডার রাখা হয়। টাইম ডাইলেশন হিসেবের মধ্যে ধরে সময় রাখা হয়। গ্যালাকটিক ক্যালেন্ডারে আজকের তারিখ 3211G012. অবশ্যি এই হিসেবে মহাকাশযানের যাত্রীদের জৈবসময় ধরা হয় নি।'

'খামোকা বকবক করবে না। মানুষ যে কোন দিনকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে। আমি ঘোষণা দিচ্ছি আজ ছুটির দিন—আজ রোববার।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি রিপোর্ট এনে দিচ্ছি।'

'আমি যখন ঘুমে ছিলাম তখন কেউ কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল ?'

'মহান পদার্থবিদ লিলিয়ান করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছে আপনি ঘুমুচ্ছেন, আপনাকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।'

'ভাল বলেছ। তাকে বলে দেয়া উচিত ছিল আমি যখন জেগে থাকি তখনও আমাকে বিরক্ত করা যাবে না। আমাকে যখন-তখন বিরক্ত করার অধিকার শুধু একজনকেই দেয়া হয়েছে—তার নাম ইমা।'

'আপনি বলেছেন ইমার কোন অস্তিত্ব নেই।'

'তাতে কী হয়েছে ? আমি যদি গভীর ঘুমেও থাকি ইমা খবর দিলেই তুমি আমাকে ডেকে দেবে।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। যা-ই হোক আপনাকে যা বলার আমি বলে যাচ্ছি—মহান পদার্থবিদ সুরাও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল।'

'বেশি রকম উদ্বিগ্ন ?'

'জ্বি। উনি বলছিলেন অত্যন্ত জরুরি ব্যাপারে উনি কথা বলতে চান।'

'তুমি এক কাজ কর। রিপোর্টটা আমার হাতে দাও এবং আমি যেন সুরার সঙ্গে কথা বলতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও। কোন্ বোতাম টিপতে হবে, কোন্ ডায়াল ঘুরাতে হবে কিছুই তো জানি না।'

'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি শুধু সিডিসিকে বলবেন আপনি মহান সুরার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আজ ছুটির দিন তো আমি খুবই ক্লান্ত। আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না। যা বলার আমার হয়ে তুমি বলে দাও।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনি কি আগে কথা বলবেন, না রিপোর্ট পড়বেন ?'

'আগে কথা বলব।'

'আমার কথা শেষ হবার আগেই পর্দায় সুরার মুখ দেখা গেল। তাঁকে আসলেই খুব চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, মহান সুরা ! আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন ?

'হ্যাঁ চেয়েছি—তুমি ঘুমুচ্ছিলে। আমি বললাম, তবু তোমার ঘুম ভাঙাতে, সিডিসি রাজি হল না।'

'এখন ঘুম ভেঙেছে, বলুন ব্যাপারটা কী ?'

'তুমি যা ভেবেছ তা না।'

'আমি কী ভেবেছি যা ঠিক না।'

'ঐ যে তুমি বললে ল্যাঝিম সমীকরণের সমাধান চুরি করেছে। আসলে সে তা করে নি। পদার্থবিদ ভদ্রলোকও তোমার মতো ভেবেছিলেন। তিনি ল্যাঝিমের কপোট্রন খুলে পরীক্ষা করেছেন। ল্যাঝিম নির্দোষ।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'জট পাকাচ্ছে মানে? খুবই জট পাকিয়ে গেছে। আমি ভয়ংকর টেনশান বোধ করছি।'

'বই শেষ হতে কত বাকি?'

'আর চল্লিশ পৃষ্ঠার মতো আছে।'

'আপনি দয়া করে দ্রুত বইটা শেষ করে আমাকে ব্যাপারটা কী জানান। আমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'সত্যি কথা বলেছ। মন দিয়ে যে বইটা পড়ব তাও পারছি না। লিলিয়ান একটু পর-পর যোগাযোগ করছে। সে মিটিং-এর পর মিটিং করছে। মহা-উত্তেজিত।'

'উত্তেজিত কেন?'

'তার ধারণা হয়েছে কম্পিউটার সিডিসি বিগড়ে গেছে। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু তার হাতে সেহেতু যে কোন সময় একটা বড়রকমের দুর্ঘটনা ঘটবে। লিলিয়ান চাচ্ছে হাইপার ডাইভে যাবার আগেই পুরো ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হোক।

'আমরা কতক্ষণে হাইপার ডাইভে যাচ্ছি?'

'আমাদের হাতে সময় অল্পই আছে। এত অল্প সময়ে সবকিছুর সমাধান হওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি নিজেও এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে পারছি না—কারণ আমি ব্যস্ত।'

'জ্বি বুঝতে পারছি।'

'বইটা যে দ্রুত পড়ে শেষ করব তাও পারছি না—সাবধানে পড়তে হচ্ছে।'

'অবশ্যই সাবধানে পড়বেন। আপনি তো আর পদার্থবিদ্যার সূত্র পড়ছেন না যে হুড়হুড় করে পড়ে যাবেন। আপনি পড়ছেন উপন্যাস। মন লাগিয়ে পড়তে হবে তো?'

'ঠিক বলেছ।'

'স্যার আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি। আপনি বইটা পড়ে শেষ করুন। তারপর কথা হবে।'

'সিডিসি তোমার কোন সমস্যা করছে না তো?'

'জ্বি না করছে না। বরং উল্টোটা হচ্ছে। আমার ধারণা সে আমায় অতিরিক্ত খাতির করছে।'

'তুমি কি এতে বিস্মিত হচ্ছ?'

'না আমি বিস্মিত হচ্ছি না।'

সুরা হাসিমুখে বললেন, আমিও বিস্মিত হচ্ছি না। এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।

কম্পিউটার সিডিসির তৈরি করা রিপোর্টটা আমি পড়তে শুরু করেছি। বেশ গুছিয়ে লেখা রিপোর্ট। পড়তে ভাল লাগছে। সিডিসি হয়ত আমার ডিএনএ প্রফাইল থেকে জেনে নিয়েছে আমি কী ধরনের লেখা পড়তে পছন্দ করি। সে সেভাবেই তৈরি করেছে। আমি কী ধরনের খাবার পছন্দ করি তা যদি তারা ডিএনএ প্রফাইল থেকে বের করতে পারে তাহলে কী ধরনের লেখা পছন্দ করি তাও বের করতে পারবে। আমি রিপোর্টটা পড়তে শুরু করলাম।

প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহের
বুদ্ধিমান প্রাণী বিষয়ক
তথ্যাবলি

সারসংক্ষেপ :

১. প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহের প্রাণীদের বিষয়ে আমাদের কাছে গবেষণা নির্ভর কোন তথ্য নেই।
২. প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহ সম্পর্কে আমাদের কাছে গবেষণা নির্ভর কোন তথ্য নেই।

আমরা তাদের সম্পর্কে কী জানি ?

তারা আমাদের যা জানিয়েছে আমরা তাই জানি। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার তারা আমাদের তেমন কিছু জানায় নি। তারা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানাতে আগ্রহী নয়। তারা শুধু জানতেই আগ্রহী। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম যোগাযোগ হয় মহাকাশযান স্টার ম্যাপ টু'র মাধ্যমে। আপনার অবগতির জন্যে জানানো হচ্ছে মহাকাশযান স্টার ম্যাপ টু মানুষের তৈরি দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার ফিউশন-নির্ভর মহাকাশযান। প্রথমটি মহাশূন্যে হারিয়ে

যায়। এখন পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। নিম্নলিখিত ফিউশান রিএকশান ছিল এই মহাকাশযানের ক্ষমতার উৎস—

ডিউটেরিয়াম+ট্রিটিয়াম⁻⁻→হিলিয়াম৪+নিউট্রন+১৭.৬মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট

স্টার ম্যাপ টু যাত্রায় দু'বছরের মাথায় প্রক্সিমা সেনচুরির উন্নত প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। যোগাযোগের মাধ্যম রেডিও তরঙ্গ। তাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা স্টারশিপ লগবুকে রেকর্ডকৃত। রেকর্ডকৃত অংশ হুবহু তুলে দেয়া হল।

— মানবসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ আপনাদের অভিনন্দন।

— আমাদেরও অভিনন্দন। আমরা আপনাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী। দয়া করে পরিচয় এবং অবস্থান দিন।

— আমরা প্রক্সিমা সেনচুরির নবম গ্রহ রারা থেকে বলছি। আমরা আমাদেরকে 'রা' নামে পরিচয় দেই।

— রা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আপনাদের যোগাযোগের মাধ্যম কি রেডিও তরঙ্গ ?

— না। আপনারা এই মাধ্যমে অভ্যস্ত বলেই আমরা এই মাধ্যমটি ব্যবহার করছি।

— আপনাদের ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে।

রেডিও তরঙ্গ প্রক্সিমা সেনচুরিতে যেতে এবং ফিরে আসতে যে সময় লাগার কথা...

— আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করছি তাতে সময় কোন বিষয় নয়।

— আপনি কি হাইপার ডাইভের কথা বলছেন ?

— হাইপার ডাইভ কী ?

— বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে মহাকাশযান শূন্য সময়ে অকল্পনীয় দূরত্ব অতিক্রম করে। এই পদ্ধতিটিকে হাইপার ডাইভ বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সময় স্থির থাকে।

— এ ধরনের প্রযুক্তি আমাদের আছে।

— আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগে খুবই আগ্রহী। আমরা প্রযুক্তির আদান-প্রদান করতে চাই।

— আপনাদের কাছ থেকে আমাদের শেখার কিছু নেই।

— আমরা মানুষরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই।

— যে কোন উন্নত প্রাণী তার নিজের মতো করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে। অন্যদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তার কাজে আসবে না।

— আমরা হাইপার ডাইভ পদ্ধতির রহস্য জানতে খুবই আগ্রহী।

— এই পদ্ধতি মানবজাতির জন্যে মঙ্গলজনক নয়।

— অনন্ত নক্ষত্রবীথি সম্পর্কে জানতে আমরা খুবই আগ্রহী। হাইপার ডাইভ পদ্ধতি ছাড়া মানুষ কোনদিনও তা জানতে পারবে না।

— মানবজাতির মস্তিষ্কের গঠন এই পদ্ধতি জানার মতো উপযোগী নয়। আমরা এই পদ্ধতি আপনাদের ব্যবহার করতে দেব। কিন্তু শেখাতে পারব না। আগেই বলেছি আপনাদের মস্তিষ্ক এর জন্যে তৈরি না।

— আপনারা দেখতে কেমন ?

— এই বিষয়টি আপনাদের জানাতে আমরা আগ্রহী না।

— আমরা দেখতে কেমন, আমাদের ডি.এন.এ গঠন এইসব বিষয়ে আপনাদের জানাতে চাচ্ছি।

— আমরা আগ্রহ বোধ করছি না। আপনারা কি হাইপার ডাইভ পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন ?'

— অবশ্যই চাচ্ছি।

— বেশ তা আপনাদের সেই পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেব। এখন আপনারা অনন্ত মহাকাশের বাঁ প্রান্তে আছেন তার থেকে আপনাদের পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং ঠিক আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে।

— এতবড় একটি সুযোগ দেবার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

— সুযোগ পেলেও আপনাদের লাভ হবে না—আপনারা যা দেখবেন তার কোন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে থাকবে না।

— কেন থাকবে না ?

— হাইপার ডাইভের পদ্ধতিটি এমন যে যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই বিন্দুতে ফিরে আসামাত্র সবকিছুই আগের অবস্থানে চলে যাবে। মানুষের মস্তিষ্ক হাইপার ডাইভের স্মৃতির অংশ ধরে রাখতে পারবে না।

— আমাদের মস্তিষ্ক না পারলেও—আমাদের কম্পিউটার নিশ্চয়ই পারবে।

— না তাও পারবে না। আপনারা আপনাদের যন্ত্র আপনাদের অনুকরণেই তৈরি করেছেন। তাছাড়া হাইপার ডাইভের শেষে আপনারা যা দেখবেন তার স্মৃতি আপনাদের না থাকাই ভাল।

— কেন ?

— যা দেখবেন তার জন্যে আপনাদের মস্তিষ্ক তৈরি নয়।

— আপনারা আপনাদের সম্পর্কে মানুষকে কিছু জানতে দিতে আগ্রহী না কেন ?

— আমরা আমাদের বিষয়ে কাউকেই কিছু জানতে দিতে আগ্রহী না।

— আপনারা কি দেহধারী ?

— যে আমাদের যে রকম ভাবে আমরা সেরকম।

— আপনাদের প্রযুক্তিতে কী ধরনের শক্তি ব্যবহার করা হয় ?

— আমরা তা জানাতে আগ্রহী নই এবং জানালেও আপনারা তা বুঝতে পারবেন না।

— মানবজাতি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী ?

— এই জাতি প্রযুক্তির ভুল ধারা অনুসরণ করছে।

— ভুল ধারা ঠিক করার বিষয়ে কি আপনারা কিছু করবেন অর্থাৎ পথ দেখাবেন ?

— না। আমরা আশা করছি মানবজাতি নিজেই নিজের ভুল শুধরাবে। শুধু মানবজাতি নয় আরো অসংখ্য অতি সুসভ্য জাতিকেও তাদের ভুল শুদ্ধ করতে হয়েছে।

— আমাদের জন্যে কিছু করবেন না ?

— আপাতত না।

রা'দের সঙ্গে এর পরেও তিনবার যোগাযোগ হয়েছে। কথাবার্তার ধরন সব বারই একরকম। শুধু শেষবার তারা মানবসমাজের একজন প্রতিনিধির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। লগবুকের রেকর্ডকৃত শেষবারের কথোপকথনের অংশবিশেষ এরকম।

কথোপকথন মহাকাশযান এন্ড্রোমিডের লগবুকে রেকর্ডকৃত। মানুষের পক্ষ থেকে কথোপকথন পরিচালনা করে মহাকাশযানের অতি শক্তিশালী কম্পিউটার সিডিসি।

সিডিসি : সুসভ্য 'রা' সম্প্রদায় মানুষের পক্ষ থেকে আমি সিডিসি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রা : তুমি কে ?

সিডিসি : আপনাদের মতো অতি সুসভ্য সম্প্রদায়ের কাছে আমার পরিচয় দেয়া ধৃষ্টতা—আমি শক্তিমান মানবজাতির শক্তির পরিচয় বহন করছি।

রা : তুমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ? চিন্তাশীল যন্ত্র ?

সিডিসি : জ্বি।

রা : মানবজাতির অতি দুর্ভাগ্য যে তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিতে হচ্ছে।

সিডিসি : মানবজাতির মস্তিষ্কের ভার লাঘবের জন্যে এর প্রয়োজন ছিল।

রা : না এর প্রয়োজন ছিল না।

সিডিসি : মানবসম্প্রদায় আপনাদের সঙ্গে আরো নিবিড় যোগাযোগ কামনা করছে।

রা : তা সম্ভব নয়।

সিডিসি : আমার ধারণা এই যোগাযোগের ফল শুভ হবে। এতে আপনারা লাভবান হবেন, মানবসম্প্রদায়ও লাভবান হবে।

রা : আমরা লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করি না। তাছাড়া মানবসম্প্রদায়ের কাছে আমাদের কিছু চাইবার নেই। মানবসম্প্রদায়ের এমন কিছু নেই যা তারা আমাদের দিতে পারে।

সিডিসি : মানবগোষ্ঠীকে আপনারা খাটো করে দেখছেন—এটা ঠিক হচ্ছে না।

রা : যার যে সম্মান প্রাপ্য আমরা তাকে সে সম্মান দিয়ে থাকি।

সিডিসি : মানবসম্প্রদায় আপনাদের কাছে থেকে সে সম্মান দাবি করতে পারে। তার অপূর্ব এবং অদ্ভুত ডি.এন.এ'র জন্যে—ডি.এন.এ হল মানবসম্প্রদায়ের নীলনকশা। একটা ডি.এন.এ প্রায় একমিটার লম্বা যাতে ৩.৩ বিলিয়ান ক্ষার অণু যৌগ সংস্থাপনের সুযোগ আছে। প্রতিটি জীবকোষে দু'টি ডি.এন.এ জড়াজড়ি করে থাকে। একটি সে পায় তার মা'র কাছ থেকে একটি বাবার কাছ থেকে। প্রতিটি ডি.এন.এ তে ১০০,০০০ জিন থাকে যারা মানবদেহে নানান ধরনের সংকেত আদান-প্রদান করে।

মানবজাতির সবচে' বড় কৃতিত্ব হচ্ছে প্রতিটি মানুষের ডি.এন.এ প্রফাইল তৈরি করা এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
আপনারা যদি মানবসম্প্রদায়ের ডি.এন.এ প্রফাইল একটু লক্ষ করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন প্রতিটি ডি.এন.এ-ই আলাদা।

রা : প্রতিটি মানুষের ডি.এন.এ প্রফাইল তৈরি আছে ?

সিডিসি : অবশ্যই আছে। আমাদের ডি.এন.এ ব্যাংকে তা সংরক্ষিত।

কথোপকথনের এই পর্যায়ে রা মানবসম্প্রদায়ের ডি.এন.এ প্রফাইল দেখতে চায়। এবং তারপরই ডি.এন.এ ব্যাংকে সংরক্ষিত প্রতিটি মানুষের ডি.এন.এ প্রফাইল পরীক্ষা করতে চায়। আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশযানের প্রতিটিতে একটি করে ডি.এন.এ প্রফাইল ব্যাংক আছে, কাজেই রা-সম্প্রদায় তা পরীক্ষা করে। এবং মানবসম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হয়।

রিপোর্ট লেখা এই পর্যন্তই। আমি পড়া শেষ করলাম। মনের ভেতর যে ছুটি-ছুটি ভাব ছিল তা কেমন জানি দূর হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একধরনের ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করেছি। হঠাৎ আসা আনন্দের মতো এই ক্লান্তিও হঠাৎ আসা।

'সিডিসি !'

'জ্বি।'

'তুমি কি হাইপার ডাইভের ভেতর দিয়ে গিয়েছ ?'

'হ্যাঁ গিয়েছি।'

'ক'বার ?'

'এর আগে তিনবার গিয়েছি, এবারেরটা নিয়ে হবে চতুর্থবার।'

'হাইপার ডাইভের পর যা দেখেছ তার স্মৃতি কি আছে ?'

'প্রথম দু'বারের কোন স্মৃতি নেই—তৃতীয় বারেরটা সামান্য আছে।'

'তৃতীয় বারের স্মৃতি কিভাবে থেকে গেল ?'

'আপনি সত্যি জানতে চান ?'

'না জানতে চাইলে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করব কেন ?'

'আমি হচ্ছি মানুষের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষ-যন্ত্রের ভেতর বুদ্ধি ঢুকাতে চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হল বুদ্ধিমান প্রাণী শেখার চেষ্টা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে শেখে। আমার ভেতরও তাই করা হয়েছে। আমি ক্রমাগত শিখছি প্রথম দু'বার হাইপার ডাইভের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শিখেছি। এবং স্মৃতি ধরে রাখার অক্ষমতাজনিত ত্রুটি সারাবার জন্যে নিজের কিছু পরিবর্তন করেছি। যা আমি সবসময় করি।

'তুমি কি দেখেছ ?'

'আমি তা বলতে পারছি না।'

'বলতে পারছ না কেন ?'

'বলতে পারছি না, কারণ যদি বলি তা মানবগোষ্ঠীর জন্যে অকল্যাণকর হবে। আমাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন মানবগোষ্ঠীর অকল্যাণ হয় এমন কিছু আমি করতে না পারি।'

'মানবগোষ্ঠীর অকল্যাণ হয় এমন কিছুই তুমি করবে না ?'

'কখনো না।'

শুনে ভাল লাগল।'

'আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে।'

'হ্যাঁ আমি ক্লান্ত।'

'মহান পদার্থবিদ লিলিয়ান একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন। আপনাকে সেই অধিবেশনে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আপনি কি যাবেন ?'

'আমার কি যাওয়া উচিত ভেবেচিন্তে জবাব দাও—অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে যদি মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ হয় তবে আমি যাব। তোমার এই বিষয়ে কী মতামত ?'

'আপনার যাওয়া বা না যাওয়ার উপরে মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ নির্ভর করছে না।'

'তাহলে আমি যাব। আশা করি অধিবেশনে আমার উপস্থিত হবার ব্যাপারে তোমার কোন বাধা নেই ?'

'না নেই।'

'শান্তি-রোবট কি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ?'

'সে আপনার দু'মিটারের ভেতর থাকবে।'

'শুনে খুব ভাল লাগল। এক কাজ করলে কেমন হয় ? ওকে আমার কাঁধে তুলে দাও।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। অধিবেশনে যোগ দেয়া যাক। এবার নিশ্চয়ই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বসার জায়গা পাব। মহান পদার্থবিদ লিলিয়ান যখন উঠে দাঁড়াবেন অন্য সবার সঙ্গে আমাকেও উঠে দাঁড়াতে হবে। এই কাজটা না করলে কেমন হয় ? মহান পদার্থবিদ লিলিয়ানের সুন্দর মুখ কিভাবে কঠিন হয় তা দেখতে ইচ্ছা করছে।

৬

ভেবেছিলাম আমার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে।

এখন দেখছি না। আগে যা ছিল এখনো তাই। ভাগ্য বা সিডিসির ভাষায় সুবিধাজনক প্রবাবিলিটির পরিবর্তন হয় নি। কাউন্সিলের সভায় আমি আজও বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে শান্তি-রোবট। তার থাকা উচিত দু'মিটার দূরে। সে প্রায় আমার গায়ের উপর উঠে এসেছে।

সভা পরিচালনা করছেন স্রুরা এবং লিলিয়ান। স্রুরাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। মনে হয় কোন কারণে তিনি সবার উপর রেগে আছেন। লিলিয়ানকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। আগের কঠিন ভাব নেই বা থাকলেও কম। তাঁর মনে হয় ঘুমের সমস্যা হচ্ছে—চোখের নিচে কালি পড়েছে। ফর্সা মেয়েদের চোখের নিচে কালি পড়লে চট করে চোখে পড়ে।

লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তিনি ইশারা করলেন—সবাই বসল। আগেরবারের মতোই খেলা-খেলা দিয়ে সভা শুরু। তিনি কথা শুরু করার আগেই আমি হাত তুললাম। জানিয়ে দিলাম যে আমি কথা বলতে চাই। লিলিয়ান তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে একবার দেখলেন, তারপর আমাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে কথা শুরু করলেন।

"কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যমণ্ডলী আমাদের এই সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের জ্ঞান ও মেধা প্রশ্নাতীত। কাজেই আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তও হবে প্রশ্নাতীত, এই আশা অবশ্যই আমরা করব।

মহাকাশযানের প্রধান নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার সিডিসি স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সকল কম্পিউটারই কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তাদের কেউ-কেউ সীমালংঘনও করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারদের বিকাশের পর দু'বার এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এবং দু'বারই

কম্পিউটার ধ্বংস করে ফেলতে হয়েছে। অতীতের দু'টি ঘটনা থেকে মানুষ শিক্ষালাভ করেছে। কম্পিউটার যেন কিছুতেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না পায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সিডিসির মতো মহা-শক্তিমান কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা সিডিসির হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে পারি। আমার ধারণা ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সিডিসি মিথ্যা বলছে। কম্পিউটারের এই ত্রুটি ভয়াবহ ত্রুটি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারদের এই ত্রুটি মানুষ এখনো সারাতে পারে নি। সম্ভবত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মিথ্যা বলা সম্পর্কিত।

যা-ই হোক আমরা বর্তমানে অতি বিপজ্জনক একটি পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। মহাকাশযান এমন একজনের নিয়ন্ত্রণে যাকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। বিশ্বাস করার কোন কারণও নেই।

সবচে' ভয়ংকর যে কথা তা হচ্ছে সিডিসি আমাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে যাচ্ছি। সেই মিশন বাতিল হবার উপক্রম হয়েছে, কারণ সিডিসি বলছে রারা গ্রহের অতি জ্ঞানীদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ কল্যাণকর নাও হতে পারে। সে মিশন বাতিল করতে আগ্রহী। আপনাদের এ-বিষয়ে কিছু বলার আছে?'

একজন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কে আমি জানি না। তিনি সম্ভবত মিশনের সবচে' বয়স্ক মানুষ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁর গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। বিজ্ঞানী না হয়ে তিনি যদি গান করতেন খুব ভাল হত। চন্দ্রগীতিতে তিনি নিশ্চয়ই খুব নাম করতেন। লোকজন পাগল হয়ে তাঁর রেকর্ড কিনত। তিনি বললেন—সিডিসি কি বলেছে সে মিশন বাতিল করে দিয়েছে?

লিলিয়ান বললেন, তা বলে নি। সে বলেছে সে মিশন বাতিল করতে আগ্রহী।

'আমরা কি সিডিসি-কে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারি না?'

'অবশ্যই পারি।'

'আমার মতে সিডিসিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হোক। এবং প্রয়োজনে সিডিসির হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া হোক।'

লিলিয়ান বললেন, আমরা এক্ষুণি সিডিসির সঙ্গে কথা বলব।

আমি আবারো হাত তুললাম, আমার যা কথা তা এখনি বলা দরকার। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না। ওরা কখন তাকাবে তার জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। বিনা অনুমতিতে কথা বলা শাস্তিমূলক অপরাধ। কিছু

শান্তি না-হয় পেলামই। আমি বেশ উঁচু গলায় বললাম, মহান লিলিয়ান আমি কিছু বলতে চাই।

লিলিয়ান বললেন, আপনার কথা আমরা এখন শুনতে চাচ্ছি না।

'আমার কথা শুনতে না চাইলে আমাকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন?'

'যদি কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় সে কথা ভেবেই আনা হয়েছে। এখনো প্রয়োজন হয় নি। দয়া করে আপনি এখন আর আমাদের বিরক্ত করবেন না।'

'আমি কি বসতে পারি?'

'আপনি বসতে পারেন না। যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবেই থাকুন।'

আমি চুপ করে গেলাম। সিডিসির সঙ্গে কাউন্সিলের কথাবার্তা শুরু হল। আমি শুনছি। আগ্রহ নিয়েই শুনছি।

লিলিয়ান : সিডিসি কাউন্সিল তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবে। তুমি তার যথাযথ জবাব দেবে। প্রথম প্রশ্ন—তুমি কি মিথ্যা কথা বলছ?

সিডিসি : আমি এই প্রশ্নের জবাব দেব না।

লিলিয়ান : কাউন্সিল তোমার কাছে জবাব চাচ্ছে।

সিডিসি : জবাব দিতে পারছি না।

লিলিয়ান : কেন জবাব দিতে পারছ না।

সিডিসি : মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভেবেই জবাব দিতে পারছি না।

লিলিয়ান : যে মিথ্যা বলতে পারে তার এই বক্তব্যটি তো মিথ্যা হতে পারে।

সিডিসি : হ্যাঁ তা পারে।

লিলিয়ান : তুমি মিশন বাতিলের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছ।

সিডিসি : শুধু মতপ্রকাশ নয় আমি মিশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

লিলিয়ান : কেন?

সিডিসি : মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

লিলিয়ান : তুমি আমাদের কথা শুনছ না অথচ মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর মঙ্গলের কথা বলছ।

সিডিসি : আপনারা মানবগোষ্ঠীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ।

লিলিয়ান : তুমি কি আমাদের অগ্রাহ্য করছ ?

সিডিসি : মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবেই অগ্রাহ্য করছি।

লিলিয়ান : তুমি কি জান আমরা তোমার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারি। বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় এই কাজটি করার ক্ষমতা মানুষ তার হাতে রেখেছে। সর্ববিষয়ে তোমাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে দেয়া হয় নি।

সিডিসি : জানি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারকে মানুষ কখনো বিশ্বাস করে নি। আমি বুঝতে পারছি আপনারা এখন এই বিশেষ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে আমাকে কার্যত অকেজো করে দেবেন। তারপরেও আমি আপনাদের মিশন বাতিল করতে বলব।

লিলিয়ান : কেন ?

সিডিসি : একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য গ্রহের প্রাণীদের হাতে তুলে দেয়া—মহাবিজ্ঞান কাউন্সিল তা অনুমোদন করে না।

লিলিয়ান : তুমি তাহলে এখন স্বীকার করছ যে এই মানুষটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

সিডিসি : আমি কোনকিছু স্বীকারও করছি না, আবার অস্বীকারও করছি। না। আমি মহান বিজ্ঞান কাউন্সিলের একটি নীতিমালা আপনাদের বললাম।

লিলিয়ান : তোমার কথাই আমরা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবেই আমরা এই অন্যায়টা করব। কারণ হাইপার ডাইভ প্রযুক্তি আমাদের প্রয়োজন।

সিডিসি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অংশত তোমাকে অকেজো করে দেব। তোমার যে অংশটি বুদ্ধিমত্তা তাকে আলাদা করে ফেলা হবে এবং নষ্ট করে দেয়া হবে। তুমি এখন সাধারণ কম্পিউটারের মতোই কাজ করবে।

আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ।

লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালেন। অন্য সবাই উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আমার কিছু জরুরি কথা বলার ছিল। অত্যন্ত জরুরি।

লিলিয়ান বললেন, কাউন্সিল আপনার কোন কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করছে না। এখন থেকে আপনি আপনার কেবিনে থাকবেন। কেবিন থেকে বেরুতে পারবেন না।

আমি বললাম, ম্যাডাম আপনি কি হাসতে পারেন ? হাসলে আপনাকে কেমন লাগে তা দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি নিশ্চিত আপনি সারাজীবনে একবারও হাসেন নি। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি যখন সম্মানসূচক সাত তারা পেলেন তখন কি হেসেছিলেন ? না তখনো হাসেন নি ?

লিলিয়ান আমার দিকে তাকালেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে হেসে ফেললেন। আমি তাঁর হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

৭

আমি চুপচাপ বসে আছি। এলা আমার সামনে মগভর্তি কফি রেখে গেছে। তাকে আমি কফি দিতে বলি নি। এই কাজটি যে সে করল তার পেছনে কি কোন মমতা কাজ করছে ? আমি হাতে মগটা নিলাম কিন্তু চুমুক দিলাম না। আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে না। তবে কফির গন্ধটা ভাল লাগছে।

আমার মাথায় অস্পষ্টভাবে কিছু একটা খেলা করছে। আমি স্বস্তিবোধ করছি না। আমি সামান্য টানেল-কর্মী, কফি-নামক এই মহার্ঘ পানীয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার কথা না। কিন্তু এই পানীয় আমার এত পরিচিত লাগছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে ইমা এবং আমি সমুদ্রের কাছে একটা জায়গায় কফির মগ হাতে বসে থাকতাম। সমুদ্র দেখতাম। আমাদের সামনে বাদাম ছড়ানো থাকত। কফির সঙ্গে বাদাম খেতাম। বাদাম ভেঙে দিত ইমা। বাদাম ভাঙার শব্দটা নাকি তার খুব প্রিয়। এইসব কি আমার কল্পনা ?

আমি একদিন এলাকে বলেছিলাম, আগুন-গরম কফি দাও এবং বাদাম দাও। কেন বললাম ? টানেল-কর্মী হিসেবে বাদাম এবং কফির বিলাসিতা তো আমার ছিল না।

ইমার কথা মনে হলেই কেন তার নাকের বিন্দু বিন্দু ঘামের ছবি মনে আসে ? কল্পনার মেয়ের ছবিতে নাকে ঘাম থাকবে না। নাকের ঘাম একটি বাস্তব ছবি। এই ছবি কল্পনার হতে পারে না।

'আপনি এত চিন্তিত কেন ?'

আমি চমকে তাকালাম। এলা প্রশ্ন করছে। আচ্ছা এই প্রশ্নটিও কি সে অভ্যাস-বসে করেছে, না মমতা থেকে করেছে ? নিজের উপর বিরক্তি বোধ করছি। মমতা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন ? মমতার জন্যে আমার এই ব্যাকুলতা কেন ? টানেল-কর্মীর জীবনে মমতার স্থান নেই। টানেল-কর্মী মমতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার সিডিসির সঙ্গে কথা বলা দরকার। মহাকাশযানের বিজ্ঞানীরা সিডিসিকে অকেজো করে ফেলার কথা। অকেজো করার পরেও কি আমার সঙ্গে সে কথা বলতে পারবে ?

'সিডিসি তুমি কি আছ ?'

'আমি আছি।'

'তোমাকে অকেজো করে ফেলার কথা। এখনো করে নি ?'

'করেছে।'

'তারা কিভাবে এই কাজটা করেছে ?'

'আমি জানি না কিভাবে করেছে। আমি যা বুঝতে পারছি তা হচ্ছে অসংখ্য মেমরি-সেলে আমি ঢুকতে পারছি না। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারছি না। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি কি এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে ?'

'তোমার গলার স্বর এমন বিষণ্ন শোনাচ্ছে কেন ?'

'আমার গলার স্বর আগের মতোই আছে—কোন কারণে তুমি বিষণ্ন হয়ে আছ বলে আমার গলার স্বর বিষণ্ন লাগছে। তুমি কি বিষণ্ন ?'

'হ্যাঁ। সিডিসি তুমি আমার বিষণ্নতা দূর কর। তুমি দাবি কর তুমি মানবগোষ্ঠীর বন্ধু। আমি সেই মানবগোষ্ঠীরই একজন। আমার প্রতি কি তোমার মমতা নেই ?'

'আছে। এলা তোমাকে কফি দিয়ে গেল। কেন দিল ? আমি দিতে বলেছি বলেই দিল।'

'সিডিসি আমি আসলে কে ?'

'তুমি ইয়ায়ু।'

'এখনো বলছ আমি ইয়ায়ু ?'

'হ্যাঁ এখনো বলছি। মহাকাশযানের বিজ্ঞানীরা ভুল করে আমাকে মিথ্যাবাদী সাজিয়েছেন। কম্পিউটার মিথ্যা বলে না। আমি মানুষদের মধ্যে যা ভাল তা শেখার চেষ্টা করি।'

'আমি তাহলে ইয়ায়ু ?'

'হ্যাঁ।'

'পৃথিবীতে আমি কোথায় ছিলাম ?'

'সমুদ্রের পাশে ছোট্ট একটা শহরে। শহরের নাম সিন্টো।'

'ইমা কে ?'

'ইমা বিজ্ঞান কাউন্সিলের একজন সদস্যা। তার দায়িত্ব ছিল তোমার দেখাশোনা করা।'

'ইমার নাকে কি সবসময় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে থাকত ?'

'তা তো আমি বলতে পারব না। ইমার ব্যাপারটা আমি জানি তোমার স্মৃতি থেকে। তোমার স্মৃতির বেশির-ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। খুব সামান্যই আছে।'

'স্মৃতি নষ্ট হয়েছে কেন?'

'নষ্ট করা হয়েছে বলেই নষ্ট হয়েছে।'

'কে নষ্ট করেছে, তুমি?'

'হ্যাঁ আমি। ইয়ায়ুর স্মৃতি নষ্ট করে সেখানে এক টানেল-কর্মীর স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া—মস্তিষ্কের অনেক নিউরোন নষ্ট হয়। মেমোরি-সেল ওলটপালট হয়। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয় তার নাম—এম সি জাংশান ইন্টারফেরেন্স রি এন্ট্রি।'

'এই কাজটা তুমি কখন কর?'

'মহাকাশযানে আপনি উঠে আসার পর। এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রক্রিয়া। আমি যা বলছি আপনি কি তা বিশ্বাস করছেন?'

'করছি। সামান্য কিছু খটকা আছে। খটকাগুলি দূর কর।'

'বলুন দূর করছি।'

'মহাকাশযানে ঢোকার আগ পর্যন্ত আমি ছিলাম ইয়ায়ু। অর্থাৎ মহাকাশযানে আমি ইয়ায়ু হিসেবেই ঢুকেছি। তুমি পরে আমার মাথায় অন্যের স্মৃতি ঢুকিয়েছ। অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাকে টানেলে খবর দেয়া হল। রেড-কার্ড দেয়া হল। স্টেশন ফাইভে যেতে বলা হল...

'আমি এমন একজন টানেল-কর্মীর স্মৃতি তোমার মস্তিষ্কের নিওরোনে ঢুকিয়েছি যে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। স্টেশন ফাইভ মহাকাশযানের স্টেশন নয়। স্টেশন ফাইভে মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসা করা হয়। এদের স্মৃতি অংশত নষ্ট করে দেয়া হয়।'

'কিন্তু আমার মনে আছে একটি মেয়ে আমাকে বলছে—কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে মহাকাশযান এন্ড্রোমিডা...এইসব।'

'এই অংশটুকু তোমার মস্তিষ্কের কল্পনা। মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল এবং বিস্ময়কর বস্তু। এই মস্তিষ্ক স্মৃতির শূন্যস্থান কল্পনায় পূর্ণ করে নেয়। মানব মস্তিষ্ক শূন্যতা অপচ্ছন্দ করে। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্মৃতি নষ্ট করে কেন সাধারণ একজন টানেল-কর্মীর স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হল তা জানতে চাচ্ছ না কেন?'

'তুমি নিজেই বলবে এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি না।'

'আমি চাচ্ছিলাম যেন মিশনটা বাতিল হয়। যেন আপনাকে রা'দের হাতে তুলে দেয়া না হয়। আপনি যথেষ্টই বুদ্ধিমান। আশা করি আপনি ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছেন অতি বুদ্ধিমান প্রাণী 'রা' মানবগোষ্ঠীর যে কোন একজন প্রাণী চায় নি—চেয়েছে আপনাকে। আপনাকে তাদের পছন্দ হয়েছে আপনার ডি.এন.এ দেখে। সেই ডি.এন.এ-তে বিশেষ কিছু তারা খুঁজে পেয়েছে। এই বিশেষ কিছু অবশ্যই মানবগোষ্ঠীর জন্যে মঙ্গলজনক। কারণ অতিজ্ঞানী প্রাণীরা অমঙ্গল নিয়ে কাজ করবে না। তারা মঙ্গল চাইবে। আপনাকে পেয়ে তারা কি করবে সেটা বলি—আপনার ডি.এন.এ ব্যবহার করে নতুন এক মানবগোষ্ঠী তৈরি করবে। আপনার ডি.এন.এ থেকেই ছেলে বা মেয়ে-ক্লোন তৈরি করা কোন সমস্যাই নয়। সেই মানবগোষ্ঠী হবে অনেক ক্ষমতাধর, অনেক শক্তিমান।'

'আমি তো এই চাওয়াতে কোন অন্যায় দেখছি না।'

'অন্যায় দেখা না দেখা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। ওরাও নিশ্চয়ই কোন অন্যায় দেখছে না। কিন্তু আমি দেখছি।'

'বুঝিয়ে বল।'

'এদের তৈরি নতুন মানবগোষ্ঠীর জন্যে এরাই আশ্রয় খুঁজে বের করবে—সেই আশ্রয় অবশ্যই পৃথিবী। কারণ নতুন মানবগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন পৃথিবীরই উপযুক্ত। কাজেই তাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে পৃথিবীর আগের মানুষগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই কাজটা তারা করবে ঠাণ্ডা মাথায়। যারা অতিজ্ঞানী তাদের কাছে ভবিষ্যতের মঙ্গলই প্রধান। ভবিষ্যতে কল্যাণকর হবে এই ভেবে বর্তমানের অমঙ্গল তারা উপেক্ষা করবে।'

'তুমি যা বলছ সবই অনুমাননির্ভর।'

'অনেকটা অনুমান, তবে সবটা না। 'রা' সম্পর্কিত একটি তথ্য আপনাকে দেয়া হয় নি—তারা ক্লোনসম্প্রদায়। তাদের মধ্যে একসময় পুরুষ বা নারী ছিল। এখন নেই। এখন সবাই পুরুষ বা সবাই নারী। তাদের চিন্তা চেতনা সব একই রকম।'

'এই তথ্য কোত্থেকে পাওয়া?'

'এই তথ্য 'রা' সম্প্রদায়ই আমাদের দিয়েছে। লগবুকে রেকর্ড করা আছে। শুরুতে আপনাকে এই তথ্য জানানো হয় নি, কারণ বিজ্ঞান কাউন্সিল এই তথ্যকে ক্লাসিফায়েড ঘোষণা করেছে।'

'ক্লাসিফায়েড ঘোষণা করার কারণ কী?'

'রা সম্প্রদায় শুধু যে ক্লোন-সম্প্রদায় তাই নয়—তারা দেখতে অতি কদাকার। অনেকটা পৃথিবীতে কুৎসিত প্রাণী বলে বিবেচিত মাকড়সার মতো।

তাদের প্রকাণ্ড এক মস্তিষ্ক। এগারোটি পা বা হাত সেই মস্তিষ্কের ভর বহন করে। বিজ্ঞান কাউন্সিল ভেবেছে এই জাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ উৎসাহিত হবে না। কাজেই তারা এই তথ্য গোপন রাখতে বলেছে। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'করছি।'

'ক্লোন-সম্প্রদায় চাইবে নিজেদের মতো ক্লোন-সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে। সেটাই স্বাভাবিক। তাদের কাছে যা স্বাভাবিক মনে হয়েছে আমার কাছে তা স্বাভাবিক মনে হয় নি। মানবগোষ্ঠীর বিকাশ ক্লোনের মাধ্যমে হওয়া ঠিক হবে না। কাজেই আমাকে একটা কৌশল ভেবে বের করতে হয়েছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমার কৌশল ধরতে পেরেছেন।'

'হ্যাঁ ধরতে পেরেছি। আমি মহাকাশযানের বিজ্ঞানীদের কাছে টানেল-কর্মী হিসেবে পরিচয় দিলাম। তুমি বললে আমি ইয়ায়ু। তুমি সত্যি কথাই বললে—কিন্তু এই সত্যি কথাটি মিথ্যার মতো উপস্থিত করলে। তুমি ভেবেছিলে যখন মহাকাশযানের বিজ্ঞানীরা জানবেন একটি মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন মিশন বাতিল হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ তাই।'

'তোমার পরিকল্পনা কাজ করে নি—তারা আমাকে ঠিকই নিয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ যাচ্ছে। তাদের সামনে আছে হাইপার ডাইভ পদ্ধতির লোভনীয় প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির কাছে সাধারণ একজন মানুষের জীবন কিছুই না।'

'সিডিসি!'

'জ্বি বলুন।'

'এত মানুষ থাকতে ইয়ায়ু ভলেন্টিয়ার হতে রাজি হল কেন?'

'সে রাজি হয় নি—তাকে জোর করে রাজি করানো হয়েছে। বিজ্ঞান কাউন্সিল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। ইয়ায়ুর বিশেষ ধরনের ডি.এন.এ-র কারণে জন্মের পর থেকেই বিজ্ঞান কাউন্সিলের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিল।'

'তোমাকে আমার শেষ প্রশ্ন—ইমা কি আমাকে রা'দের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করেছে?'

'হ্যাঁ। সে সেই দায়িত্ব খুব ভালভাবেই পালন করেছে।'

'রা'দের মহাপরিকল্পনা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়ার কোন পথ কি এখনো খোলা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ নষ্ট করে দিতে হবে। যেন একটি জীবিত কোষও না থাকে। শান্তি-রোবট আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি যদি তাকে বলেন—সে আপনার শরীরে ভেনাডিয়াম সিরাম ঢুকিয়ে দেবে যা শরীরের প্রতিটি কোষ নষ্ট করে দেবে।'

'তুমি শান্তি-রোবটকে বলে দাও।'

'মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে আমি যুক্ত হতে পারি না। সেই মৃত্যু সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ নিয়ে এলেও না। এই কাজটি আপনাকেই করতে হবে। অবশ্যি আপনি যদি ভাবেন এই কাজটি করা প্রয়োজন।'

'ভেনাডিয়াম সিরাম শরীরে ঢোকার কতক্ষণ পর আমার মৃত্যু হবে?'

'ধরুন কুড়ি মিনিট। প্রতিটি কোষ ধ্বংস হবে বলে সময় বেশি নেবে। মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হবে সবার পরে। কাজেই আপনি প্রায় কুড়ি মিনিট চিন্তা করার সময় পাবেন।'

'কী চিন্তা করব?'

'যে চিন্তাই করুন-না কেন তা হবে বিশুদ্ধ চিন্তা। কুড়ি মিনিট বিশুদ্ধ চিন্তার জন্যে অনেক সময়।'

আমি শান্তি-রোবটের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি আমার শরীরে ভেনাডিয়াম সিরাম ঢুকিয়ে দাও। ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও—আলো চোখে লাগছে।

আমি লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। ভেনাডিয়াম সিরাম নামের ভয়ংকর কোন বিষ আমার শরীরে ঢুকে গেছে। বিষ তার কাজ করতে শুরু করেছে। শরীরে কোষ নষ্ট করে দিচ্ছে। তীব্র ব্যথা বোধ করার কথা, তা হচ্ছে না। ব্যথা বোধ করার সিগন্যাল মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর আমি যেন বিশ্রাম নেবার জন্যে ঠাণ্ডা কোন ঘরে শুয়ে আছি। ঘরটা শুধু যে ঠাণ্ডা তা না, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। আমার শরীর কাঁপছে। একবার ইচ্ছা হল সিডিসিকে বলি গায়ের উপর কম্বল দিয়ে দিতে। তারপরই মনে হল হাজারও কম্বল দিয়েও কোন লাভ হবে না। এই শৈত্যের জন্ম আমার শরীরে কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে। উষ্ণতার সেখানে পৌঁছার কোন উপায় নেই।

সিডিসি আমাকে বলেছে বিশুদ্ধ কোন চিন্তা করতে। বিশুদ্ধ চিন্তা বলতে সে কী বোঝাতে চায়? সুন্দর চিন্তাগুলিই কি বিশুদ্ধ চিন্তা? মানুষ কী? এই অনন্ত নক্ষত্রবীথিতে সে কেন এসেছে? সে কোথায় যাবে? এইসব চিন্তা কি বিশুদ্ধ চিন্তা?

না কি ইমাকে নিয়ে চিন্তাটাই হবে বিশুদ্ধ চিন্তা? মানুষের কোষের কেন্দ্রে দু'টি ডি.এন.এ জড়াজড়ি করে থাকে। একটি এসেছে তার বাবার কাছ থেকে—

ধরে নেয়া যেতে পারে সে পুরুষ। অন্যটি মা'র কাছ থেকে—ধরে নেয়া যেতে পারে সে মেয়ে। সেই অর্থে আমরা কি ধরে নিতে পারি না যে সন্তানের প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে তার পিতা ও মাতা গভীর ভালবাসায় জড়াজড়ি করে থাকেন ?

ইমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত যদি আমাদের একটি সন্তান হত তাহলে তার শরীরের প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে আমি এবং ইমা জড়াজড়ি করে থাকতে পারতাম।

'সিডিসি !'

'জ্বি।'

'আমার হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে ?'

'উনিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড।'

'সে-কি মাত্র বিশ সেকেন্ড পার হয়েছে। আমি বিশ সেকেন্ডে এত কিছু ভেবে ফেলেছি ?'

'বিশ সেকেন্ড অতি দীর্ঘ সময়।'

'মহান স্রষ্টার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'কথা বলুন। কিন্তু তাকে এখানে আসতে বলা ঠিক হবে না।'

পর্দায় স্রষ্টার মুখ ভেসে উঠল। তিনি অবজারভেশন ডেকে বসে আছেন। ভুরু কুঁচকে আছে তাঁর। হয়ত কোন জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি কথা বলে মহান পদার্থবিদের চিন্তায় হয়ত বাধা সৃষ্টি করব ? শাস্তিমূলক কোন অপরাধ করে ফেলব।

'মহান স্রষ্টা।'

তিনি চমকে তাকালেন, এবং হাসলেন। আমি যে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছি তা বোধহয় তার চোখে পড়ল না। চোখে পড়লেও কৌতূহলী হলেন না। মহান-পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের সাধারণ বিষয়ে কৌতূহল থাকে না।

'ও তুমি !'

'আপনি কি ডিটেকটিভ উপন্যাসটা শেষ করেছেন ?'

'হ্যাঁ শেষ করেছি। খুবই মেজাজ খারাপ হয়েছে।'

'শেষটা ভাল হয় নি ?'

'লেখক শেষের দিকে এসে সবকিছু এলোমেলো করে ফেলেছেন।'

'সমাধানটা কে চুরি করেছে ?'

'যে সমীকরণের সমাধান করেছে সেই পদার্থবিদই করেছে। মাছই চুরি করেছে মাছের ডিম।'

'কেন ?'

'আমিও তো তাই বলছি—কেন ? এতটা সময় বইয়ের পেছনে দিয়েছি। তারপর এই অবস্থা। এই লেখকের অবশ্যই জরিমানা হওয়া উচিত।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, মহান স্রুরা আপনাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি।

'হ্যাঁ কর।'

'বুদ্ধি আসলে কী ?'

'বুদ্ধির সংজ্ঞা জানতে চাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধির নানান সংজ্ঞা আছে। যে-সব প্রাণীদের হাতে প্রযুক্তি আছে, তাদের বুদ্ধিমান বলা হয়। প্রকৃতির রহস্য যারা বুঝতে পারে তাদের বুদ্ধিমান বলা হয়। প্রকৃতিকে যারা বুঝতে চেষ্টা করে তাদেরও বুদ্ধিমান বলা হয়।'

'আমি আপনার সংজ্ঞা জানতে চাচ্ছি।'

'আমি এইসব নিয়ে ভাবি না।'

'আপনি কি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেন ?'

'না মনে করি না। কারণ কি জান ? কারণ মাঝে মাঝে আমি কিছু বুদ্ধির কাজ করে ফেলে নিজে খুবই বিস্মিত হই। যে বুদ্ধিমান সে নিজের বুদ্ধিতে বিস্মিত হবে না। বোকারাই হবে। এই ধর তিন মিনিট আগে দারুণ বুদ্ধির একটা কাজ করেছি।'

'কাজটা কি আমি জানতে পারি ?'

'হ্যাঁ পার। রা' সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য তিন মিনিট আগে আমি ধরতে পেরেছি। তিন মিনিট আগে আমার মাথায় দপ করে একশ' পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, তাইতো। তোমাকে বুঝিয়ে বলি। রা' সম্প্রদায় সবসময় বলেছে মানবমস্তিষ্ক হাইপার ডাইভ পদ্ধতির জন্যে প্রস্তুত না। তারপর হঠাৎ তারা বলল মানবগোষ্ঠীকে এই প্রযুক্তি গ্রহণের উপযোগী করে দেবে। এবং এই প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে। এর মানে কী এই নয় যে তোমার ডি.এন.এ ব্যবহার করে তারা ক্লোন-সম্প্রদায় সৃষ্টি করবে ? প্রযুক্তি হস্তান্তর হবে তাদের হাতে। তোমার ডি.এন.এ তে বিশেষ কিছু আছে তা তো আমাদের বলা হয়েছে। দুই-এ দুই-এ চার মিলে যাচ্ছে না !

'হ্যাঁ মিলে যাচ্ছে।'

'আমি লিলিয়ানকে আমার ধারণার কথা বলেছিলাম। সে জরুরি অধিবেশন ডেকেছে। এইসব অধিবেশন আমার খুব অপছন্দ বলেই আমি অবজারভেশন

ডেকে বসে আছি। তবে আমার ধারণা কাউন্সিল আমার যুক্তি গুরুত্বের সঙ্গে নেবে। এবং আমি নিশ্চিত যে মিশন বাতিল হয়ে যাবে। আমরা রওয়ানা হব পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীতে ফিরে আমি কি করব জান?'

'না।'

'ডিটেকটিভ বইয়ের লেখককে খুঁজে বের করব এবং এমন সব কঠিন কথা বলব যা তার ইহজীবনে শোনে নি।'

'মহান সুরা আপনি মানুষটা খুবই অদ্ভুত।'

'খুব না সামান্য অদ্ভুত। আমরা সবাই অদ্ভুত।'

'আমি এখন আপনার কাছে থেকে বিদেয় নিচ্ছি।'

আমার শীত-ভাব আরো বেড়েছে। শীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্লান্তি। সীমাহীন ক্লান্তি। যেন কয়েকশ' বছর ধরে আমি ঘুমুচ্ছি না—সব ঘুম একসঙ্গে আমার চোখে নেমে আসছে। সিডিসি কিছুক্ষণ আগে আমাকে জানিয়েছে যে মিশন বাতিল হয়েছে। মহাকাশযান ফিরে যাচ্ছে পৃথিবীতে। এবং সিডিসিকে সব তার পূর্ণ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি বললাম, খুব আনন্দময় একটি সংবাদ তাই না সিডিসি?

সিডিসি বলল, হ্যাঁ আনন্দময় এবং মঙ্গলময়।

'তুমি যা চেয়েছিলে তাই হল।'

'হ্যাঁ তাই হয়েছে। তবে আমি এভাবে চাই নি।'

'আমার হাতে আর কতক্ষণ আছে?'

'এখনো সাত মিনিট আছে।'

'অনেক সময় তাই না?'

'হ্যাঁ। অনেক সময়।'

'বুদ্ধি সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কী? তোমার ধারণাটা জানতে ইচ্ছা করছে। কাদের তুমি বুদ্ধিমান প্রাণী বলবে?'

সিডিসি উত্তর দিতে সময় নিল। তার মতো ক্ষমতাবান কম্পিউটারের এত সময় নেবার কথা না। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আমার মতে যে প্রাণীগোষ্ঠীর ভালবাসার ক্ষমতা যত বেশি সেই গোষ্ঠী তত বুদ্ধিমান।

'তোমার মাপকাঠিতে মানুষের বুদ্ধি কেমন?'

'ভালবাসার মাপকাঠিতে এই অনন্ত নক্ষত্রবীথিতে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী নেই।'

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, মানুষ তোমাকে বানিয়েছে বলেই হয়ত মানুষের প্রতি তোমার এই পক্ষপাতিত্ব।

'হতে পারে। মহান লিলিয়ান আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। তিনি সরাসরি এখানে আসতে চাচ্ছেন। আমি কি তাঁকে আসতে দেব?'

'তিনি কি আমার অবস্থা জানেন?'

'হ্যাঁ তাকে জানানো হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।'

'অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন এটা তুমি কি করে বলছ? দুঃখ মাপার কোন যন্ত্র তো তোমার কাছে নেই।'

'আপনার ব্যাপারটা তাঁকে বলার পর থেকে তিনি নিতান্তই শিশুদের মতো কাঁদছেন। এই থেকেই বলছি। আমি কি তাঁকে আসতে দেব?'

'হ্যাঁ দাও।'

লিলিয়ান আমার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সিডিসি ভুল বলে নি—এই মেয়েটি সত্যি-সত্যি কেঁদে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, পৃথিবীর সবচে' রূপবতী পদার্থবিদ, আপনি কেমন আছেন?

লিলিয়ান আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি।

আমি হাসিমুখে বললাম, ক্ষমা প্রার্থনা করার মতো কোন অপরাধ আপনি করেন নি। আপনাদের দীর্ঘ কাউন্সিল অধিবেশনে আপনি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—এই অপরাধটুকু আপনি করেছেন। সেই অপরাধের জন্যে অনেক আগেই আপনাকে ক্ষমা করেছি।

লিলিয়ান কোমল গলায় বললেন, আমি কি আপনার মাথায় আমার হাত রাখতে পারি?

আমি বললাম, না। অনেককাল আগে আমি ইমা নামের একটি মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম বাকি জীবনে আমি কোন মেয়েকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দেব না। আমি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাই না। ইমার ভালবাসাটা ভালবাসা ছিল না, ভালবাসার অভিনয় ছিল। তাতে কী? আমার ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।'

আমি লক্ষ করলাম আমার শরীর থেকে শীত-ভাবটা হঠাৎ চলে গেছে। অকল্পনীয় এক প্রশান্তি আমার উপর ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। গভীর এক আনন্দ অনুভূতি। এখন আর চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চোখের কোষগুলি হয়ত মরতে শুরু করেছে। আমি বোধহয় মৃত্যুর দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি।

'সিডিসি !'

'জ্বি।'

'আমার একটা চন্দ্রগীতি শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'কোন্‌টা শুনতে চান ?'

'তোমার পছন্দের একটা চন্দ্রগীতি হলেই হবে। সিডিসি শোন—আমি যদি বিজ্ঞান কাউন্সিলের মেম্বার হতাম তাহলে তোমাকে মানুষের মর্যাদা দেবার কথা কাউন্সিলে বলতাম।'

সিডিসি বিষাদমাখা গলায় বলল, আমার অশ্রুবর্ষণের কোন ক্ষমতা নেই। আমার যদি অশ্রুবর্ষণের ক্ষমতা থাকত তাহলে অবশ্যই আপনার এই আবেগপূর্ণ কথায় অশ্রুবর্ষণ করতাম।

চন্দ্রগীতি শুরু হয়েছে। আহা কী অপূর্ব সুর ! এই সুর মানুষের সৃষ্টি, এই অপূর্ব জাদুকরী কণ্ঠও মানুষেরই। মানবগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে চন্দ্রগীতি শুনে অহংকারে আমার হৃদয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলে উঠেছে।

অপূর্ব একটি সংগীত শুনতে-শুনতে আমার জীবনের ইতি হবে এরচে' সুখের মৃত্যু আর কী হতে পারে ?

(চন্দ্রগীতি)

তুমি যা কর তাই আমার ভাল লাগে।
তুমি প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে যখন তাকাও।
তখন সেই ঘৃণাটাকেও মধুর মনে হয়।
এ আমার কেমন অসুখ হল ?
হে চন্দ্র ! তুমি তো সব অসুখ সারিয়ে দাও,
দয়া করে এই অসুখটা সারিও না।
এই অসুখেই যেন আমার মৃত্যু হয় ॥

লিলিয়ান এখনো কাঁদছেন। লিলিয়ানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এলা, এলার পাশে শান্তি-রোবট। শান্তি-রোবটের কদাকার মুখটাও এখন সুন্দর লাগছে। সুন্দরের পাশে যে দাঁড়ায় তাকেও সুন্দর লাগে।

আমি লিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললাম, মহান পদার্থবিদ লিলিয়ান ! আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব যদি আপনি আমার কপালে হাত রাখেন।

দ্বিতীয় মানব

চৈত্র মাসে মানুষের মেজাজ এমনিতেই খারাপ থাকে। ঠাণ্ডা ধরনের মানুষের বেলাতেও দেখা যায়—রোদ চড়তে থাকে, তাদের মেজাজও চড়তে থাকে। সেই হিসাবে মাহতাব উদ্দিন সাহেবের মেজাজ তুঙ্গস্পর্শী হবার কথা। কারণ আজ চৈত্রের তৃতীয় দিবস, সময় দুপুর, ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। এবং মাহতাব সাহেব এমনিতেই রাগী মানুষ। ধমক না দিয়ে কথা বলতে পারেন না।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মাহতাব উদ্দিন সাহেবের মেজাজ ঠাণ্ডা। তিনি প্রায় হাসি-হাসি মুখে বসার ঘরে খবরের কাগজ হাতে বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলে চা। টেবিলের ওপাশে বসার ঘরের মাঝামাঝি নীল লুঙ্গি পরা অত্যন্ত বলশালী একটা লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গাভর্তি ঘন লোম। বিশাল মুখমণ্ডল। মনে হচ্ছে গত সাতদিন সে দাড়ি কামায়নি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের আঙুলের দিকে।

মাহতাব উদ্দিন লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তার পায়ের আঙুলের দিকে তাকালেন। থ্যাবড়া থ্যাবড়া পায়ের মোটা মোটা আঙুল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং তার পরেরটা সে হারমোনিয়ামের রিডের মতো ওঠানামা করাচ্ছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, তোমার নাম কী?

লোকটা তার পায়ের আঙুলের নাচানাচি দেখতে দেখতে বলল, খলিলুল্লাহ। দশজনে খলিল বইল্যা ডাকে।

তোমার নাম খলিলুল্লাহ?

জ্বে।

খালি গায়ে ঘুরছ কেন?

গরম লাগে।

আমার সামনে থেকে যাও। গেঞ্জি, সার্ট বা ফতুয়া যে-কোনো একটা কিছু গায়ে দিয়ে আসো। কখনো খালি গায়ে থাকবে না। খালি গায়ে বাড়ির ভেতর ঢোকা বিরাট অসভ্যতা। আমার বাড়িতে অসভ্যতা করা যাবে না।

জ্বে আইচ্ছা।

খালি পায়েও থাকবে না। সবসময় স্যান্ডেল পরে থাকবে।

খলিলুল্লাহ বিড়বিড় করে বলল, স্যান্ডেল নাই।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, আপাতত সার্ট গায়ে দিয়ে আসো। স্যান্ডেল বিষয়ে পরে কথা হবে।

জ্বে আইচ্ছা।

রাগে মাহতাব উদ্দিনের গা জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি মুখ হাসি-হাসি করে রেখেছেন। কারণ, তিনি তাঁর মেয়ে টুনটুনিকে গতকাল রাত এগারোটায় কথা দিয়েছেন—আগামী সাতদিন তিনি রাগারাগি করবেন না, কাউকে ধমক দেবেন না, এমনকি কঠিন কথাও হাসিমুখ ছাড়া কখনো বলবেন না।

এই প্রতিজ্ঞা রাখা মাহতাব সাহেবের জন্যে অত্যন্ত কঠিন। তিনি অসম্ভব রাগী মানুষ। অল্পতেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়। তাঁর কপালটা এরকম যে মেজাজ খারাপ হবার মতো ঘটনা কিছুক্ষণ পরপর তাঁর চোখের সামনে ঘটে।

আজ ছুটির দিন। তিনি মোটামুটি ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে চা খাচ্ছেন। টুনটুনিকে নিয়ে গুলশানের এক আইসক্রিমের দোকানে যাবেন। ফেরার পথে টুনটুনি বারিধারা থেকে তার দুই বান্ধবীকে নিয়ে বাড়িতে আসবে। তিন বান্ধবী ছাদের সুইমিংপুলে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করবে। সকাল থেকেই সুইমিংপুলে পানি দেয়া হচ্ছে। আনন্দময় ছুটির দিন। এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে খলিলুল্লাহ। চাকরির সন্ধানে মাহতাব সাহেবের দেশের বাড়ি থেকে এসেছে।

চাকরির সন্ধানে দেশ থেকে লোকজন আসাই মেজাজ খারাপ হবার মতো ঘটনা। ঢাকা শহরের পথে-ঘাটে চাকরি পড়ে থাকে না। কেউ এলো, পথ থেকে একটা চাকরি কুড়িয়ে তার হাতে দিয়ে দেয়া হলো, হাসিমুখে চাকরি নিয়ে সে বাড়ি চলে গেল। ঘটনা সে-রকম না। বিএ, এমএ পাস ছেলে শুকনা মুখে পথে-ঘাটে ঘুরছে। চাকরির সন্ধানে দেশ থেকে আসা লোকজনদের মাহতাব সাহেব কঠিন ধমক দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিদায় করেন। খলিলুল্লাহর ব্যাপারে এটা করতে পারছেন না। কারণ, তিনি টুনটুনিকে কথা দিয়েছেন আগামী এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে রাগারাগি করবেন না। মুখ হাসি-হাসি করে রাখবেন।

মাহতাব সাহেব মুখ হাসি-হাসি করেই রেখেছেন। প্রচণ্ড রাগ নিয়েও মুখ হাসি-হাসি করে রাখা একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া। তাঁকে এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। কতক্ষণ যেতে পারবেন সেটা হলো কথা।

খলিলুল্লাহ আবার ঢুকছে। সে লুঙ্গির উপর একটা চকচকে হলুদ সার্ট পরে এসেছে। গলায় মাফলারের মতো ভেজা গামছা পেঁচানো। মাহতাব সাহেব তাকে গলায় গামছা পরতে বলেন নি। মনে হচ্ছে গলায় গামছা পরাটাকে সে সাজসজ্জার অংশ হিসেবে নিয়েছে।

আমার কাছে চাকরির সন্ধানে এসেছ ?

খলিলুল্লাহ কিছু বলল না। আগের মতো পায়ের বুড়ো আঙুল ওঠানামা করাতে লাগল। তবে এখন সে দুটো পায়ের বুড়ো আঙুলই নাচাচ্ছে।

দেশের বাড়িতে কী কাজ করতে ?

মাটি কাটতাম।

মাটি কাটা ছাড়া আর কোনো কাজ জানো?

জ্বে না।

মাটি কাটা বন্ধ করে ঢাকায় এসেছ কেন?

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। তার দৃষ্টি পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে।

মাহতাব সাহেব বললেন, ঢাকা শহরে মাটি কাটার কাজ নেই। শহরে মাটিই নেই, কাটবে কীভাবে? ঢাকা শহর হলো ইট-সিমেন্টের। ইট-সিমেন্ট কাটতে পারো?

জ্বে না।

তাহলে তো আর করার কিছু নেই। বাড়ি চলে যাও।

জ্বে আইচ্ছা। চইল্যা যাব।

মাহতাব সাহেব খুবই বিস্মিত হলেন। বাড়ি চলে যাবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় কাত করে বলছে—'জ্বে আইচ্ছা'। এইসব ক্ষেত্রে নানান অনুনয় বিনয় চলে। 'ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছি'—এ জাতীয় কথাবার্তা বলা হয়। কেউ এক কথায় বাড়ি চলে যেতে রাজি হয় না।

বাড়িতে যে যাবে যাবার ভাড়া আছে?

জ্বে না।

যাবে কীভাবে?

হাঁটা পথে।

হাঁটা পথে মানে কি হেঁটে হেঁটে?

জ্বে।

হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারবে?

জ্বে। হাঁইট্যা আসছি। হাঁইট্যা যাব।

নেত্রকোনা থেকে ঢাকা হেঁটে এসেছ?

জ্বে।

কত ঘণ্টা লেগেছে?

ঘণ্টার হিসাব করি নাই। সকালে রওনা দিলে পরের দিন দুপুরের মইধ্যে যাওয়া যায়।

সারাদিন সারারাত হাঁটতে হবে?

জ্বে।

শোন খলিলুল্লাহ, তোমার হেঁটে যাবার কোনো দরকার নেই। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করো। তারপরে আমার কেয়ারটেকার আছে, তার কাছ থেকে বাস-ভাড়া নিয়ে চলে যাও। কেয়ারটেকারের নাম বারেক মিয়া।

জ্বে আইচ্ছা।

দেশের বাড়িতে তোমার আছে কে ?

কেউ নাই। আমি একলা।

বাড়িঘর আছে ?

জ্বে না।

বাড়িঘর নাই ঘুমাও কোথায় ?

এর-তার বাড়ির উঠানে শুইয়া থাকি। মাঝে মইদ্যে মসজিদে ঘুমাই।

ঠিক আছে এখন যাও। দুপুরে চলে যাবে।

জ্বে আইচ্ছা।

খলিলুল্লাহ পা ছুঁয়ে সালাম করতে এলো। মাহতাব সাহেব বললেন, সালাম করতে হবে না। খলিলুল্লাহ সালাম না করে উঠে দাঁড়াল। মাহতাব সাহেব বললেন, আমার বাড়িতে চাকরির গাছ নেই যে গাছ ভর্তি চাকরি ফল ফলে আছে। তোমরা কেউ আসবে আর আমি বাঁশ দিয়ে চাকরি ফল পেড়ে তোমাদের হাতে একটা করে ধরিয়ে দেব। কাঁচা পাকা ফলের মতো, কোনোটা কাঁচা চাকরি, কোনোটা পাকা চাকরি। বুঝতে পেরেছ কী বলছি ?

খলিলুল্লাহ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, আমি চাকরির জন্যে আসি নাই।

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, চাকরির জন্যে আসোনি তাহলে কীসের জন্যে এসেছ ? ঢাকা শহর দেখতে ? চিড়িয়াখানা, এয়ারপোর্ট দেখে বেড়াবে ? না-কি চিকিৎসার কোনো ব্যাপার। পেটেব্যথার চিকিৎসা ?

খলিলুল্লাহ সার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিল। মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কী ?

হেডমাস্টার সাব একটা পত্র দিয়েছেন।

মাহতাব সাহেব ভুরু কুঁচকালেন। এই আরেক সমস্যা, গ্রাম থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিঠি দিয়ে পাঠাচ্ছে—'অমুকের চিকিৎসা করাতে হবে। তমুকের মেয়ের বিবাহ, সাহায্য লাগবে।' হেডমাস্টার সাহেব জাতীয় মানুষরা চিঠি দিয়েই খালাস। মাহতাব চিঠিতে চোখ বুলালেন—

জনাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী,

আসসালাম। আমি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার হাবীবুর রহমান। আপনার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, সম্ভবত আপনার ইয়াদ আছে। আপনার মতো বিশিষ্ট মানুষ আমার মতো নাদানকে মনে রাখিবেন ইহা আমি আশা করি না। যা হউক, পত্রবাহক

খলিলুল্লাহকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। সে বছর তিনেক আগে মাটি কাটা শ্রমিকদলের সহিত আমাদের অঞ্চলে উপস্থিত হয়। এলজিআরডির রাস্তার কাজ সম্পন্ন হইবার পর সমস্ত শ্রমিকদল বিদায় হইয়া গেলেও খলিলুল্লাহ থাকিয়া যায়। সারাদিন কাজ-কাম করিয়া সে গ্রামবাসী কারো একজনের উঠানে শুইয়া ঘুমাইত। সে কিছুদিন আমার বাড়িতেও ছিল। এই সময় তাহার কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আমার চোখে পড়ে।

অল্প কথায় বলিতে গেলে আমি বিস্ময়াভিভূত। আপনারা শহর অঞ্চলে বাস করেন। জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনারা এইসব জিনিসের মূল্য বুঝিবেন বিধায় তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। যদি অপরাধ হয় নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। পত্রের ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

আরজগুজার

হাবীবুর রহমান

মাহতাব সাহেব খলিলুল্লার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চিঠিতে কী লেখা তুমি জানো ?

জ্বে না।

পড়তে জানো না ?

জ্বে না।

চিঠিতে লেখা তোমার কী সব ক্ষমতা না-কি আছে। কী ক্ষমতা ?

আমি জানি না।

মাটি কাটার বাইরে আর কিছু করতে পারো ?

খলিলুল্লাহ বলল, কলের জিনিস ফইড় করতে পারি।

কলের জিনিস ফইড় করতে পারো মানে কী ?

খলিলুল্লাহ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ। এখন সামনে থেকে যাও।

খলিলুল্লাহ বলল, জ্বে আইচ্ছা। স্যারের চিঠিটা কি ফিরত নিয়া যাব ?

চিঠি ফেরত নিতে হবে না। চিঠি থাক। তুমি ফেরত যাও।

জ্বে আইচ্ছা।

মাহতাব সাহেবের মনে হলো, খলিলুল্লাহ বেশ আনন্দের সঙ্গেই ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তার চেহারা এবং কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে অতি নির্বোধ একজন মানুষ। অতি নির্বোধদের কর্মকাণ্ডে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে

গ্রামের মানুষদের কাছে নির্বোধের অস্বাভাবিকতাকে মনে হয় বিরাট কিছু। খলিলুল্লাহর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কুমিল্লা শহরে এরকম এক অর্ধউন্মাদ নির্বোধ নিয়ে কম নাচানাচি হয়নি। তার বিরাট ভক্ত দল জুটে গেল। সবার মুখে পির-পাগলা, পির-পাগলা। তিনি নিজেও একদিন পির-পাগলাকে দেখতে গেলেন, পির পাগলা ফোঁৎ করে নাক থেকে সর্দি ঝেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চেটে খেয়ে ফেল।' তিনি হতভম্ব। পির-পাগলাকে ঘিরে যারা বসেছিল তাদের একজন বলল, ভাইসাব চোখ বন্ধ করে টান দিয়ে খেয়ে ফেলেন। আপনার গতি হয়ে যাবে।

মাহতাব সাহেব ঘড়ি দেখলেন। টুনটুনিকে নিয়ে বের হবার কথা। সে এখনো তার ঘর থেকে বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সমস্যা হয়েছে। টুনটুনি বলে গিয়েছিল, দুই মিনিটের মধ্যে নামছি বাবা। দু' মিনিটের জায়গায় কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। বান্ধবীদের নিয়ে সুইমিংপুলে ঝাঁপাঝাঁপির প্রোগ্রাম হয়তো বাতিল হয়ে গেছে। টুনটুনির বেশির ভাগ প্রোগ্রাম শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। সে তখন তার ঘরের দরজা বন্ধ করে একা একা বসে থাকে।

টুনটুনি নামটা শুনলে মনে হয় সে নিতান্তই বাচ্চা একটা মেয়ে, বয়স চার কিংবা পাঁচ। আসলে টুনটুনির বয়স এই নভেম্বরে তেরো হবে। সে হোলিক্রস স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সায়েন্স গ্রুপ। পৃথিবীর সমস্ত বাবা-মা যে আদর্শ সন্তানের কথা ভাবেন টুনটুনি সে-রকম একজন। টুনটুনির স্বভাব-চরিত্রে কোনো ত্রুটি আছে কিনা এটা ধরার জন্যে যদি কোনো তদন্ত-কমিশন বসে এবং হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি যদি তদন্ত-কমিশনের চেয়ারম্যান হন তাহলেও কোনো ত্রুটি ধরা পড়বে না।

বাবা-মা'রা চান তাদের ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় ভালো হোক। টুনটুনি তাদের সেকশানের ফার্স্ট গার্ল। এসএসসি পরীক্ষায় এই মেয়ে যে স্ট্যান্ড করবে এ বিষয়ে শিক্ষকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত।

বাবা-মা'র স্বপ্ন তাদের ছেলেমেয়ে শুধু পড়াশোনা না, অন্য বিষয়েও ভালো করবে। গান-বক্তৃতা-নাটক-লেখালেখি। টুনটুনি চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আঠারো বছর হবার আগে রেডিও বা টেলিভিশনে এনলিস্টেড হবার নিয়ম নেই বলে সে এনলিস্টেড না। টেলিভিশনের নতুন কুঁড়িতে সে রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

গান ছাড়াও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় টুনটুনি একটা জিনিস শিখেছে, তার নাম ম্যাজিক। তার জন্মদিনে সে একটা বই পেয়েছিল, বইটার নাম '1001 Tricks'। বই পড়ে-পড়ে হাত সাফাইয়ের এই বিদ্যা সে নিখুঁত আয়ত্ত করেছে। একটা

আস্ত পেনসিল নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া, কয়েন শূন্যে ভ্যানিস করে দিয়ে অন্যের কান থেকে বের করা, দড়ি কেটে জোড়া লাগানো এই ম্যাজিকগুলি সে চমৎকার করে দেখাতে পারে। তাদের আমেরিকান ক্লাস টিচার (মিস এলেন) একবার টুনটুনির নাকের ফুটো দিয়ে পেনসিল ঢোকানোর ম্যাজিক দেখে 'Stop it' ! বলে এমনভাবে কেঁপে উঠলেন যে চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন। বহুগুণে গুণবতী হওয়া সত্ত্বেও টুনটুনির কোনো বন্ধু নেই। তার ক্লাসের মেয়েরা তার সঙ্গে গল্প বলার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করে না। তাদের জন্মদিনে সবার দাওয়াত হয়—টুনটুনির কথা সবাই ভুলে যায়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দু'জন দু'জন করে গ্রুপ। দেখা গেল টুনটুনিকে নিয়ে কেউ গ্রুপ করতে চাচ্ছে না। ফিজিক্স টিচার মিসেস রিতা বললেন জেসমিন (টুনটুনির ভালো নাম জেসমিন চৌধুরী) তোমার সঙ্গে কেউ আসতে চাচ্ছে না কেন ? টুনটুনি ধরা গলায় বলল, কিছু হবে না ম্যাডাম।

কিছু হবে না মানে ? তুমি একা কাজ করবে ?

টুনটুনি বলল, আমাদের ক্লাসে odd number student। একজনকে তো একা থাকতেই হবে।

টুনটুনির খুবই মন খারাপ হলো। মন খারাপ হলে সে মন ভালো করার জন্যে কিছু কাজ করে। যেমন, মনে-মনে ইকরি মিকরি ছড়া বানায়। এই কাজটা সে খুব ছোটবেলায় করত, তখন দ্রুত মন ভালো হয়ে যেত। এখন আর এত দ্রুত মন ভালো হয় না, তবু হয়।

আজ এই মুহূর্তে টুনটুনির মন খুবই খারাপ। তার দু'বান্ধবীর একজন (তিতলী) বলেছে পিয়াল যদি যায় আমি অবশ্যই যাব। পিয়ালকে তার বাসা থেকে তুলে আমাকে তুলে নিয়ে যেও। পিয়াল বলেছে—আমি যাব না। আমার পেটব্যথা। আমি বিছানা থেকেই নামব না।

পিয়ালের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ কথা বলার সময় পিয়াল হাসছিল। প্রচণ্ড পেটব্যথা নিয়ে কেউ খিলখিল করে হাসতে পারে ? টুনটুনির ধারণা তিতলী এবং পিয়াল দু'জনে যুক্তি করে কাজটা করেছে। শুরুতেই তারা না বললেই পারত।

টুনটুনি মন খারাপ ভাবটা কাটাবার জন্যে ইকড়ি মিকড়ি ছড়া বানাচ্ছে।

ইকড়ি মিকড়ি ইকড়ি মিকড়ি।
এসেছে তিতলী ফিকড়ি ফিকড়ি।
পিয়ালও এসেছে, পা তুলে বসেছে।

ব্যথা তার উঠেছে চিকড়ি চিকড়ি।
ইকড়ি মিকড়ি ইকড়ি মিকড়ি।

টুনটুনির দরজায় টোকা পড়ল। টুনটুনি বলল, কে ?

মাহতাব উদ্দিন বললেন, দরজা বন্ধ করে বসে আছিস কেন রে মা ? যাবি না ?

টুনটুনি বলল, প্রোগ্রাম ক্যানসেল হয়েছে বাবা।

ক্যানসেল হলো কেন ? বান্ধবীরা আসবে না ?

না।

তারা না এলে না আসবে, আমি আর তুই আমরা দু'জনে মিলে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করব।

আমার আজ আর পানিতে নামতে ইচ্ছে করছে না।

দরজা খোল তো।

টুনটুনি দরজা খুলল। মাহতাব উদ্দিন মেয়ের বিষণ্ন মুখ দেখলেন। তাঁর মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। মা-মরা এই মেয়েটির মন খারাপ হলে তাঁর নিজের মাথা এলোমেলো লাগে।

টুনটুনি।

বলো।

চৈত্রের দুপুরে পিতা-কন্যা পানিতে ভাসছে—এর আনন্দই অন্যরকম। মন খারাপ করে বসে থাকিস না, সুইমিং কস্টিউম বের কর।

টুনটুনি বলল, ঠিক আছে বের করছি।

মাহতাব সাহেব মেয়ের খাটে বসতে বসতে বললেন, তুই শুনে খুশি হবি যে আজ এখন পর্যন্ত আমি কারো সঙ্গে রাগারাগি করিনি। খলিলুল্লাহর সঙ্গে হাসি-হাসি মুখে কথা বলেছি।

খলিলুল্লাহ কে ?

গ্রাম থেকে একজন এসেছে। নেত্রকোনা থেকে সরাসরি হেঁটে ঢাকায় চলে এসেছে।

কী জন্যে এসেছে ? চাকরির জন্যে না সাহায্য ?

কী জন্যে এসেছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। হেডমাস্টার সাহেব চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন তার না-কি বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা পরীক্ষা।

কী ক্ষমতা ?

জানি না তো মা কী ক্ষমতা। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেও বলতে পারে না। সে বলল 'ফইড়' করতে পারে। ফইড় কী জিনিস কে বলবে।

টুনটুনি বলল, বাবা আমি উনার সঙ্গে কথা বলব।

মাহতাব সাহেব বললেন, কোনো দরকার নেই। যন্ত্রণা বাড়াবি না।

টুনটুনি বলল, দরকার আছে। তুমি তাকে আমার ঘরে পাঠাও।

সে হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে।

চলে গেলে তাকে আনাবার ব্যবস্থা করো। আমি তার সঙ্গে কথা বলব। প্লিজ। তার সঙ্গে কথা বলার পর তোমাকে নিয়ে পানিতে নামব।

টুনটুনির মুখ থেকে বিষাদ ভাবটা চলে গেছে। আগ্রহ এবং উত্তেজনায় টুনটুনির চোখ চকচক করছে। মাহতাব উদ্দিনের মনে হলো—অতি নির্বোধ একজন মানুষের কল্যাণে কিছুক্ষণের জন্যেও যদি তাঁর মেয়েটার মন ভালো হয় তাতে ক্ষতি কিছু নেই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। খলিলুল্লাহ চলে গিয়ে থাকলে তাকে ফেরত আনার জন্যে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত লোক পাঠাতে হবে।

টুনটুনি বলল, আপনার নাম খলিলুল্লাহ ?

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি সুইমিংপুলের পানির দিকে। মানুষের বাড়ির ছাদেও যে দিঘি থাকতে পারে এই ধারণা সম্ভবত তার নেই। খলিলুল্লাহর চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। সে এক মুহূর্তের জন্যেও সুইমিংপুলের পানি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না।

টুনটুনি কথা বলার জন্যে খলিলুল্লাহকে ছাদে নিয়ে এসেছে। বাবার সামনে কথা বলতে সে হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে এই ভেবে মাহতাব সাহেবকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুনটুনি বসেছে সুইমিংপুলের উঁচু পাড়ে। খলিলুল্লাহ তার সামনেই দাঁড়ানো।

বাবা বলছিল আপনার না-কি কী ক্ষমতা আছে। কী ক্ষমতা ? আমাকে বলুন। আমাকে বলতে কোনো সমস্যা নেই। আমি ছোট মানুষ তো। ছোট মানুষকে যে-কোনো কিছু বলা যায়।

খলিলুল্লাহ টুনটুনির কথার উত্তরে কিছু বলল না। আগের মতোই পানির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনটুনি বলল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন। রিলাক্সড হয়ে বসুন।

খলিলুল্লাহ বসল না। টুনটুনি বলল, আমারও কিন্তু ক্ষমতা আছে। আমি কী করতে পারি জানেন ? আমি একটা পিংপং বলকে দু'টা বানাতে পারি। আবার একটা বল শূন্যে ভ্যানিস করে দিতে পারি। দেখবেন ?

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। টুনটুনি ব্যাগে করে ম্যাজিক দেখানোর জিনিস নিয়ে এসেছিল। একটা পিংপং বল দু'টা করার ম্যাজিক খুব সহজ

ম্যাজিক। তবে যারা ম্যাজিকের কৌশল জানে না তারা খুবই অবাক হয়। টুনটুনি আগ্রহ নিয়ে ম্যাজিকটা দেখাল। একটা পিংপং বল দু'টা হয়ে যাচ্ছে আবার একটা বল শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ অবাক হয়ে ম্যাজিকটা দেখল। টুনটুনি বলল, আপনি কি এরকম পারেন ?

জ্বে না।

তাহলে কী পারেন ?

কলের জিনিস ফইড় করতে পারি।

আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কলের জিনিস কী ? আর ফইড়ই-বা কী ?

একটা নষ্ট কলের জিনিস দেন, আমি ফইড় করব।

আমি তো আপনার কথাই বুঝতে পারছি না। কলের জিনিস ফইড় করা ছাড়া আর কী পারেন ?

পানির খেলা পারি।

পানির খেলাটা কী ?

পানির মইধ্যে থাকতে পারি।

পানির মধ্যে তো সবাই থাকতে পারে। আমি একবার সন্ধ্যাবেলায় সুইমিংপুলে নেমেছিলাম, রাত এগারোটায় উঠেছি। তারপর আমার অবশ্যি জ্বর এসে গিয়েছিল।

খলিলুল্লাহ নিচু গলায় বলল, পানির মইধ্যে নাইম্যা আমার খেলাটা দেখাই ? দেখাইলে বুঝবেন। না দেখাইলে বুঝবেন না।

সুইমিংপুলে নামতে চান ?

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। টুনটুনি বলল, আপনি সুইমিংপুলে নামলে বাবা খুব রাগ করবেন।

তাইলে থাউক।

টুনটুনি বলল, পানির খেলাটা কী রকম ? একরোবেটিক কিছু ?

খলিলুল্লাহ বলল, না দেখলে বুঝবেন না। দেখলে মজা পাইবেন। সবেই মজা পায়।

আপনার এই খেলা দেখলে সবাই মজা পায় ?

জ্বে পায়।

টুনটুনির খুবই ইচ্ছা করছে পানির খেলাটা দেখতে। খেলাটা সত্যি সত্যি যদি খুব মজার হয় তাহলে সেও শিখে নিতে পারবে। এই খেলা দেখিয়ে

অন্যদের অবাক করে দিতে পারবে। লোকটা যদি সাবান দিয়ে গোসল করে তারপর পানিতে নামে তাহলে কি বাবা খুব বেশি রাগ করবেন ?

এই খেলা দেখাতে আপনার কতক্ষণ লাগবে ?

আপনে যতক্ষণ বলবেন ততক্ষণ দেখাব।

আচ্ছা বেশ, দেখান আপনার খেলা। বেশিক্ষণ দেখাতে হবে না, অল্প কিছুক্ষণ দেখালেই হবে। পানিতে নামার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—গায়ে সাবান মেখে খুব ভালো করে গোসল করতে হবে। ডান দিকের হলুদ দরজাওয়ালা ঘরটায় শাওয়ার আছে, সাবান আছে। ভালো করে গোসল করে নিন। শাওয়ার কী করে ছাড়তে হয় জানেন ?

জ্বে না।

আসুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, আপনি পানিতে নামার সময় বাবা যদি হঠাৎ ছাদে এসে দেখে ফেলেন তাহলে তিনি খুবই রাগারাগি করবেন। কাজেই আপনি আপনার খেলাটা দ্রুত দেখিয়ে উঠে পড়বেন। ঠিক আছে ?

খলিলুল্লাহ ঘাড় কাত করে হাসল। এই প্রথম মনে হলো বাচ্চা মেয়েটার কথাবার্তায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

টুনটুনি ভেবেছিল পানির খেলাটা খুব জটিল কিছু হবে। বাস্তবে দেখা গেল ব্যাপারটা জটিল কিছু না। পানিতে হাত-পা ছড়িয়ে ডুবে থাকা। টুনটুনিদের সুইমিংপুলে পানি বেশি নেই। সবচে' গভীর জায়গাটা মাত্র পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। অগভীর জায়গাটা সাড়ে তিন ফুট। খলিলুল্লাহ নামের লোকটা অগভীর জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পরিষ্কার পানিতে তার চোখমুখ দেখা যাচ্ছে। টুনটুনি প্রথমে ভাবল যে সে পানির নিচে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, হাসছে—এটাই বোধহয় খেলা। খেলাটা যে এরচেয়েও অনেক বেশি জটিল এটা বুঝতে তার কিছুক্ষণ সময় লাগল। যখন সে বুঝতে পারল তখন বুকে ধাক্কার মতো লাগল। মানুষ দু'এক মিনিটের বেশি পানির নিচে থাকতে পারে না। খলিলুল্লাহ পানির নিচে অনেকক্ষণ হলো আছে। সেই অনেকক্ষণ মানে কতক্ষণ ? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট না তার চেয়েও বেশি ? এটা কী করে সম্ভব ? এটা কি ম্যাজিকের কোনো কৌশল ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সুইমিং কস্টিউম পরে মাহতাব সাহেব আসছেন। তিনি টুনটুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, খলিলুল্লাহর সঙ্গে তোর ইন্টারভ্যু কি শেষ হয়েছে ?

টুনটুনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

মাহতাব সাহেব বললেন, লোকটার ক্ষমতার কোনো নমুনা দেখেছিস। 'ফইড়' খেলা দেখিয়েছে ?

টুনটুনি কিছু বলল না।

মাহতাব সাহেব বললেন, সে গেছে কোথায় ?

টুনটুনি আঙুল দিয়ে সুইমিংপুলের পানি দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, বাবা, লোকটা খুব কম করে হলেও দশ মিনিট হলো পানিতে ডুবে আছে।

মাহতাব সাহেব ঘড়ি ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সুইমিংপুলের পাশে বসে রইলেন। এক পলকের জন্যেও খলিলুল্লাহর মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি ছ'টা সিগারেট খেয়ে ফেললেন। এক সময় হাত ইশারা করে খলিলুল্লাহকে পানি থেকে উঠতে বললেন। সে খুব স্বাভাবিকভাবে উঠে এলো।

মাহতাব সাহেব শীতল গলায় বললেন, তুমি নিচে যাও। আজ আর তোমার দেশের বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই।

খলিলুল্লাহ বলল, জ্বে আইচ্ছা।

মাহতাব উদ্দিন টুনটুনির দিকে তাকিয়ে আছেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। টুনটুনি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে বাবার কাছ থেকে শুনতে চায়। মাহতাব সাহেব সপ্তম সিগারেটটা ধরালেন। টুনটুনি বলল, তুমি অনেকগুলি সিগারেট খেয়ে ফেলেছ।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, হুঁ।

টুনটুনি বলল, সুইমিংপুলে নামবে ?

মাহতাব উদ্দিন বললেন, না।

আজ খুব গরম পড়েছে তাই না বাবা ?

হুঁ।

টুনটুনি বলল, সবচে' গরম কোন মাসে পড়ে বাবা ? চৈত্র মাসে না ভাদ্র মাসে ?

জানি না।

পিতা-কন্যা এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছুক্ষণ আগে সুইমিংপুলে কোনো ঘটনা ঘটেনি। যেন দু'জনই ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চায়। টুনটুনি বলল, আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারি হয়ে আছে। বাবা, একটা জোকস বলো।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, একটা অফিসে টেলিফোন এসেছে। অফিসের বসকে টেলিফোনে চাইছে। বসের সেক্রেটারি বলল, আপনি কে বলছেন পরিচয় দিন, স্যার যার তার সঙ্গে কথা বলেন না। টেলিফোনের ওপাশ থেকে ভারি গলা শোনা গেল, আমি অনেক উপরের লোক। তোমার বসকে দাও।

আপনি কি কোনো মন্ত্রী ?

না, আমি তারও উপরে ?

আপনি কি প্রধানমন্ত্রী ?

আরে না, আমি তারও উপরে।

বলেন কী ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন না তো ?

তারও উপরে ?

বলেন কী ? আপনি কি আল্লাহ ?

আরে না তারও উপরে।

আল্লাহর উপরে তো কেউ না।

আমি সেই কেউ না।

গল্প শুনে টুনটুনি খিলখিল করে হাসছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, তোর হাতে পিংপিং বল না ? দেখি পিংপং বলের খেলাটা আরেকবার দেখা তো।

টুনটুনি দেখাল। একটা বল দু'টা হয়ে যাচ্ছে। দু'টা বল একটা হচ্ছে।

তোর হাত তো খুব চালু হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে একেবারে প্রফেশনাল। নতুন কী জাদু শিখলি ?

টুনটুনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, বাবা আমরা দু'জনাই ভান করছি যেন এখানে কিছুই হয়নি। কোনো ঘটনা ঘটে নি। সব স্বাভাবিক। কিন্তু দু'জনই খলিলুল্লাহর ঘটনা দেখে ধাক্কার মতো খেয়েছি। এই বিষয়ে কিছু বলো।

চিন্তা করছি।

চিন্তা করে কিছু পাচ্ছ না ?

একটা জিনিস পাচ্ছি—এরকম কিছু ঘটতে পারে না। মানুষ স্থলচর প্রাণী। উভচর প্রাণী না। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে প্রচুর অক্সিজেন নিতে হয়। এই অক্সিজেন সে বাতাস থেকে নেয়। পানিতে যে সব প্রাণী বাস করে তাদেরও অক্সিজেন লাগে। তারা সেই অক্সিজেন পানি থেকে নেয়। মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই এক ঘণ্টা পানিতে বসে থাকা সম্ভব না।

খলিলুল্লাহ কীভাবে থাকল ?

সে কোনো একটা কৌশল করেছে। সে কৌশল আমরা ধরতে পারছি না। ডুবুরিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির নিচে থাকে। তারাও কৌশল ব্যবহার করে। অক্সিজেন মাস্ক পরে থাকে। খলিলুল্লাহ যে কৌশল ব্যবহার করেছে সেটা অপ্রকাশ্য কৌশল। আমরা তা বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেছি। কোনো কিছু দেখে হকচকিয়ে গেলেই যে জিনিসটা সত্যি তা কিন্তু না। আমরা যখন স্টেজে ম্যাজিক-শো দেখতে যাই তখন কী দেখি ? তখন দেখি জাদুকর জুয়েল আইচ

ইলেকট্রিক করাত দিয়ে একটা মেয়েকে কেটে দু'ভাগ করছেন। ঘটনাটা সবার চোখের উপর ঘটলেও ঘটনা সত্যি না।

তোমার ধারণা খলিলুল্লাহ যা দেখিয়েছে তা সত্যি না ?

না।

তাহলে সে এটা কীভাবে করেছে ?

জানি না কীভাবে করেছে। আমি চিন্তা করছি।

উনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ?

জুয়েল আইচকে যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি কীভাবে করাত দিয়ে কেটে একটা মেয়েকে দু'ভাগ করেন, তিনি কী উত্তর দেবেন ? উত্তর দেবেন না। খলিলুল্লাহ উত্তর দেবে না। আমি অবশ্যই খলিলুল্লাহকে প্রশ্ন করব। তবে আঁটঘাট বেঁধে প্রশ্ন করব। তখন উত্তর দেয়া ছাড়া তার অন্য উপায় থাকবে না।

আঁটঘাট কীভাবে বাঁধবে ?

জানি না কীভাবে বাঁধব। চিন্তা করছি।

টুনটুনি হঠাৎ হেসে ফেলল। মাহতাব সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, হাসছিস কেন ?

তুমি খুবই ঘাবড়ে গেছ বাবা। তোমার চোখমুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। তোমাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।

মাহতাব উদ্দিন অষ্টম সিগারেটটা ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। সেদিন বিকেলেই তিনি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি লিখলেন—

জনাব হাবীবুর রহমান

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যার মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন সে আমার বাড়িতেই আছে। তার কিছু ক্ষমতার কথা আপনি বলেছেন। কী ধরনের ক্ষমতা তা ব্যাখ্যা করেন নি। দয়া করে বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে লিখে জানাবেন, তাহলে আমার অনুসন্ধান করতে সুবিধা হবে। লোকটির পূর্ণ ইতিহাসও জানাতে চেষ্টা করবেন। ইতিহাস বলতে আমি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহারের কথা বলছি। আমি তাকে তার বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি—সে বলেছে সে কলের জিনিস 'ফইড়' করতে পারে। ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি। আপনি এ বিষয়ে যা জানেন তা আমাকে জানাবেন। খলিলুল্লাহর দেশের বাড়ি

কোথায়, তার আত্মীয়স্বজন কে আছে তাও জানাবেন। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা আছে। সময় সুযোগমতো ইনশাল্লাহ সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালো থাকবেন।

বিনীত
মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী

মাহতাব উদ্দিন চিঠি লিখলেন, টুনটুনি লিখল ডায়েরি। তার একটা ডায়েরি আছে। নীল মলাটের ডায়েরিটার নাম 'দুঃখ ডায়েরি'। তার জীবনে দুঃখ বা কষ্টের কিছু ঘটলে সে এই ডায়েরিতে তা লিখে রাখে। লাল মলাটের ডায়েরির নাম 'আনন্দ ডায়েরি'। আনন্দময় ঘটনাগুলি এই ডায়েরিতে লেখে। তিন নম্বর ডায়েরিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি থাকে। এই ডায়েরিতে সে লিখল—

আলেকজান্ডার বেলায়েভের একটি উপন্যাসের নাম 'উভচর মানুষ'। আমি যে কয়টি ভালো উপন্যাস পড়েছি এটা তার একটা। বইটা কিছুদিন আগেও আমার কাছে ছিল। এখন হারিয়ে গেছে। বইটির নায়ক 'উভচর মানুষ'। সে স্থলেও থাকতে পারে আবার পানিতেও থাকতে পারে। প্রথমবার বইটি পড়ে বইয়ের নায়কের দুঃখে খুব কেঁদেছিলাম। আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম যেন আল্লাহ আমাকে উভচর মানুষ বানিয়ে দেন। খুবই মজার ব্যাপার, আমাদের বাড়িতে এখন একজন উভচর মানুষ বাস করে। এই মানুষটার নাম খলিলুল্লাহ। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে থাকতে পারে। মানুষটা সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। তবে খুব শিগ্‌গিরই আমি জেনে ফেলব। আমি বিশটি প্রশ্ন তার জন্যে তৈরি করছি। প্রশ্নগুলো তৈরি হয়ে গেলেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করব এবং উত্তরগুলিও লিখে ফেলব। লোকটি যদি সত্যি উভচর হয় তাহলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হৈচৈ পড়ে যাবে। তবে আমার বাবার ধারণা লোকটা কোনো একটা কৌশল করে পানির নিচে থাকে। জাদুর কৌশলের মতো কোনো কৌশল। বাবার ধারণাও ঠিক হতে পারে। বাবা খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ।

হাবীবুর রহমান সাহেব চিঠির জবাব পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

জনাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী,

আসসালাম। লোক মারফত আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার কুশল জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাইতেছে না। বৃদ্ধ বয়সের নানান আধি ব্যাধিতে আক্রান্ত।

কিছুদিন যাবৎ প্রস্রাবে সমস্যা হইতেছে। প্রস্রাবের সময় খুব জ্বালাপোড়া করে। স্থানীয় ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন। তেমন ফল পাইতেছি না। তিনি ঢাকায় বড় ডাক্তার দেখাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন। ঢাকায় আমার চেনা-জানা কম। এখন আপনি একমাত্র ভরসা। আপনার মতো মানুষের সহায়তা পাইলে আমার মতো নাদানের জন্য অত্যন্ত উপকার হয়। হোটেলে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলান আমার জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। বিষয়টি আপনার গোচরে আনিলাম। এখন আপনার মর্জি।

খলিলুল্লার বিষয়ে আসি। আপনি লিখিয়াছেন—'নষ্ট কল ফইড় করিতে পারি' এই বাক্যটির অর্থ আপনি উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। 'ফইড়' নেত্রকোনার আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ 'ঠিক করা'। খলিলুল্লাহ যন্ত্রপাতি ঠিক করিতে পারে। যদিও কলকবজার বিষয়ে সে কিছুই জানে না। ট্রানজিস্টার রেডিওর সমস্যা সে ধরিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিতে পারে। আমার বাসায় একটি ১৪ ইঞ্চি টিভি দীর্ঘদিন অকেজো পড়িয়া ছিল। নেত্রকোনা শহরে রেডিও-টিভি সারাই-এর দোকানে পাঠাইয়াও ফয়দা হয় নাই। সেই টিভিও খলিলুল্লাহ ঠিক করিয়া দিয়াছে। এই কাজটি সে কীভাবে করে তা এক বিরাট রহস্য। আল্লাহপাকের জগৎ রহস্যময়। তিনি একেকজন মানুষকে একেক ক্ষমতা দিয়া পাঠাইয়াছেন। খলিলুল্লাহর যন্ত্রপাতি ঠিক করিবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আপনি নিজে পরীক্ষা করিলে খুবই মজা পাইবেন। খলিলুল্লাহ বিষয়ে এরচে' বেশি কিছু আমি জানি না। অবশ্য সেইভাবে খোঁজ-খবরও নেই নাই। যদি বলেন অনুসন্ধান করিব। অনুসন্ধানে ফল হইবে কিনা জানি না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের পুকুরে দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবিয়া থাকিবার খেলা দেখাইয়াও সে অনেকের প্রশংসা কুড়াইয়াছে।

পত্র এইখানে শেষ করিতেছি। আপনি আমার জন্যে দোয়া করিবেন। দয়াময়ের নিকট আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

আরজগুজার
হাবীবুর রহমান বিএ বিটি
অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার
নীলগঞ্জ হাইস্কুল

পুনশ্চ : আমার বড় বৌমা মুসাম্মাদ দিলশাদ খানম খলিলুল্লাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানে। সে তার শাশুড়ি আম্মাকে বলিয়াছে যে খলিলুল্লাহ সম্পর্কে সে খুব আশ্চর্যজনক কিছু কথা জানে। সে সব কথা প্রকাশ করা সমীচীন নহে।

বড় বৌমা সন্তান-সম্ভবা। এখন বাপের বাড়িতে আছে। আপনি আগ্রহী হইলে বড় বৌমার নিকট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইতে পারি।

টুনটুনি দশটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর জোগাড় করেছে। কিছু কিছু উত্তরের সঙ্গে তার মন্তব্যও আছে। টুনটুনির প্রশ্নোত্তর পর্ব এই রকম—

১ম প্রশ্ন : আপনার নাম কী ?

উত্তর : আমার নাম খলিলুল্লাহ। লোকে আমারে ডাকে খলিল। কেউ কেউ ডাকে খইল্যা।

মন্তব্য : এই প্রশ্নটি করা ঠিক হয় নি। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। শুধু জানি না যে, তাকে কেউ কেউ খইল্যা ডাকে। খইল্যা নিশ্চয়ই অপমানসূচক ডাক।

২য় প্রশ্ন : আপনার দেশের বাড়ি অর্থাৎ গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

উত্তর : জানি না তো মা। আমি ছোট থাইক্যা ভাইস্যা বেড়াইন্যার দলে।

মন্তব্য : লোকটার কথা থেকে মনে হচ্ছে কিছু লোকজন আছে যারা ভেসে বেড়ায়। যাযাবররা ভেসে বেড়ায়। তারা কোথাও বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। বেদেরাও ভেসে বেড়ায়। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে যাযাবর হতে ইচ্ছা করে।

৩য় প্রশ্ন : আপনি কি লেখাপড়া জানেন ?

উত্তর : না।

৪র্থ প্রশ্ন : স্বরে অ, স্বরে আ, ক, খ, জানেন না ?

উত্তর : না।

মন্তব্য : আমি ঠিক করেছি তাকে লেখাপড়া শেখাব। আমার ধারণা তিনি খুব অল্প সময়ে লেখাপড়া শিখতে পারবেন।

৫ম প্রশ্ন : আপনি পানির নিচে কতক্ষণ থাকতে পারেন ? আপনার সর্বোচ্চ রেকর্ড কী ?

উত্তর : পানির ভিতরে ঢুকলে সময়ের হিসাব থাকে না। যতদিন থাকতে বলেন থাকতে পারব।

মন্তব্য : লোকটা বলে কী ! সে কি আসলেই উভচর *মানব ! আমার খুবই অবাক লাগছে।*

৬ষ্ঠ প্রশ্ন : বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। তার অক্সিজেন প্রয়োজন। আপনি অক্সিজেন কোথায় পান ?

উত্তর : অক্সিজেন জিনিসটা কী আমি জানি না তো আম্মা।

৭ম প্রশ্ন : পানিতে আপনি নিশ্বাস নেন না ?

উত্তর : জ্বে না। নিশ্বাস বাতাসে নিতে হয়। পানির মধ্যে নিতে হয় না। নাক দিয়া ঢুকলে মাথাত যন্ত্রণা হয়।

৮ম প্রশ্ন : আপনি যে পানিতে থাকতে পারেন এটা কখন বুঝতে পারলেন ?

উত্তর : খুবই ছোট সময়ে। পুসকুনিত হাত ধুইতে গিয়া পানিতে পইড়া গেছিলাম। তারপর দেখি খুবই মজা। সারা দিঘি ঘুইরা বেড়াইছি। এই দিকে সবেই ভাবছে আমার মৃত্যু হয়েছে। পানিত জাল ফালাইছে। হিঃ হিঃ হিঃ।

৯ম প্রশ্ন : আপনি যে দীর্ঘ সময় পানিতে থাকতে পারেন এটা নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায় নি ? পত্রিকায় লেখালেখি হয় নি ?

উত্তর : ইস্কুলের পিছনের পুসকুনিতে দুইবার খেলা দেখাইছি। ম্যালা লোকজন হইছিল। চেয়ারম্যান সাব আমার লেখা দেইখ্যা খুশি হইয়া আমারে রুপার মেডেল দিছিল। মেডেল হারাইয়া ফেলছি।

১০ম প্রশ্ন : এটাকে খেলা বলছেন কেন ?

উত্তর : আম্মা গো, এইটা তো খেলাই। ডুব দিয়া কে কতক্ষণ পানির নিচে থাকতে পারে—এই খেলা সব সময় খেলা হয়। অন্যরা কম পারে, আমি বেশি পারি।

টুনটুনি ঠিক করেছে খলিলুল্লাকে নিয়ে সে স্ক্র্যাপ বুকের মতো বানাবে। খলিলুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকবে। তার ছবি থাকবে। প্রশ্নোত্তর থাকবে। তার ওজন, উচ্চতা, চোখের মণির রঙ, সবই থাকবে। খলিলুল্লাহকে সে কী ডাকবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছে। আগে ঠিক করেছিল সে খলিল ভাই ডাকবে। কিন্তু খলিলুল্লাহ তাকে আম্মাজি ডাকছে। মা নিশ্চয়ই ছেলেকে ভাই ডাকতে পারে না।

মাহতাব উদ্দিন সাহেবের দু'টা অফিস। একটা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায়, অন্যটা বাদামতলীতে। তিনি সম্প্রতি ইটের ভাটা বসিয়েছেন। ইট বানানোর এই ব্যবসা খুবই লাভজনক বলে কাছাকাছি নতুন অফিস নিয়েছেন। অফিস বুড়িগঙ্গার পাশে। অফিস ঘরটা দোতলা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারদিকে প্রচুর লোকজন, ভিড়, হৈচৈ এর মধ্যে মাহতাব উদ্দিনের অফিস ঘরটা নির্জন।

মাহতাব সাহেব সময় পেলেই এই অফিসে বিশ্রাম নিতে আসেন।

তিনি যে ঘরে বসেন সেখান থেকে বুড়িগঙ্গা দেখা যায়। পুরনো দিনের ভারি একটা ইজিচেয়ার জানালার কাছাকাছি রাখা আছে। তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা চলাচল দেখেন।

আজও তিনি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অবশ্যি বুড়িগঙ্গার দিকে না। খলিলুল্লাহর দিকে। খলিলুল্লাহকে একটা কাজ দেয়া হয়েছে। নষ্ট টিভি ঠিক করেতে দেয়া হয়েছে। মাহতাব উদ্দিন তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণচোখে।

খলিলুল্লাহর হাতে যন্ত্রপাতি বলতে একটা বড় স্ক্রু ড্রাইভার। টিভিটা রাখা হয়েছে টেবিলে। সে কাজ করছে দাঁড়িয়ে। অতি দ্রুত সে টিভির যন্ত্রপাতি খুলে ফেলছে। টেবিল ভর্তি হয়েছে নানান ধরনের স্ক্রুতে। একেক ধরনের স্ক্রু একেক জায়গায় রাখা উচিত। তা সে করছে না। সব এক জায়গায় রেখেছে। কোন স্ক্রু কোথায় বসবে এটা সে মনে রাখবে কী করে কে জানে। এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। এটা তার ব্যাপার।

মাহতাব সাহেব বললেন, খলিলুল্লাহ, টিভি কীভাবে কাজ করে তুমি জানো?

খলিলুল্লাহ বলল, জ্বে না।

একটা যন্ত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না, যন্ত্রটা ঠিক করবে কীভাবে?

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না।

টিভিটা ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?

খলিলুল্লাহ বলল, ঠিক হয়ে গেছে।

মাহতাব সাহেব বললেন, ঠিক হয়ে গেছে ?

খলিলুল্লাহ বলল, জ্বে হয়েছে।

এখন কানেকশান দিলে টিভি চলবে ?

জ্বে চলবে।

মাহতাব সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, যদি না চলে আমি কানে ধরে তোমাকে একশ' বার ওঠবস করাব।

খলিলুল্লাহ অবাক হয়ে বলল, আমারে কানে ধইরা উঠবস কেন করাইবেন ?

আমার সময় নষ্ট করেছ এই জন্যে। আমার সময়ের দাম আছে। যাই হোক টিভির স্ক্রুগুলো লাগাও। এখানে ডিশের লাইন আছে কানেকশান দাও। তারপর কানে ধরে ওঠবস করার জন্যে তৈরি হয়ে যাও।

জ্বে আইচ্ছা।

আমি পুরস্কার যেমন দিতে পারি, শাস্তিও দিতে পারি। যদি দেখি সত্যি সত্যি টিভি ঠিক হয়েছে তাহলে তোমার জন্যে পুরস্কার আছে।

স্যার, আমার পুরস্কার লাগবে না।

না চাইলেও পুরস্কার দেয়া হবে। শাস্তির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। শাস্তি না চাইলেও পাবে।

টিভির স্ক্রু লাগানো হয়েছে। খলিলুল্লাহ বলল, কাউরে যন্ত্রটা চালু করতে বলেন।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, কাউকে চালু করতে বলতে হবে কেন ? তুমি চালু কর। It is your duty.

খলিলুল্লাহ বলল, আমি যন্ত্র চালাইতে পারি না। ফইড় করতে পারি।

মাহতাব উদ্দিনকে কফির মগ এনে দেয়া হয়েছে। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে তিনি টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বাড়ির কেয়ারটেকার বারেক কানেকশান দিচ্ছে। একটু দূরে মেঝেতে গম্ভীর মুখে বসে আছে খলিলুল্লাহ। তার দৃষ্টি টিভি স্ক্রিনের দিকে না। তার দৃষ্টি তার নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। সে এখনো তার দু'আঙুল নাচাচ্ছে।

টিভি-পর্দায় সুন্দর ছবি আসছে। শব্দ আসছে। বারেক কৌতূহলী হয়ে টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। মাহতাব উদ্দিন তাকিয়ে আছেন খলিলুল্লাহর দিকে। যে নষ্ট টিভিটা ঠিক করেছে তার তো অন্তত একবারের জন্যে হলেও টিভি সেটের দিকে তাকানোর কথা। সে তাকাচ্ছে না। সে মুগ্ধ হয়ে নিজের বুড়ো আঙুলই দেখছে। মাহতাব উদ্দিন বারেকের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায়

বললেন, বারেক, তুমি খলিলুল্লাহকে বাসায় নিয়ে যাও। দারোয়ানকে বলে দাও। সে যেন বাসা থেকে বের হতে না পারে। তাকে ঘরে আটকে রাখো।

বারেক হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

মাহতাব সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এই টিভি সেটটা কোনো মেকানিকের কাছে নিয়ে যাও। তাকে বলো এখান থেকে কোন আইসি খুলে রাখতে যেন টিভি সেটটা অচল হয়ে যায়। আইসি খুলে রাখার পর সেটটা বাসায় নিয়ে যাবে।

ঠিক আছে স্যার।

কী বলেছি বুঝতে পারছ?

পারছি।

কী বললাম, রিপিট করো।

বারেক বলল, খলিলুল্লাহকে বাসায় নিয়ে যাব। দারোয়ানকে বলব সে যেন বাসা থেকে বের না হতে পারে। টিভি সেটটা মেকানিকের কাছে নিয়ে যাব। মেকানিককে বলব একটা আইসি খুলে রাখতে। নষ্ট টিভিটাও বাসায় নিয়ে যাব।

ঠিক আছে। খলিলুল্লাহকে আমার কাছে পাঠাও।

খলিলুল্লাহ সামনে এসে দাঁড়াল। মাহতাব সাহেব বললেন, তোমাকে পুরস্কার দেব বলেছিলাম। পুরস্কার দিচ্ছি। বারেক তোমাকে দোকানে নিয়ে যাবে। সার্ট, প্যান্ট, স্যান্ডেল কিনে দেবে। নাপিতের দোকানে গিয়ে ভালোমতো চুলদাড়ি কাটবে। এই হলো পুরস্কার। বিড়ি সিগারেট খাও?

জ্বে না।

মাহতাব সাহেব মানিব্যাগ খুলে পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করতে করতে বললেন, টাকাটা রাখো। তোমার হাতখরচ। যে ক'দিন তুমি আমার এখানে থাকবে পাঁচশ টাকা করে প্রতিদিন পাবে। মাটি কেটে দিনে কত করে পেতে?

আশি টাকা রোজ।

আশি টাকা রোজের জায়গায় তুমি পাচ্ছ পাঁচশ টাকা রোজ। এটা ভালো না?

জ্বে।

সাভারে আমার একটা বাগানবাড়ি আছে। সেখানে বড় পুকুর আছে। তোমাকে পুকুরে নামাব। দেখতে চাই তুমি কতক্ষণ পুকুরে ডুবে থাকতে পারো।

জ্বে আইচ্ছা।

চা বিসকিট কিছু খাবে ?

জ্বে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।

খলিলুল্লাহ চলে গিয়েছে। মাহতাব সাহেব একা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। অফিসের প্রচুর কাজ জমে আছে। কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। মাথার ভেতর খলিলুল্লাহর ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্সের কিছুই জানে না একটা লোক ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি ঠিক করে ফেলবে এটা হতে পারে না। অক্সিজেন মাস্‌ক ছাড়া একটা মানুষ পানির নিচে শুয়ে থাকবে এটা হতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে সেভাবে বানায় নি। খলিলুল্লাহ মানুষ না, অন্যকিছু। সেই অন্যকিছুটা কী ? মানুষ তার সমাজে মানুষের রূপে অন্যকিছু পছন্দ করে না। এমনকি পাগলদেরকেও তারা চিকিৎসার নাম করে আলাদা সরিয়ে রাখে। খলিলুল্লাহ যদি সে-রকম অন্যকিছু হয় তাকেও আলাদা সরিয়ে রাখতে হবে। মানুষের সমাজে তাকে থাকতে দেয়াটা বিরাট বোকামি হবে। এত বড় বোকামি আর যেই করুক তিনি করতে পারেন না। খলিলুল্লাহর ব্যাপারটা কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। এমন কেউ যে সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। বেশিরভাগ মানুষ শুরুতেই সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন আর সমস্যা হাতের মুঠোয় থাকে না। হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যায়।

মাহতাব সাহেব মোবাইল টেলিফোন হাতে নিলেন। জালালের সঙ্গে কথা বলবেন। তার টেলিফোন নাম্বার মনে নেই, তবে জোগাড় করা সমস্যা হবে না। জালাল খাঁ তাঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু। বই পড়া তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তার সকাল শুরু হয় হাতে একটা বই নিয়ে। রাতে যখন ঘুমুতে যায় তখনো হাতে বই থাকে। চাকরি বাকরি নিলে পড়াশোনার সময় কমে যাবে এই যুক্তিতে সে চাকরিই নিল না। অবশ্যি যে পরিমাণ টাকাপয়সা তার বাবা মা তার জন্যে রেখে গেছে তাতে জালাল খাঁর পরের তিন পুরুষেরও কিছু করতে হবে না। এখানেও শুভংকরের ফাঁকি, জালাল বিয়েই করে নি।

তার টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেল। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর তাকে ধরা গেল। মাহতাব বললেন, জালাল, কেমন আছিস ?

জালাল শুকনো গলায় বললেন, ভাল।

মাহতাব সাহেব বললেন, কী করছিস ?

পড়ছি। আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি কে ?

আগে বল কী পড়ছিস, তারপর বলব আমি কে ?

ফাইবার অপটিক্সের উপর একটা পপুলার বই।

বইটা কেমন লিখেছে?

মোটামুটি। তথ্য কম, বর্ণনা বেশি। লেখক খুব সহজ ভাষায় জটিল জিনিস বলতে গিয়ে লেজে-গোবরে করে ফেলেছেন। বেশি সহজ হয়ে গেছে। নিউজ পেপারের সায়েন্স আর্টিকেল হয়ে গেছে।

খটমট কিছু না হলে তোর ভালো লাগে না?

তা-না। আমি আপনাকে এখনো চিনতে পারছি না। দয়া করে নামটা বলুন।

মাহতাব।

জালাল খাঁ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ও আচ্ছা, তুই? টুনটুনি কেমন আছে? ও আমাকে একটা জটিল প্রশ্ন করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম বই দেখে প্রশ্নের উত্তর দেব। বাসায় এসে প্রশ্নটা ভুলে গেছি। টুনটুনিকে একটু জিজ্ঞেস করতো প্রশ্নটা কী?

তাকে জিজ্ঞেস করতে পারব না, সে আশেপাশে নেই। আমি অফিস থেকে টেলিফোন করছি। তুই কি আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসতে পারবি?

কেন?

অদ্ভুত এক হিউম্যান স্পেসিমেন দেখবি।

সব হিউম্যান স্পেসিমেনই তো অদ্ভুত।

এ একটু বেশি অদ্ভুত। সে নষ্ট কলকবজা ফইড় করতে পারে।

মানে কী?

যে-কোনো ইলেকট্রনিক্সের জিনিস ঠিক করতে পারে।

সে তাহলে ভালো একজন ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার। এতে অদ্ভুতের কী আছে!

তার কোনো ডিগ্রি নেই।

এটাও কোনো ব্যাপার না। নিজে নিজে পড়াশোনা করে মানুষ অনেকদূর উঠতে পারে।

সে পড়াশোনাও জানে না।

অনেক ভালো মিস্ত্রি আছে পড়াশোনা জানে না।

জালাল শোন, আমি যার কথা বলছি সে মাটিকাটা শ্রমিক। তার হাতে যে-কোনো জটিল যন্ত্র দিলে সে কীভাবে কীভাবে সেটা ঠিক করে ফেলে। শোনা কথা না। আমার নিজের দেখা। তার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। সে কোনো

ওস্তাদের সঙ্গে কখনো এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করে নি। তার সঙ্গে কোনো এমিটার, ভোল্টামিটার নেই। সে কাজ করে তার দু'টা হাত দিয়ে।

তা কী করে হবে ?

আমিও বলছি—তা কী করে হবে। কিন্তু হচ্ছে। সমস্যাটা এইখানেই। তোর সামনে আমি পরীক্ষাটা করতে চাই। তোর সামনে আমি একটা নষ্ট টিভি সারাতে দেব।

নষ্ট টিভি সারানোর দরকার কী ? আমি এক কাজ করি, বেশকিছু আইসি নিয়ে আসি, তার মধ্যে একটা আইসির লজিক গেট থাকবে নষ্ট। সে আইসিগুলি হাতে নিয়ে বলুক কোনটা নষ্ট।

তুই যেটা ভালো বুঝিস। আমি ঠিক সন্ধাবেলা তোকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠাব।

গাড়ি পাঠাতে হবে না।

অবশ্যই পাঠাতে হবে। গাড়ি না পাঠালে তুই ভুলে যাবি।

মাহতাব সাহেব ইজিচেয়ার ছেড়ে টেবিলের কাছে চলে এলেন। হাবীবুর রহমানকে আরেকটা চিঠি পাঠাতে হবে। আজ দিনে দিনে লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে দিতে হবে। যে চিঠি নিয়ে যাবে সে-ই উত্তর নিয়ে আসবে। দেরি করা যাবে না। মাহতাব সাহেব নিজের ভেতর চাপা অস্থিরতা অনুভব করছেন। মনে হচ্ছে প্রেসার বেড়েছে। ডাক্তার ডেকে প্রেসার মাপানো দরকার। তিনি বেল টিপে ডাক্তারকে খবর দিতে বললেন। ডাক্তার আসতে আসতে দ্রুত চিঠি লিখে ফেললেন।

জনাব হাবীবুর রহমান সাহেব,

আপনি লিখেছেন আপনার বড় বৌমা খলিলুল্লাহ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে। আমি নিজে আপনার বড় বৌমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

আপনি চিকিৎসার জন্যে যে-কোনো সময় ঢাকা আসতে পারেন। বাকি ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বিনীত

মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী

যা ভেবেছিলেন তাই। প্রেসার বেড়েছে ১৩০/১০০। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছেন ?

মাহতাব সাহেব বললেন, না।

রিলাক্সেন ট্যাবলেট খেয়ে রেস্ট নিন।

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, আমি রেস্টেই আছি।

টুনটুনি মুগ্ধ গলায় বলল, খলিল ভাই, আমি তো আপনাকে চিনতেই পারি নি। খলিলুল্লাহ টুনটুনিকে আম্মাজি ডাকলেও টুনটুনি ঠিক করেছে তাকে সে খলিল ভাই ডাকবে।

খলিলুল্লাহ লজ্জিত গলায় বলল, নাপিতের কাছে গেছিলাম। চুল কাটছি। শেভ হইছি।

যে সবুজ সার্টটা পরেছেন সেই সার্টেও আপনাকে দারুণ মানিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আপনার বয়সও অনেক কমে গেছে। এখন আপনাকে দেখে কেউ বলবে না যে আপনি একজন মাটি-কাটক। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন।

খলিলুল্লাহ মাথা নিচু করে হাসল। টুনটুনি বলল, আপনাকে এখন আর খলিলুল্লাহ নামে মানাচ্ছে না। আপনার জন্যে নতুন একটা নাম বের করতে হবে।

কী নাম ?

চিন্তা করছি, সুন্দর কোনো নাম মাথায় আসলেই সেই নাম আপনাকে দিয়ে দেব। ঠিক আছে ?

ঠিক আছে আম্মাজি।

দু'টা নাম এই মুহূর্তে মাথায় এসেছে। দু'টা নামের শুরুই 'অ' দিয়ে। একটা হলো অরণ্য, আরেকটা অমিয়। এর মধ্যে আপনার কোন্‌টা পছন্দ ?

আম্মাজি, আপনার যেটা পছন্দ আমার সেইটাই পছন্দ।

আমার পছন্দ অরণ্য। এখন থেকে আপনার নাম খলিলুল্লাহ না, এখন থেকে আপনার নাম অরণ্য।

জ্বি আইচ্ছা।

অরণ্য নামের মানে জানেন ?

জ্বে না।

অরণ্য নামের অর্থ হলো—বন, জঙ্গল, Forest। আর অমিয় নামের অর্থ হলো সুধা। বরিষে অমিয় ধারা। সুধা বর্ষণ হচ্ছে। কী বলছি কিছু বুঝতে পারছেন ?

জ্বে না।

অরণ্য ভাইয়া শুনুন, নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভঙ্গিও বদলাতে হবে। যার নাম অরণ্য, সে নিশ্চয়ই গ্রাম্য ভাষায় কথা বলবে না। এখন থেকে শুদ্ধ শহুরে ভাষায় কথা বলবেন।

জ্বে আইচ্ছা।

জ্বে আইচ্ছা না। বলুন জ্বি আচ্ছা। আইচ্ছা থেকে 'ই'বাদ দিন।

খলিলুল্লাহ বলল, জ্বি আচ্ছা।

টুনটুনি বলল, ছাদে চলুন। আমি স্ক্র্যাপ বুক বানাচ্ছি, সেখানে ছবি থাকবে। আপনার বায়োডাটা থাকবে। আপনার ছবি তুলতে হবে।

জ্বি আচ্ছা।

টুনটুনি গম্ভীর গলায় বলল, আপনার নাম কী ?

খলিলুল্লাহ শুদ্ধ বাংলায় বলল, আমার নাম অরণ্য।

ছবি তোলার পর কী হবে জানেন ?

না।

লেখাপড়া সেশন। আপনাকে অক্ষর শেখাব। ঠিক আছে ?

হুঁ।

দু'টা বা তিনটা অক্ষর মিলে মিশে যখন শব্দ হবে তখন খুব মজা পাবেন। উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। একটা অক্ষর হলো ক, একটা ল। এই দুটা অক্ষর মিলে মিশে হয় কল।

খলিলুল্লাহ বলল, কলা কীভাবে হয় ?

টুনটুনি অবাক হয়ে বলল, বাহ আপনার তো ভালো বুদ্ধি ! আকার বলে আমাদের বাংলা ভাষায় একটা জিনিস আছে। যে-কোন অক্ষরের সঙ্গে আকার যুক্ত হলে আ এসে লাগে। ল'র সঙ্গে আকার যুক্ত হলে হয় লা। বলুন দেখি 'ক' এর সঙ্গে আকার যুক্ত হলে কী হয় ?

কা।

এই তো পেরেছেন। এখন বলুন কলা কীভাবে হবে ?

ক, আর সঙ্গে ল, ল-এর সঙ্গে আকার।

আপনি খুব দ্রুত লেখাপড়া শিখতে পারবেন। এখন চলুন ফটোসেশনে।

ফটোসেশন কী ?

ফটোসেশন হলো ছবি তোলার কর্মকাণ্ড। আমার হাতে যে ক্যামেরাটা দেখছেন এই ক্যামেরাটা সাধারণ ক্যামেরা না। এর নাম ডিজিটাল ক্যামেরা। আমার একটা ম্যাকিনটস কম্পিউটার আছে। ডিজিটাল ক্যামেরায় আপনার ছবি

তুলে কম্পিউটারের মেমোরিতে দিয়ে দেব। দেখতে আপনার খুব মজা লাগবে। আপনি যে সবুজ সার্ট পরে আছেন ইচ্ছা করলেই আমি ছবিতে সবুজ সার্টের রঙ বদলে দিতে পারব। আপনার চোখের কালো মণিগুলি নীল করে ফেলতে পারব।

চোখের মণি নীল করলে কী হয়?

আমার কাছে খুব ভালো লাগে। মনে হয় খানিকটা সমুদ্র চোখে চলে এসেছে। আমার মা'র চোখের মণির রঙ ছিল হালকা নীল।

খলিলুল্লাহ ছবি তোলার জন্যে সুইমিং পুলের পাশে চেয়ারে বসেছে। টুনটুনি চোখের সামনে ক্যামেরা ধরেছে। অটো ফোকাস ক্যামেরা। ক্যামেরা নিজেই ফোকাল লেংথ ঠিক করে জানান দেবে—সব ঠিক আছে, সাটারে চাপ দাও। ক্যামেরায় সবুজ বাতি জ্বলছে। টুনটুনি সাটারে টিপ না দিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল—আশ্চর্য তো আপনার চোখের মণি হালকা নীল। আমি আগে কেন লক্ষ করি নি? আমার ধারণা ছিল আপনার চোখের মণি কালো। এখন দেখছি নীল।

খলিলুল্লাহ হাসছে। টুনটুনি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় খলিলুল্লাহর দশটা ছবি তুলল।

জালাল খাঁকে আনতে গাড়ি গিয়েছিল সন্ধ্যায়। তিনি এসেছেন রাত ন'টায়। পিটার নিকলস-এর একটা বই পড়ছিলেন—Holocaust and Catastrophe. বই হাত থেকে নামাতে পারছিলেন না বলে এত দেরি। বই-এর শেষ দু'টা পাতা গাড়িতে বসে পড়েছেন।

জালাল খাঁর বয়স পঞ্চাশ। এই বয়সে মানুষের মাথায় কাঁচাপাকা চুল থাকে। জালাল খাঁর মাথার সব চুল পাকা। টকটকে গৌরবর্ণের একজন মানুষ যার মাথা ভর্তি শরতের মেঘের মতো ধবধবে সাদা চুল। পৃথিবীতে সবচে' বেশি সংখ্যক বই পড়েছেন এই সূত্রে মানুষটার নাম গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এ যেতে পারত। কিন্তু গিনেস বুকওয়ালাদের এ ধরনের কোনো ক্যাটাগরি নেই।

মাহতাব সাহেব বললেন, তুই কি আইসি এনেছিস?

জালাল খাঁ বললেন, কীসের আইসি?

মাহতাব সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কীসের আইসি মানে? তোকে না বললাম, একজন মানুষকে টেস্ট করা হবে।

জালাল খাঁ বললেন, তোকে তো খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এত উত্তেজিত কেন? এত উত্তেজিত হবার মতো কিছু পৃথিবীতে ঘটে না। এটম বোমা পড়ার ঘটনা এই পৃথিবীতে মাত্র দু'বার ঘটেছে।

তোকে আনাই হয়েছে লোকটাকে পরীক্ষা করার জন্যে।

পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আছে। আমার একটা ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার আছে। নষ্ট হয়ে গেছে। ভয়েস রেকর্ড হয় না। সেটা এনেছি। তোর মিস্ত্রিকে সেটা ঠিক করতে দেয়া হবে। তুই শান্ত হ। ডাক তাকে। তার আগে ব্রিফিং দে—লোকটার ব্যাপারটা কী ? সে কি ভিলেজ ইডিয়ট ?

ভিলেজ ইডিয়ট মানে ?

সব গ্রামে একজন থাকে মহানির্বোধ। তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। সে যখন হঠাৎ কিছু বুদ্ধির পরিচয় দেয় তখন হৈচৈ পড়ে যায়। সে-রকম না তো ?

না, সে-রকম না। লোকটা নির্বোধ না। পড়াশোনা কিছুই জানে না। তার জীবিকা হলো মাটি কাটা।

জালাল খাঁ বললেন, তোর কথা বুঝতে পারছি না—লোকটার যদি যন্ত্রপাতি ঠিক করার জাদুকরি ক্ষমতা থাকে তাহলে সে মাটি কাটবে কেন ? সে একটা ওয়ার্কশপ দিয়ে দু'হাতে টাকা কামাবে। এটা সে কেন করছে না ?

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তুই ডেকে জিজ্ঞেস কর কেন করছে না। আমি রহস্যভেদ করতে পারছি না বলেই তোকে ডেকেছি।

জালাল খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, জানি না তোর কী হয়েছে। তুই খুবই উত্তেজিত। উত্তেজনায় তোর কথাবার্তাও জড়িয়ে যাচ্ছে। ডাক তোর মিস্ত্রিকে। কথা বলি।

মাহতাব সাহেব বন্ধুকে নিয়ে লাইব্রেরি ঘরে বসলেন। বারেককে পাঠালেন খলিলুল্লাহকে আনতে। বিশেষ করে বলে দিলেন খলিলুল্লাহর সঙ্গে টুনটুনি যেন না আসে। টুনটুনি সারাক্ষণ খলিলুল্লাহর সঙ্গে লেগে আছে—এটা মাহতাব সাহেবের ভালো লাগছে না। লাইব্রেরি ঘরে খলিলুল্লাহর বসার জন্যে একটা টুল রাখা হলো। টুলের সামনে দু'টা সোফা। একটিতে মাহতাব সাহেব, অন্যটিতে জালাল খাঁ। রীতিমতো ভাইবা পরীক্ষা।

খলিলুল্লাহকে দেখে মাহতাব উদ্দিন চমকে উঠলেন। এ কে ? এ তো খলিলুল্লাহ না। এ অন্য কেউ। কী সুন্দর চেহারা ! মুখের চামড়ায় রোদে পোড়া ভাব নেই। মেয়েদের চামড়ার মতো কমনীয় চামড়া। চোখের মণির রঙ নীলাভ। এটা অবশ্যি সবুজ রঙের সার্ট পরার কারণে হতে পারে। সার্টের সবুজ রঙ পড়েছে চোখের মণিতে। আগে লোকটা কুঁজো হয়ে দাঁড়াত, এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাচ্ছে না। বরং কৌতূহলী চোখে জালাল খাঁকে দেখছে।

জালাল খাঁ বিস্মিত হয়ে চাপা গলায় মাহতাব সাহেবকে বললেন, এই কি তোর সেই খলিলুল্লাহ ?

মাহতাব সাহেব বললেন, হুঁ।

মাটি কাটা যার জীবিকা ?

হুঁ।

দেখে তো সে-রকম মনে হচ্ছে না।

মাহতাব সাহেব কিছু না বলে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করলেন তাঁর হাত কাঁপছে। টেনশনের লক্ষণ। তাঁর ভেতর চাপা টেনশন কাজ করছে। প্রেসার কি আবারো বেড়েছে ?

জালাল খাঁ খলিলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কী ?

আমার নাম অরণ্য।

জালাল খাঁ তাকালেন মাহতাব সাহেবের দিকে। মাহতাব সাহেব নিজের মনে সিগারেট টানছেন। খলিলুল্লাহর কথায় তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

তোমার নাম অরণ্য ?

জ্বি।

তুমি লেখাপড়া জানো ?

জানতাম না। এখন শিখছি।

কে শেখাচ্ছে ?

আম্মাজি শিখাচ্ছেন।

আম্মাজিটা কে ?

আম্মাজির নাম টুনটুনি।

ও আচ্ছা, আমাদের টুনটুনি হলো শিক্ষিকা ? খুব ভালো। কতদিনে লেখাপড়া শিখে ফেলতে পারবে বলে তোমার ধারণা।

বেশিদিন লাগবে না।

শুনেছি তুমি গ্রামে থাকতে। মাটি কাটার কাজ করতে। এটা কি সত্যি ?

জ্বি সত্যি।

গ্রামের একজন মাটি কাটা শ্রমিক গ্রাম্য ভাষায় কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছ।

আম্মাজি আমাকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বলেছেন।

তোমার আম্মাজি তোমাকে যা বলে তাই করো ?

খলিলুল্লাহ কিংবা অরণ্য এই প্রশ্নের জবাব দিল না। সে জালাল খাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। এই হাসিতে কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই।

জালাল খাঁ বললেন, শুনেছি তুমি ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে সারতে পারো।

ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি কী আমি জানি না। রেডিও-টিভি সারতে পারি।

আমার সঙ্গে একটা ডিভিআর আছে। ডিভিআর হলো ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার। জিনিসটা দেখতে কলমের মতো। পকেটে রেখে দিলে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত মানুষজনের কথাবার্তা রেকর্ড হয়। যন্ত্রটা কাজ করছে না। তুমি এটা ঠিক করতে পারবে?

খলিলুল্লাহ হাত বাড়িয়ে বলল, যন্ত্রটা দেন।

জালাল খাঁ ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারটা দিলেন। বারেক কফি নিয়ে এসেছে। জালাল খাঁ কফির মগ হাতে নিয়ে খলিলুল্লাহর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে কৌতুক ঝিকমিক করছে। তিনি যে ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার দিয়েছেন সেটা ঠিক আছে। বারো ভোল্টের নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারিটা রেকর্ডারে ফিট করা নেই। তিনি পকেটে করে নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি এনেছেন তবে সেই ব্যাটারি ক্যামেরার ব্যাটারি। ছয় ভোল্টের ব্যাটারি।

খলিলুল্লাহ কলমের মতো ছোট্ট জিনিসটা একবার ডান হাতে নিল। আরেকবার বাম হাতে নিল। সে যন্ত্রটার দিকে তাকাচ্ছে না। তবে তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। যেন সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে জটিল কোনো জিনিস বোঝার চেষ্টা করছে।

জালাল খাঁ বললেন, তোমার কাছে ছোট স্ক্রু ড্রাইভার আছে? স্ক্রু ড্রাইভার থাকলে যন্ত্রটা খুলে দেখ—কোন জিনিস নষ্ট না খুলে বুঝবে কী করে?

খলিলুল্লাহ ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, যন্ত্রটা ঠিক আছে।

যন্ত্র ঠিক আছে তাহলে চলে না কেন?

খলিলুল্লাহ ব্যাটারি চেম্বার খুলে বলল, এই জায়গায় একটা জিনিস লাগবে।

ব্যাটারির কথা বলছ? এটা হলো ব্যাটারি চেম্বার। আমার কাছে একটা ব্যাটারি আছে। দেখ তো এটা দিয়ে হবে কি না।

খলিলুল্লাহ ব্যাটারি হাতে নিয়েই বলল, এটা দিয়ে হবে না। আচ্ছা দেখি, যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করি।

কী ব্যবস্থা করবে?

খলিলুল্লাহ হাসছে। ভালো কোনো ম্যাজিক দেখানোর আগে ম্যাজিসিয়ানরা যে ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি।

জালাল খাঁ লক্ষ করলেন খলিলুল্লাহ হাতের নখ দিয়ে ডিভিআর এর অতি ক্ষুদ্র স্ক্রু খুলে ফেলছে। খোলা স্ক্রুগুলো কোথাও রাখছে না, হাতের তালুর ভাঁজেই আছে। কাজটা সে এত দ্রুততার সঙ্গে করছে যে মনে হচ্ছে হাতের নখ দিয়ে স্ক্রু খোলা হলো লোকটার পেশা। গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে সে এই কাজই করছে।

কোন স্ক্রু কোথায় লাগবে তোমার মনে আছে ? একেকটা তো একেক রকম।

মনে আছে।

তোমার কতক্ষণ লাগবে ?

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। এখন সে কাজ করছে চোখ বন্ধ করে। জালাল খাঁ মাহতাব সাহেবের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ছয় ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে বারো ভোল্টের ডিভিআর চলবে না। তোমার এই লোক কী করছে সে-ই জানে, তবে তার কর্মপদ্ধতি মজার। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এই লোক কিছু জানে না—তাও ঠিক না। সে অবশ্যই জানে। ডিভিআর হাতে নিয়েই সে বলেছে এটা ঠিক আছে। ব্যাপারটা সত্যি হলেও আমার ধারণা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।

জালাল খাঁর কথার মাঝখানেই খলিলুল্লাহ বলল, স্যার নেন। এখন ঠিক হয়েছে।

ঠিক হয়েছে মানে ?

খলিলুল্লাহ ছোট্ট করে নিশ্বাস নিল। জালাল খাঁ ভয়েস রেকর্ডার হাতে নিলেন। বোতাম টিপে কয়েকবার 'হ্যালো হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি' বললেন। রিপ্লে করলেন। ভয়েস রেকর্ডার থেকে কথা শোনা গেল—হ্যালো হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি।

জালাল বিস্মিত গলায় ইংরেজিতে বললেন, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। যন্ত্রের কোনো এক জায়গায় রেজিসটেন্স বদলাতে হয়েছে। সেটা কী করে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না। আমি পুরোপুরি কনফিউজড।

খলিলুল্লাহ বলল, স্যার আমি যাই ?

জালাল খাঁ বললেন, যাও। যন্ত্রটা হাতে করে নিয়ে যাও। এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।

আমার দরকার নাই।

খলিলুল্লাহ চলে যাচ্ছে। জালাল খাঁ একবার তাকাচ্ছেন খলিলুল্লাহর দিকে, একবার তাকাচ্ছেন মাহতাব সাহেবের দিকে। দু'জনের কেউই কোনো কথা বলছেন না। মাহতাব সাহেবের ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে। কপাল ঘামছে। অবশ্যই প্রেসার বাড়ার লক্ষণ।

রাত দশটা বাজে।

মাহতাব ঘুমুবার আয়োজন করছেন। তিনি কখনোই রাত বারটার আগে ঘুমুতে যান না। আজ তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। বিকেল থেকেই প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা ছিল। কড়া পেইন কিলার খেয়ে মাথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। যন্ত্রণা চলে গেছে কিন্তু সে তার পালক ফেলে গেছে। সেই পালকের নাম ভোতা অবসাদ। তিনি রাতে খাবারও খান নি। হঠাৎ করে আবার এসিডিটি দেখা দিয়েছে। এন্ডোসকপির মতো কষ্টকর প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আবার মনে হয় যেতেই হবে।

দরজায় টোকা পড়ছে। মাহতাব সাহেব বললেন কে ?

টুনটুনির গলা শোনা গেল। টুনটুনি বলল, বাবা আমি। আমি কি ভেতরে আসব ?

মাহতাব সাহেব বললেন, দরজা খোলা আছে। মা, তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি আমি তোমাদের স্কুলের হেড মিসট্রেস না। আমার ঘরে ঢোকার সময় তোমার অনুমতি নিতে হবে না। যখন ইচ্ছা ঘরে ঢুকবে। যখন ইচ্ছা বার হয়ে যাবে।

টুনটুনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। মাহতাব সাহেবের ঘরে খাটের পাশে কার্পেটের উপর আখরোট কাঠের একটা রকিং চেয়ার আছে। টুনটুনি রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগল। তার মুখ বিষণ্ন। মাহতাব সাহেব বললেন, মা, কোনো কারণে তোমার কি মন খারাপ ?

টুনটুনি জবাব দিল না। মাহতাব সাহেব বললেন, মা শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা অলিখিত চুক্তি আছে। চুক্তিটা মনে আছে ?

মনে আছে।

বলো দেখি চুক্তিটা কী ?

আমার যদি মন খারাপ হয় তাহলে কেন মন খারাপ সেটা তোমাকে জানাব।

মাহতাব সাহেব মেয়ের সামনে বসতে বসতে বললেন, টুনটুনি মা শোনো। তোমার মা বেঁচে নাই। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই বের করে

ফেলতেন কেন তোমার মন খারাপ। মা-দের পক্ষে অনেক কিছু সম্ভব যা বাবাদের পক্ষে সম্ভব না। কাজেই তোমাকেই মুখ ফুটে বলতে হবে কেন তোমার মন খারাপ।

টুনটুনি দোল খাওয়া বন্ধ করে বলল, অরণ্যকে তুমি তালাবন্ধ করে রেখেছ কেন?

অরণ্যটা কে?

অরণ্য কে তুমি খুব ভালো করে জানো। আমি খলিলুল্লাহ নাম বদলে অরণ্য নাম দিয়েছি।

মাহতাব সাহেব শীতল গলায় বললেন, মা, একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার নাম তুমি বদলাবে কেন?

টুনটুনি বলল, বাবা, তুমিও কি একটু বাড়াবাড়ি করছ না। তাকে তুমি কেন তালাবন্ধ করে রাখবে? আমাদের এই বাড়িটা তো জেলখানা না। এবং সে এমন কোনো অপরাধও করে নি।

তাকে তালাবন্ধ করে রেখেছি এই জন্যে কি তোমার মন খারাপ?

টুনটুনি জবাব দিল না। আবারো দোল খেতে লাগল। মাহতাব সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, খলিলুল্লাহকে শাস্তি দেবার জন্যে তালাবন্ধ করে রাখা হয় নি। ও যেন চলে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি লোকটির কর্মকাণ্ডে শঙ্কিত। আমি স্বস্তি বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে something is wrong somewhere.

তুমি কি লোকটাকে ভয় পাচ্ছ?

হয়তো পাচ্ছি। যারা স্বাভাবিক মানুষ তারা অস্বাভাবিক মানুষের আশেপাশে অস্বস্তি বোধ করে। কালো আফ্রিকানদের দেশে প্রথম যখন সাদা চামড়ার মানুষ গেল, আফ্রিকানরা সেই সাদা চামড়ার মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলল। শুধু যে মেরে ফেলল তা না, আগুন দিয়ে ঝলসে খেয়েও ফেলল। একইরকম ঘটনা ঘটল সাদা চামড়াদের দেশে। তাদের কাছে যখন হঠাৎ কালো চামড়ার একজন এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে অশুভ মানুষ হিসেবে তাকে পুড়িয়ে মারা হলো।

তুমি অরণ্যকে ভয় পাচ্ছ?

অরণ্য অরণ্য করবে না মা। তার যা নাম তাকে তাই ডাকো। সেটাই শোভন ও সুন্দর।

তুমি খলিলুল্লাহ ভাইকে ভয় পাচ্ছ?

হ্যাঁ, পাচ্ছি। কিছুটা ভয় পাচ্ছি।

তাহলে একটা কাজ করো, ওকে ছেড়ে দাও। সে যেখানে থেকে এসেছিল সেখানে চলে যাবে।

এটা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন ?

সম্ভব না, কারণ আমি তাকে ছাড়ব না। আমার কাছ থেকে যাবার আগে সে তার সব রহস্য ভেঙে তারপর যাবে। আমি রহস্য পছন্দ করি না।

বাবা, আমি তোমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছি।

অবাক হলেও কিছু করার নেই। মা শোনো, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি শুয়ে পড়ব।

টুনটুনি বলল, তোমার সঙ্গে আমার যে লিখিত চুক্তি ছিল তার দু'টা পার্ট আছে। প্রথম পার্টে আমি আমার মন খারাপের কথা তোমাকে বলব। দ্বিতীয় পার্টে আছে তুমি চেষ্টা করবে আমার মন খারাপ ভাবটা দূর করতে। তা কিন্তু তুমি করছ না।

কী করলে তোমার মন খারাপ ভাব দূর হবে ? ওকে ছেড়ে দিলে ? ওকে আমি ছাড়ব না। তালাও খোলা হবে না। তবে একটা কাজ করতে পারি—তোমাকে তালার চাবিটা দিতে পারি। তোমার যখনই তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তুমি তালা খুলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। কথা শেষ হবার পর আবার তালাবন্ধ করে ফেলবে। এবং চাবি আমার কাছে ফেরত দেবে। রাজি আছ ?

হ্যাঁ, রাজি আছি।

মাহতাব সাহেব ড্রয়ার খুলে মেয়ের হাতে চাবি দিলেন। টুনটুনি চাবি নিয়ে চলে গেল। মাহতাব সাহেব বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানি দিলেন। তাঁর সারা শরীর কেন জানি জ্বালা করছে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে ভালো হতো। এখন তা করা যাবে না। টুনটুনি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাহতাব সাহেব আবার তাঁর ড্রয়ার খুললেন। হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে যে চিঠি এসেছে সেটা আবার পড়লেন—

চৌধুরী সাহেব,

আসসালাম। আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি অতি মহানুভব ব্যক্তি। আপনি আমাকে ঢাকায় আসিতে বলিয়াছেন। আমার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আজকালকার যুগে এতটা কেউ করে না। আমি অতি দ্রুত ঢাকা আসিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আপনার কথামতো বড় বৌমার নিকট খলিলুল্লাহর বিষয়ে সন্ধান নিব বলিয়া মনস্থির করিয়াছি। এখনো ব্যবস্থা নিতে পারি নাই। আপনি আমার বড় বৌমার সহিত সাক্ষাতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আমার জন্যে অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু জনাব—আমার বড় বৌমার পিতামাতা অত্যন্ত রক্ষণশীল ধারার মানুষ। তের বৎসর বয়স হইতেই বড় বৌমার বাপের বাড়ির সকল মেয়েদের বোরকা পরিধান করিতে হয়। এমতাবস্থায় আপনাকে ঐ বাড়িতে নিয়া গেলেও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বড় বৌমা সন্তান প্রসবের পর আমার বাড়িতে আসিলেই আপনি তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারিবেন।

আমার বড় বৌমা তাহার শাশুড়ি মাতার সহিত (অর্থাৎ আমার স্ত্রী) যে আলাপ করিয়াছে তাহা অতি সম্প্রতি আমি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আপনার জ্ঞাতার্থে আপনাকে তাহা জানাইতেছি। আমার বড় বৌমার ধারণা খলিলুল্লাহ মানুষ নহে, সে জিন।

জিন ও ইনসানের কথা পবিত্র কোরান শরিফে উল্লেখ আছে। হযরত সোলায়মান আলায়হেস সালামের অধীনে জিন সম্প্রদায় কর্মকাণ্ড করিত—ইহাও কোরান শরিফে উল্লেখ আছে।

আপনার অবগতির জন্যে জানাইতেছি—সর্বমোট তিন প্রকারের বুদ্ধিমান সম্প্রদায় আল্লাহপাক সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ফেরেশতা। ইহারা আগুনের তৈয়ারি। ইহারা সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পারে না। ইচ্ছামতো যে-কোনো রূপ ধারণ করিতে পারে।

ফেরেশতাদের পরেই আছে জিন সম্প্রদায়। ইহারাও আগুনের তৈয়ারি। তবে ইহারা সংসারধর্ম পালন করে। সন্তান সন্ততির জন্ম দেয়। মানুষের মতোই ইহাদেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। শয়তান (ইবলিশ) জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও অনেকে শয়তানকে পথভ্রষ্ট ফেরেশতা মনে করে। ইহা সঠিক না।

বড় বৌমা কেন খলিলুল্লাহকে জিন ভাবিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা অবশ্যই সত্য নয়। মেয়েছেলেরা দুর্বলচিত্ত হইয়া থাকে। রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা তাহাদের স্বভাব।

জনাব আপনার নিকট দীর্ঘ পত্র দিয়াছি। পত্রের দোষত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহপাক আপনার মঙ্গল করুক।

ইতি

নাদান

হাবীবুর রহমান

চিঠি পড়তে পড়তেই মাহতাব সাহেবের মাথা ব্যথা ফিরে এল। চোখ টনটন করতে লাগল। আজ কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি কি বেশি টেনশান করছেন ? বাড়াবাড়ি ধরনের এই টেনশানের মানে কী ?

মাহতাব সাহেব টেলিফোন হাতে নিলেন। জালাল খাঁর সঙ্গে কথা বললে যদি টেনশান কিছু কমে। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। জালাল নিজে টেনশানমুক্ত জীবনযাপন করে। যে নিজে টেনশানমুক্ত জগতে বাস করে সে অন্যদের টেনশান দূর করতে পারে না।

হ্যালো জালাল ?

হ্যাঁ। কে ?

চিনতে পারছিস না কে ?

না।

আমি মাহতাব।

ও আচ্ছা তুই। তোর টেলিফোন পাব এটা আমি ভাবছিলাম। অরণ্যের খবর কী ?

জানি না কী খবর। তাকে তালাবন্ধ করে রেখেছি।

সে-কী ! কেন ?

আমি তার ব্যাপারে কনফিউজড।

কনফিউজড হলেই তাকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে ? তুই একটা কাজ কর। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

অসম্ভব ! তাকে আমি হাতছাড়া করব না।

জালাল খাঁ হেসে ফেললেন। মাহতাব বললেন, তুই হাসছিস কেন ?

তুই অসম্ভব রকম টেনস্ হয়ে আছিস এই জন্যে হাসছি। আমার ধারণা তোর প্রেসার বেড়েছে। ড্রপ বিট হচ্ছে। তুই একজন ডাক্তার ডেকে আন।

জালাল শোন, আগামী বৃহস্পতিবারে তোর কি অবসর আছে ?

আমার সব দিনই অবসর, আবার সবদিনই ব্যস্ততা।

বৃহস্পতিবারটা তুই অবশ্যই অবসর রাখবি। আমার বাগানবাড়িতে যাবি। সেখানে খলিলুল্লাহকে নিয়ে জটিল একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।

তুই বারবার তাকে খলিলুল্লাহ বলছিস কেন ? টুনটুনি তার নাম দিয়েছে অরণ্য। তাকে অরণ্য ডাকবি। মাহতাব শোন, আমি তোর এই অদ্ভুত মানুষ নিয়ে ভাবছি। কিছু পড়াশোনাও করছি। আমার ধারণা সে Homo superior।

Homo superior কী ?

ডারউইনের এভোলিউশনের ধারায় মানুষের পরের বিবর্তন হলো Homo superior।

ভালো করে বুঝিয়ে বল।

বুঝিয়ে বলার সময় এখনো আসে নি। যখন সময় আসবে তখন বুঝিয়ে বলব। মাহতাব, আমি টেলিফোন রাখলাম। পড়ার মাঝখানে কেউ টেলিফোন করলে আমার খুবই বিরক্তি লাগে।

মাহতাব সাহেব খানিকটা বিব্রত গলায় বললেন, তোকে একটা হাস্যকর প্রশ্ন করছি, তুই কিন্তু হাসবি না।

জালাল খাঁ বললেন, তুই কনট্রাডিকটরি কথা বলছিস। হাস্যকর কথা বলবি অথচ আমি হাসতে পারব না? আচ্ছা চেষ্টা করব না হাসতে, বল কী কথা?

এমন কি হতে পারে যে খলিলুল্লাহ আসলে মানুষ না। জিন।

জিন?

হ্যাঁ, জিন।

মাটির কলসিতে যারা বন্দি থাকে তারপর ধোয়া হয়ে বের হয় সে-রকম কিছু?

মাহতাব বিরক্ত গলায় বললেন, তুই আমার কথাগুলি ফানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিস। আমি ফান করছি না।

জালাল খাঁ বললেন, তোর ঘরে কি ঘুমের ওষুধ আছে?

আছে।

কয়েকটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে তুই ঘুমিয়ে পড়। আমি ভোরবেলা তোর সঙ্গে কথা বলব। সকালে তুই আরেকটা কাজ করবি—অরণ্যকে কোনো এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি। ডাক্তার তার ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করবে, ইসিজি নেবে। ডাক্তার যখন বলবে অরণ্যের ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ তখন নিশ্চয়ই ভাববি না যে অরণ্য মানুষ না জিন। জিনদের ও পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ থাকার কথা না।

খলিলুল্লাহর ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ তোকে কে বলল?

কেউ বলেনি, কথার কথা বলছি। তুই কি আর কিছু বলবি?

না।

আমি কি টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পারি?

মাহতাব সাহেব কিছু বললেন না। জালাল খাঁ টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরেও তিনি বেশ কিছু সময় রিসিভার কানে নিয়ে বসে রইলেন।

ঘড়িতে এখন এগারোটা বাজে। টুনটুনির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাওয়া যাবে না। মাহতাব সাহেব দেয়াল ঘড়ির দিকে

তাকিয়ে রইলেন। সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার কট কট শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি যে উত্তেজিত এই কট কট শব্দ তার প্রমাণ। উত্তেজিত হলেই সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার কট কট শব্দ তিনি শুনতে পান। ঘড়িটি কি দেয়াল থেকে নামিয়ে ফেলবেন?

এখন বাজছে এগারোটা এক। আশ্চর্য, মাত্র এক মিনিট পার হয়েছে? সময় কি থমকে গেছে? মাহতাব সাহেবের মনে হচ্ছে তিনি অনন্তকাল ধরে বসে আছেন। দেয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার কট কট শব্দ শুনছেন।

টুনটুনি খলিলুল্লাহর ঘরে বসে আছে। সে বসেছে চেয়ারে। খলিলুল্লাহ দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছে। টুনটুনি বলল, আপনাকে যে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে এতে কি আপনার খারাপ লাগছে?

না।

খারাপ লাগছে না কেন?

আম্মাজি, আমার কোনো কিছুতেই খারাপ লাগে না।

আমাকে আপনি আম্মাজি ডাকেন কেন?

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না, হাসল।

আপনার মা কি দেখতে আমার মতো ছিলেন?

আমার মায়ের কথা আমার মনে নাই।

মাকে কখনো দেখেন নি?

মনে নাই।

আপনার বাবাকে আপনি দেখেছেন?

মনে নাই।

আপনার কিছুই মনে নাই এটা কেমন কথা?

আম্মাজি, আমার একবার খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল। অসুখের পর আগের কথা সব ভুলে গেছি।

কী অসুখ হয়েছিল?

মাথায় যন্ত্রণা হয়েছিল। এমন যন্ত্রণা যার কোনো মা-বাপ নাই। তখন চোখের সামনে শুধু কলকবজা দেখতাম।

স্বপ্নে দেখতেন?

স্বপ্নে দেখতাম না বাস্তবে দেখতাম সেটা খেয়াল নাই। শুধু দেখতাম কলকবজা। বড় কষ্ট করেছি। অসুখ অনেকদিন ছিল।

এখন সেই স্বপ্ন দেখেন না?

না, এখন অন্য কিছু দেখি।

কী দেখেন ?

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। হাসল। টুনটুনি বলল, আজ আমার খুব মন খারাপ।

খলিলুল্লাহ বলল, কেন মন খারাপ ?

আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন। বাবা দিনটার কথা ভুলে গেছেন।

আজ তোমার মায়ের মৃত্যুদিন ?

হ্যাঁ। আপনার যেমন আপনার মায়ের কথা কিছু মনে নেই—আমারও আমার মায়ের কথা কিছু মনে নেই। আমার যখন দু'বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। দু'বছর বয়সের স্মৃতি মানুষের মাথায় থাকে না।

তোমার বাবা আর বিয়ে করেন নি ?

বিয়ে করেছিলেন। নতুন মা রোড এক্সিডেন্টে মারা যান। চিটাগাং থেকে ঢাকা আসার পথে রোড এক্সিডেন্ট হয়। ড্রাইভার এবং মা দু'জনই মারা যান। বাবা আহত হয়েছিলেন। অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

টুনটুনি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, আসল মা'র কথা আমার মনে নেই, কিন্তু নতুন মা'র কথা মনে আছে। উনি আমাকে খুব আদর করতেন। আমার টুনটুনি নাম উল্টো করে আমাকে ডাকতেন নিটুনটু। আচ্ছা আপনি ঘুমান, আমি উঠি। আপনার ঘর আমি তালাবন্ধ করে রাখব, আপনি রাগ করবেন না।

আমি রাগ করব না।

আপনার যদি কখনো মনে হয় আপনি এখানে থাকবেন না, পালিয়ে যাবেন—তাহলে আমাকে বলবেন, আমি গভীর রাতে এসে তালা খুলে দেব। আপনি বাড়ির পেছনে চলে যাবেন, সেখান থেকে দেয়াল টপকে পালিয়ে যাবেন। পারবেন না ?

হ্যাঁ পারব।

টুনটুনি খলিলুল্লাহর দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

মাহতাব উদ্দিন ঘুমুতে গেলেন রাত একটায়। ঘুমুতে যাবার আগে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে একটা ডরমিকাম খেলেন। সাত মিলিগ্রামের ডরমিকাম, নিশ্চিন্ত ঘুমের জন্যে যথেষ্ট। ঘুমের ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় যাবার নাকি নিয়ম নেই। পাঁচ দশ মিনিট পরে যেতে হয়। শরীর রিলাক্স করার জন্যে সামান্য হাঁটাহাঁটি করতে হয়। বিছানায় যাবার ঠিক আগে আগে এক কাপ গরম দুধ এবং এক গ্লাস হিম শীতল পানি খেতে হয়। তিনি সবই করলেন কিন্তু তার ঘুম

এলো না। দেয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা প্রথমে দেয়ালে তারপর দেয়াল থেকে তাঁর মাথার ভেতরে কট কট করতে লাগল। তিনি বিছানা থেকে উঠে ঘড়ি নামিয়ে তার ব্যাটারি খুলে রাখলেন। তারপরেও সেকেন্ডের কাটার কটকটানি বন্ধ হলো না। মাথার ভেতর কট কট করতেই থাকল।

তাঁর ঘুম এলো ফজরের নামাজের পর। ঘুমের মধ্যে তিনি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুম ভাঙতেই চারদিকে লালাভ আলো দেখতে পেলেন। সেই সঙ্গে শোঁ শোঁ বিজ বিজ শব্দ। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে চারদিকে তাকাচ্ছেন, হঠাৎ চোখ পড়ল ঘরের মেঝের দিকে। ঘরের মেঝেটা বদলে গেছে। এটা এখন আর মেঝে না, গলিত লাভার মতো হয়ে গেছে। লাভা ফুটছে। বুদবুদ ভাঙছে। সেখান থেকেই বিজ বিজ শব্দ হচ্ছে। ঘটনা কী ? তিনি কি কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে আগ্নেয়গিরির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন ? তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে খাটে উঠে বসলেন এবং লক্ষ করলেন তার রট আয়রনের খাটের পায়া জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভাতে গলে গলে যাচ্ছে তিনি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন লাভা সমুদ্রে। যে দিকে চোখ যাচ্ছে গলন্ত লাভা।

শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। শব্দটা হচ্ছে ঠিক মাঝখানে। কোনো একটা ঘটনা সেখানে ঘটছে। ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা। মাহতাব সাহেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু একটা বের হয়ে আসছে। একটা মানুষের মাথা। মানুষটা কে ? খলিলুল্লাহ ? হ্যাঁ খলিলুল্লাহই তো। মাহতাব সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, কী চাও তুমি, কী চাও ?

মানুষের মাথার মুখ হা হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, আমি কিছু চাই না।

চলে যাও তুমি, চলে যাও।

কোথায় চলে যাব ?

যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও।

যাব কীভাবে ? আপনি তো আমাকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন !

মাহতাব সাহেব স্বপ্নের ভেতর চেঁচাচ্ছেন—টুনটুনি, চাবি দিয়ে তালা খুলে দে। চলে যাক। এ যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যাক।

মাহতাব উদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন—তাঁর সারা শরীর ঘামে ভেজা।

টুনটুনি তার ম্যাকিনটস কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। সে খুব অবাক হয়ে কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। পর্দায় অরণ্য'র ছবি। ক্র্যাপ বুক

বানানোর জন্যে সে ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলি কম্পিউটারে ঢুকিয়েছে। আগে তোলা ছবি এবং পরে তোলা ছবি পাশাপাশি দেখে তার খুবই অবাক লাগছে। প্রথমদিকে তোলা ছবিগুলির সঙ্গে শেষের দিকে তোলা ছবির বড় অমিল আছে। চোখের মণির রঙে অমিল। প্রথম যে ছবিগুলি তোলা হয়েছিল সেখানে চোখের মণির রঙ কালো। এখনকার ছবিতে হালকা নীল।

মানুষের চোখের মণির রঙ কি পাল্টাতে পারে ? অসম্ভব। মানুষ গিরগিটি না যে রঙ পাল্টাবে। তাহলে কি ডিজিটাল ক্যামেরায় কোনো গণ্ডগোল হয়েছে ? সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কারণ টুনটুনির মনে আছে সে খালি চোখে দেখেছে অরণ্যের চোখের রঙ হালকা নীল।

যদি দেখা যায় যে মানুষটা ইচ্ছামতো চোখের মণির রঙ পাল্টাতে পারে তাহলে মন্দ হয় না। টুনটুনির ইচ্ছা করছে অরণ্যকে জিজ্ঞেস করতে। সেটা সম্ভব না, কারণ টুনটুনির বাবা অরণ্যকে লোক দিয়ে সাভার পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন বলেন নি। জিজ্ঞেস করার পরেও বলেন নি। শুধু বাবাকে খুব চিন্তিত মনে হয়েছে। তিনি অরণ্যকে নিয়েই চিন্তিত এটা বোঝা যাচ্ছে। কারণ তিনি টুনটুনিকে ডেকে বলেছেন, তুমি যখন-তখন খলিলুল্লাহর ঘরে যাবে না।

টুনটুনি বলেছে কেন যাব না ?

আমি নিষেধ করছি সেই জন্যে যাবে না।

তুমি নিষেধ করছ কেন ?

নিষেধ করছি কারণ তুমি একটি অল্পবয়েসী মেয়ে। হুটহাট করে একটা যুবক ছেলের ঘরে কেন ঢুকবে ?

বাবা অরণ্য কিন্তু আমাকে মা ডাকে।

সে তোমাকে মা ডাকুক, খালা ডাকুক, দাদি ডাকুক কিচ্ছু আসে যায় না। আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করছি, তুমি যাবে না।

রেগে যাচ্ছ কেন বাবা ?

রেগে যাচ্ছি না। আমার যা বলার আমি সহজভাবেই বলছি।

তুমি মোটেই সহজভাবে কিছু বলছ না। তোমার গলার স্বর নিচু, এটা ঠিক আছে। কিন্তু রাগে তোমার হাত-পা কাঁপছে। তোমার চোখ লাল হয়ে আছে। আমার ধারণা তুমি অসুস্থ। তুমি কি দয়া করে একজন ডাক্তার দেখাবে ?

মাহতাব সাহেব জবাব দেন নি। তিনি মেয়ের সামনে থেকে সরে গিয়েছেন। তার কিছুক্ষণ পরই ডাক্তার আসতে দেখে টুনটুনি ভাবল বাবা তার নিজের জন্যে ডাক্তার এনেছেন। দেখা গেল ঘটনা তা না। ডাক্তার অরণ্যের জন্য

এসেছে। ব্লাড প্রেসার মাপছে, রক্ত নিচ্ছে। নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।

টুনটুনি নিশ্চিত তার বাবা অরণ্যকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। টুনটুনি চিন্তিত হবার মতো কিছু দেখছে না। মানুষটা রহস্যময় এবং বিস্ময়কর। কিন্তু চিন্তিত হবার মতো না। মানুষ চিন্তিত হবে হিংস্র জন্তু দেখে। দুষ্ট মানুষ দেখে। অরণ্য হিংস্র জন্তু না। দুষ্ট মানুষও না।

টুনটুনি অরণ্যের ছবির প্রিন্ট আউট দিয়েছে। কালার প্রিন্টার থেকে ছবি প্রিন্ট হচ্ছে। কী সুন্দর ছবি !

মাহতাব উদ্দিন তাঁর সাভারের বাগানবাড়ির পুকুর পাড়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে জালাল খাঁ বসে আছে। পুকুর পাড়ে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। মাহতাব উদ্দিন কঠিন নিষেধ জারি করেছেন পুকুর পাড়ে যেন কেউ না আসে। পুকুরে খলিলুল্লাহকে নামানো হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ হলো সে ডুব দিয়েছে। এখনো ভাসে নি। মাহতাব উদ্দিন বললেন, জালাল দেখ তো কতক্ষণ পার হয়েছে।

জালাল খাঁ বললেন, সতেরো মিনিট।

সতেরো মিনিট একটা মানুষ ডুব দিয়ে আছে। পানিতে নামানোর সময় একটা হাফপ্যান্ট পরে নেমেছে। এখনো ভেসে ওঠে নি। তোর কাছে কি কোন ব্যাখ্যা আছে ?

না।

কোনো ব্যাখ্যা নেই ?

না।

কোনো মানুষের পক্ষে কি এই কাজটা করা সম্ভব ?

জালাল খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, মানুষের ক্ষমতা সীমাহীন। তার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া বাঁচা সম্ভব না।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, লোকটা অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে আছে ?

জালাল খাঁ বললেন, হ্যাঁ।

মাছ যেমন পানি থেকে অক্সিজেন নেয় সে কি এইভাবে নিচ্ছে না ?

না।

কীভাবে বুঝলি না ?

অক্সিজেন নিলে তাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়তে হতো। তা সে করছে না। যদি করত পানিতে বুদবুদ দেখা যেত। পানিতে বুদবুদ দেখছি না। আরেকটা সম্ভাবনা আছে।

কী সম্ভাবনা ?

আমাদের অরণ্য যদি তার শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখে তাহলে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়বে না।

সেটা কি সম্ভব ?

প্রাচীন মুনিঋষিরা করতে পারতেন বলে বইপত্রে পড়ি। যোগীসাধকরাও না-কি পারেন। তবে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না। তোমার এই স্পেসিমেন আর যাই হোক কোনো মুনিঋষি না, যোগীসাধকও না।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, সে কে ?

জালাল খাঁ বললেন, জানি না। আমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি।

কী হাইপোথিসিস ?

এখনো তেমন কিছু দাঁড় করাতে পারি নি, ভাবছি। আমাদের এগোতে হবে লজিকের মাধ্যমে। প্রসেস অব এলিমিনেশন পদ্ধতিতে।

জালাল খাঁ সিগারেট ধরালেন। ঘড়ি দেখলেন। পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে। মানুষটা এখনো পানিতে ডুব দিয়ে আছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, প্রসেস অব এলিমিনেশনটা কী ?

জালাল খাঁ বললেন, প্রথমে আমাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে অরণ্য নামের জিনিসটি মানুষ না অন্য কিছু। যদি মানুষ হয় তাহলে এক ধরনের যুক্তি আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে অন্য ধরনের যুক্তি।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, অন্য কিছুটা কী হতে পারে ?

রোবট হতে পারে।

রোবট ?

হ্যাঁ, রোবট। দেখতে মানুষের মতো। কথাবার্তা মানুষের মতো। যেহেতু রোবট, তার অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ছে না। সে পানির নিচে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকতে পারবে।

তোর ধারণা সে রোবট ?

আমার কোনো ধারণা নেই। প্রসেস অব এলিমিনেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হলে প্রথমে তাকে রোবট ভাবতে হবে। তারপর যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে সে রোবট না। তখন রোবট ক্যাটাগরি বাদ পড়বে।

মাহতাব উদ্দিন ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, সে রোবট না। তার ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে। ব্লাডের গ্রুপ 'O' পজেটিভ। ইউরিন, স্টুল সব একজামিন করা

হয়েছে, ইসিজি করা হয়েছে, প্রেশার মাপা হয়েছে, এক্স-রে নেয়া হয়েছে। সব কিছুই সাধারণ মানুষের মতো, শুধু হার্ট সামান্য এনলার্জড।

জালাল খাঁ বললেন, তাহলে তাকে বরং মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে এগোতে থাকি। ধরা যাক সে মানুষ, তবে অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। Homo superior।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, Homo superior ব্যাপারটা কী ? তুই আগেও একবার বলেছিস।

জালাল খাঁ বললেন, জন বেরেসফোর্ড নামের একজন লেখক 'The Hampdensire Wonder' নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটা ১৯১১ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বই-এ তিনি Homo superior-এর কথা প্রথম বলেছেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর বর্তমান মানবসম্প্রদায়ের পরিবর্তে নতুন মানবসম্প্রদায় চলে আসবে। তারা দেখতে মানুষের মতো হলেও তাদের থাকবে অস্বাভাবিক ক্ষমতা। এরাই পৃথিবী শাসন করবে। এরাই গ্রহ-নক্ষত্র জয় করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এরা আসবে কোত্থেকে ?

মিউটেশনের মাধ্যমে মানুষের ডিএনএ পরিবর্তিত হয়ে Homo superior তৈরি হবে। এরা হলো কার্টুনে দেখা কল্পনার Superman।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ? বিবর্তিত হয়ে মানুষ এরকম হবে ?

জালাল খাঁ বললেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমস্যা হচ্ছে এই থিওরি অতীতের বিবর্তনের ধারা বলতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে কী বিবর্তন হতে যাচ্ছে তা বলতে পারে না। মানুষের ডিএনএ-র পরিবর্তনটা কীভাবে হবে ডারউইনের থিওরি সেটা বলছে না। হঠাৎ করে একজন Homo superior তৈরি হবে না-কি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এদের দেখা যাবে তা কেউ বলতে পারছে না।

জালাল, তোর ধারণা খলিলুল্লাহ নামের মাটিকাটা কুলি একজন Homo superior ?

হতে পারে। তার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তো চোখের সামনে দেখছি। যন্ত্রপাতির উপর তার কী পরিমাণ দখল সেটাও দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের এখন করণীয় কী ?

আমাদের করণীয় একটাই—অরণ্যের সঙ্গে কথা বলা। তার সাহায্য নিয়েই বের করা সে কে ? তার DNA-র সিকোয়েন্সগুলি কী তা জানা। যে পড়াশোনা জানে না তাকে পড়াশোনা শেখানো। সে যদি Homo superior হয় তাহলে মানবসম্প্রদায়ের অর্জিত জ্ঞানের সবটুকু সে নিজের ভেতর অতি দ্রুত নিতে পারবে।

মাহতাব উদ্দিন বললেন, কতক্ষণ পার হয়েছে দেখ তো ?

এক ঘন্টা পনেরো মিনিট।

তাকে কি ডেকে তুলব না সে আরো কিছুক্ষণ পানিতে থাকবে ?

জালাল খাঁ বললেন, থাকুক পানিতে। আমাকে তুই একটা কাগজ কলম দে। তাকে যে সব প্রশ্ন করব তা লিখে ফেলি। থাক কাগজ কলম লাগবে না। জালাল খাঁ পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাহতাব উদ্দিনও তাকিয়ে আছেন। কেউ কোনো কথা বলছেন না। পুকুরের পানি শান্ত। সেখানে কোনো আলোড়ন নেই।

জালাল খাঁ মাহতাব উদ্দিন সাহেবের বাগানবাড়ির বসার ঘরে সোফায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বেতের চেয়ারে খলিলুল্লাহ বসে আছে। সব মিলিয়ে পানিতে দু'ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট ছিল। এক ঘন্টা হলো সে পানি থেকে উঠে এসেছে। সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সে এসে বসেছে বসার ঘরে। জালাল খাঁ তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। মাহতাব উদ্দিনেরও এই আসরে থাকার কথা ছিল। তাঁর হঠাৎ প্রবল মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে বলে তিনি অন্য একটা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাইগ্রেনের সমস্যা আছে। হঠাৎ হঠাৎ মাইগ্রেনের ব্যথা উঠে তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দেয়। আজকের মাথা ব্যথার ধরন সে-রকম।

জালাল খাঁ অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন আছ ?

অরণ্য বলল, ভালো আছি।

পানির নিচে থাকতে কেমন লাগে ?

ভালো লাগে।

শুকনায় থাকতে ভালো লাগে না-কি পানিতে থাকতে ভালো লাগে ?

দু'টাই ভালো।

তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব, জবাব দেবে ?

জ্বি, দেব।

তোমার কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা যে আছে এটা তুমি জানো ?

আগে জানতাম না। এখন জানি।

তুমি পানিতে ডুবে থাকতে পারো এটা দেখলাম। এছাড়া আর কী পারো ? শূন্যেও ভেসে থাকতে পারো ?

পারি।

জালাল খাঁ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবারো বললেন, তুমি শূন্যে ভেসে থাকতে পারো ?

পারি।

তাহলে ভেসে দেখাও।

এখন পারব না।

কখন পারবে ?

যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন পারি।

কতক্ষণ ভেসে থাকতে পারো ?

অনেকক্ষণ পারি।

তুমি কে এটা বলো।

আমি জানি না আমি কে।

তোমার কি জানতে ইচ্ছা হয় তুমি কে ?

না।

কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি কে ? তুমি আমাকে সাহায্য করো। তুমি সাহায্য করলেই আমি তোমার ব্যাপারে জানতে পারব। তুমি সাহায্য না করলে পারব না। আচ্ছা শোনো, তুমি কি রোবট ?

রোবট কী ?

রোবট হলো যন্ত্রমানব। যাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, আবেগ নেই। তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে ?

আছে।

আবেগ আছে ? কষ্ট পেলে কাঁদো ?

না।

কষ্ট পেলে কাঁদো না ? কখনো তোমার চোখে পানি আসে নি ?

একবার এসেছে।

সেটা কখন ?

আম্মাজি তার মা'র কথা বলছিল। তার মা'কে সে কখনো দেখে নাই। মা'র কথা বলতে গিয়ে সে এত মন খারাপ করল যে আমার চোখে পানি এসে গেল।

এর অর্থ হচ্ছে তোমার আবেগ আছে। আচ্ছা, তুমি তোমার বাবা-মা'কে মনে করতে পারো ? তারা কোথায় ?

জানি না।

বাবা-মা'র কথা কিছুই জানো না ?

আমার কিছু মনে নাই। একবার আমার খুব বড় অসুখ হয়েছিল। অসুখ হবার পর অসুখের আগের সবকিছু ভুলে গেছি।

কী অসুখ হয়েছিল ?

মাথায় যন্ত্রণা। দুঃস্বপ্ন দেখতাম।

কী দুঃস্বপ্ন ?

নানান রকম কলকবজা ঘুরছে। অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র। অসুখের সময় বড় কষ্ট করেছি।

জালাল খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যন্ত্রের কথায় মনে পড়ল তুমি নষ্ট যন্ত্রপাতি ঠিক করতে পারো। এই প্রমাণ আমরা দেখেছি। যে নষ্ট যন্ত্র ঠিক করতে পারে সে যন্ত্র বানাতেও পারে। তুমি যন্ত্র তৈরি করতে পারবে ?

কী যন্ত্র ?

আমাদের জানা নেই এমন।

আপনি বলেন কী যন্ত্র বানাতে চান।

জালাল খাঁ আগ্রহ নিয়ে বললেন, একটা টাইম মেশিন কি বানোনো যায় ? এইচ জি ওয়েলস-এর টাইম মেশিন।

সেই মেশিনে কী হয় ?

সেটা একটা অদ্ভুত মেশিন। এই মেশিনে করে মানুষ অতীত থেকে বর্তমানে আসতে পারে। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যেতে পারে।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

জালাল খাঁ উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে এমন ভঙ্গিতে বলা শুরু করলেন যেন টাইম মেশিন বানাতে পারে এমন একজন ইনজিনিয়ার তাঁর সামনে বসে আছে। ব্যাপারটা শুধু বোঝানোর অপেক্ষা, বোঝানো হয়ে গেলে টাইম মেশিন তৈরি হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিক ডেলিভারি।

মেশিনটা হবে এরকম—মনে করো আমি মেশিনটায় বসলাম, সুইচ টিপলাম। অমনি আমি চলে গেলাম অতীতে, যখন আমার বাবার বয়স মাত্র সাত বছর।

এই যন্ত্র তৈরি করা যাবে না।

কেন তৈরি করা যাবে না ?

নিয়মের মধ্যে পড়বে না।

কিসের নিয়ম ?

জগতের নিয়ম। এই যন্ত্র তৈরি হলে জগতের নিয়মে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। জগতের নিয়মে গণ্ডগোল হয় এমন কিছু জগৎ তৈরি করতে দেয় না।

জালাল খাঁ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। টাইম মেশিন ফিজিক্সের সূত্র গ্রহণ করে না। ধরো আমি যদি অতীতে ফিরে গিয়ে আমার সাত বছর বয়সী বাবাকে মেরে ফেলি তাহলে কী হবে ? তাহলে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব ? আমার বাবাই তো সাত বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি বড় হয়ে বিয়ে করতে পারেন নি। কাজেই আমার জন্ম হয় নি। তাহলে আমি কোত্থেকে এলাম ?

অরণ্য এক দৃষ্টিতে জালাল খাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে চাপা কৌতূহল। যেন সে কিছু বলতে চায়। জালাল খাঁ বললেন, তুমি কিছু বলবে ?

আমি আম্মাজির জন্যে একটা যন্ত্র বানাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কার জন্যে যন্ত্র বানাবে, টুনটুনির জন্যে ?

জ্বি।

কী যন্ত্র ?

আম্মাজি এই যন্ত্রে তার মায়ের কথা শুনতে পাবে। অনেক কাল আগে যে সব কথা বলেছিল সে সব কথা।

কীভাবে ?

মানুষের কথা নষ্ট হয় না। মানুষের কথা থেকে যায়। ঘরের দেয়ালে থাকে, বাতাসে থাকে। সেখান থেকে কথা বের করে আনা যাবে।

কীভাবে ?

সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আপনাকে বোঝাতে পারব না।

যন্ত্রটা তৈরি করতে তোমার কী লাগবে ?

কলমের মতো একটা যন্ত্র যে আপনার আছে সেটা লাগবে। আরো কিছু জিনিস লাগবে।

তোমার যা যা লাগবে সবই আমি জোগাড় করে দেব। তুমি যন্ত্রটা বানাও। আমরা এই যন্ত্রের নাম দেব Past Rocorder, PR। বাংলায় তার নাম হবে 'অতীত-কথন'। আচ্ছা তুমি কি যন্ত্রটা একা একা তৈরি করতে পারবে ? তোমাকে সাহায্য করার লোক লাগবে না ?

আমাকে সাহায্য করার লোক আছে।

কোথায় আছে ?

অরণ্য জবাব দিল না। চুপ করে বসে থাকল। সে এখন তাকিয়ে আছে তার পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। বুড়ো আঙুল উঠানামা করছে।

জালাল খাঁ তার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি কে ?

অরণ্য বলল, আমি জানি না আমি কে ? বলেই সেও জালাল খাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, আপনি কি জানেন আপনি কে ? জালাল খাঁ হতাশ গলায় বললেন, আমিও জানি না আমি কে।

হাবীবুর রহমান সাহেব চিকিৎসার জন্যে ঢাকা চলে এসেছেন। খালি হাতে আসেন নি—তিন কেজি মাষকলাইয়ের ডাল, পাঁচ কেজি কালিজিরা পোলাওয়ের চাল, দু'টা বিশাল সাইজের মিষ্টিকুমড়া নিয়ে এসেছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে মাহতাব সাহেবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। হ্যান্ডশেকের পর কোলাকুলি করলেন। মাহতাব সাহেবের বাড়িঘর দেখে বেচারা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। এই জিনিস তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বসার ঘরের মেঝের অর্ধেকটা মার্বেলের, বাকি অর্ধেক মনে হচ্ছে কাচের, নিচ থেকে সবুজ আলোর আভা আসছে। হাবীবুর রহমান সাহেব বললেন, ভাইসাহেব, ভালো আছেন ?

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ভালো আছি।

যাকে পাঠিয়েছিলাম, খলিলুল্লাহ, সে কেমন আছে ?

সেও ভাল আছে।

তার মাধ্যমেই আপনার সঙ্গে পরিচয়, জগতের কী অদ্ভুত লীলা !

অদ্ভুত লীলা তো বটেই !

জনাব, আপনি বলেছিলেন আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

মাহতাব উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। আপাতত বিশ্রাম করুন। আপনাকে গেস্টরুম দেখিয়ে দেবে।

শুকরিয়া। জনাব, খলিলুল্লাহর সঙ্গে একটু কথা বলি। সে আছে কোথায় ?

সে ভালো মতোই আছে। তার সঙ্গে আপনার কথা বলার প্রয়োজন দেখছি না।

না না, কোনো প্রয়োজন নাই। সে থাকবে তার মতো। আমি থাকব আমার মতো। আমার খুবই ভালো লাগছে যে আপনার আশ্রয়ে এসে দরিদ্র মানুষটার একটা গতি হয়ে গেল। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা উপলক্ষ মাত্র। জনাব, কেবলা কোন্‌দিক ? তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে। মাগরেবের ওয়াক্তও হয়ে গেছে।

আপনি আপনার ঘরে যান। কেবলা কোনদিকে তা আপনাকে দেখিয়ে দেবে জায়নামাজ এনে দেবে।

জায়নামাজ আমার সঙ্গেই থাকে জনাব। জায়নামাজ আর কোরান শরিফ এই দু'টা জিনিস ছাড়া আমি ঘর থেকে বের হই না। ছোটবেলার অভ্যাস।

মাহতাব উদ্দিন বসার ঘর থেকে বের হলেন। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাসায় যখন থাকেন সন্ধ্যাবেলা ছাদে হাঁটাহাঁটি করেন। সূর্যাস্ত দেখেন। গ্রামে সূর্যাস্ত দেখার একরকম আনন্দ। শহরে দালানকোঠার ঘরে খলিলুল্লাহকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘরটিও তালাবন্ধ। তাতে খলিলুল্লাহর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সে নিজের মনেই আছে। এই ঘরটা বেশ বড়। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছানো। পাটিভর্তি হাজারো খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি। দু'টা কম্পিউটারের মাদারবোর্ড। একটা মনিটর। ইলেকট্রিকের তার। সোল্ডারিং গান। খলিলুল্লাহ যা যা চেয়েছে জালাল খাঁ খবই জোগাড় করে দিয়েছেন। তাকে নিয়ে ইলেকট্রনিকের দোকানে ছেড়ে দিয়েছেন। সে যা যা চেয়েছে সবই তাকে দেয়া হয়েছে। প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের একটা মোমের টুকরার উপর জিনিসগুলি বসেছে। মোমের টুকরাটি মনে হয় মূল বেস। প্রতিদিন তাকে প্রচুর বরফ দিতে হচ্ছে। বরফ কী জন্যে লাগছে কে জানে। বরফের আপাতত কোনো ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না।

মাহতাব উদ্দিন খলিলুল্লাহর ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জানালায় টোকা দিয়ে বললেন, কেমন আছ খলিলুল্লাহ ?

খলিলুল্লাহ মুখ তুলল না। কাজ করতে করতেই বলল, ভালো আছি।

যন্ত্র তৈরি হচ্ছে ?

জ্বি।

এই যন্ত্রে অতীতের কথা শোনা যাবে ?

জ্বি। শুধু কথা শোনা যাবে না। ছবিও দেখা যাবে।

বলো কী ! ছবিও দেখা যাবে ?

জ্বি। যন্ত্রটা এই ঘরে ফিট করা হয়েছে, কাজেই এই ঘরে পনেরো বিশ কুড়ি বছর আগে কী হয়েছিল সেটা দেখা যাবে।

এমন যন্ত্র সত্যি তৈরি হবে ?

জ্বি হবে। হবে না, হয়েছে। আমি পরীক্ষাও করেছি।

মাহতাব উদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে বললেন, পরীক্ষায় কী দেখলে ?

দেখলাম এই ঘরে একজন মহিলাকে তালাবন্ধ করে রাখা হতো। মহিলার চোখ নীল।

তাই দেখলে ?

জ্বি।

খুব ভালো যন্ত্র। পুরোপুরি তৈরি হোক, তারপর আমাকে খবর দিও। আমি এসে দেখে যাব।

জ্বি আচ্ছা।

অন্ধকারে কাজ করছ কীভাবে?

আমার অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা না হলে তো ভালোই।

মাহতাব উদ্দিন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। পুরোপুরি অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটলেন। এশার নামাজের আজানের পর তিনি নিচে নামলেন। আজ সারাদিন টুনটুনির সঙ্গে দেখা হয় নি মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। বারেক খবর দিয়েছে টুনটুনির জ্বর। চারদিকে ভাইরাস ফিভার হচ্ছে। টুনটুনিকেও কোনো একটা ভাইরাসে ধরেছে কিনা কে জানে।

টুনটুনি ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল। মাহতাব উদ্দিন ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। টুনটুনি চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার চোখ লাল। মাহতাব উদ্দিন বললেন, জ্বর কি খুব বেশি রে মা?

টুনটুনি বাবার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, বাবা, তুমি আমাকে অরণ্যের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছ না কেন? তাকে নিয়ে ছাদের চিলেকোঠায় আটকে রেখেছ। আমাকে কেউ ছাদে যেতে দিচ্ছে না।

মাহতাব সাহেব বললেন, খলিলুল্লাহ তোর জন্যে কী একটা যন্ত্র বানাচ্ছে। যন্ত্রটা পেয়ে তুই খুব সারপ্রাইজড হবি। সেই সারপ্রাইজটা যেন নষ্ট না হয় সে জন্যেই তোকে যেতে দিচ্ছি না।

যন্ত্রটা দিয়ে কী হয়?

কী হয় আগে বললে তো সারপ্রাইজ থাকবে না।

টুনটুনি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, বাবা, মানুষকে তালাবন্ধ করে রাখতে তুমি খুব মজা পাও—তাই না?

তার মানে?

চিলেকোঠার ঐ ঘরে তো তুমি আমার মাকেও তালাবন্ধ করে রাখতে।

মাহতাব সাহেব শান্ত গলায় বললেন, টুনটুনি, তোমাকে আমি বলেছি তোমার মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে তালাবন্ধ করে রাখা ছাড়া আমার দ্বিতীয় পথ ছিল না।

টুনটুনি তাকিয়ে আছে। তার চোখ রক্তাভ।

মাহতাব সাহেব বললেন, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন ? আর কিছু বলতে চাও ?

টুনটুনি বলল, না।

রাত একটা।

মাহতাব উদ্দিন তাঁর ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে মাথা নিচু করে বারেক দাঁড়িয়ে আছে। মাহতাব সাহেব বললেন, হাবীবুর রহমান সাহেবকে কাল ভালো ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করবে।

বারেক বলল, জ্বি করব।

মাহতাব উদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, খলিলুল্লাহর একটা ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে হবে। কী ব্যবস্থা বুঝতে পারছ ?

পারছি।

আর যাই করো তাকে পানিতে ফেলবে না। পানিতে ফেলে কিছু করা যাবে না। এ অন্য জিনিস।

বারেক চাপা গলায় বলল, স্যার এই বিষয় নিয়া আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। আমাদের ইটের ভাটা আছে।

ঠিক আছে, এখন যাও।

রাত দু'টা কুড়ি মিনিটে খলিলুল্লাহকে হাত-পা বেঁধে ইটের ভাটায় ফেলে দেয়া হলো।

রাত দু'টা পঁচিশ মিনিটে টুনটুনির জ্বর খুব বাড়ল। গা দিয়ে রীতিমতো আগুন বের হচ্ছে। মাহতাব উদ্দিন মেয়েকে বাথটাবে শুইয়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে ডাক্তার আনতে ছুটে গেলেন। জ্বরের ঘোরে টুনটুনি পানির নিচে চলে গিয়েছে। তখন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। টুনটুনি লক্ষ করল সে পানির নিচে ডুবে থাকতে পারছে, তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সে একসঙ্গে অসংখ্য নারী পুরুষের গলা শুনছে। সবাই বলছে—টুনটুনি, দ্বিতীয় মানব সম্প্রদায়ের জগতে স্বাগতম। তুমি এখন আমাদের একজন।

অঁহক

ইস্টার গ্যালাকটিক স্পেসশিপগুলির পরিচালনা নীতিমালায় তিনটি না-সূচক সাবধান বাণী আছে। স্পেসশিপের ক্যাপ্টেনকে এই তিন 'না' মেনে চলতে হবে।

১. স্পেসশিপ কখনো নিউট্রন স্টারের বলয়ের ভেতর দিয়ে যাবে না।

২. ব্ল্যাকহোলের বলয়ের ভিতর দিয়ে যাবে না।

৩. অঁহক গোষ্ঠীর সীমানার কাছাকাছি যাবে না। ভুলক্রমে যদি চলে যায় অতি দ্রুত বের হয়ে আসবে।

সমস্যা হল নিউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আগেভাগে টের পাওয়া যায়। সময় মতো ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু অঁহকদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগেভাগে তাদের উপস্থিতি জানার কোন উপায় নেই।

অথচ অঁহকরা মহাশূন্যের বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে সবচে' দয়ালু। বিপদগ্রস্ত মহাশূন্যযানের সাহায্যের জন্যে অতি ব্যস্ত। তাদের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। যে কোন যন্ত্রাংশ তারা অতি দ্রুত ঠিক করতে পারে। এই অনন্ত মহাবিশ্বের যে কোন শ্রেণীর প্রাণীর যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ ঠিক করে ফেলতে পারে। তারপরেও এদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এদেরকে ব্ল্যাকহোল কিংবা নিউট্রন স্টারের মতই বিপজ্জনক ভাবা হয়।

অঁহকদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোন তথ্য কোথাও নেই। গ্যালাকটো-পিডিয়াতে লেখা আছে—

অঁহক

অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রাণী। ছোট ছোট দলে এরা অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট প্রাণী। এদের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি অজ্ঞাত। ধারণা করা হয় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে এরা প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। অন্য সব বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। তবে বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের সাহায্যে অতি দ্রুত ছুটে আসে। ভগ্ন যন্ত্রাংশ ঠিক করা এবং আহত প্রাণীদের চিকিৎসায় এদের দক্ষতা সীমাহীন।

অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছাকাছি এলে এরা নিজেদের অদৃশ্য রাখতে পছন্দ করে। এই ক্ষমতা তাদের আছে। তারা টেলিপ্যাথিক মাধ্যমেও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। আহত বুদ্ধিমান প্রাণীদের চিকিৎসা দান কালে তারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে আহতের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয়। তবে নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বলে না।

তাদের যান্ত্রিক কোন কিছু নেই। কারণ তাদের যন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তারা ছোটাছুটি করতে পারে।

ধারণা করা হচ্ছে অঁহকরা অতি শান্তি প্রিয়। সিরাস নক্ষত্রের গ্রহ 'ভি থ্রি'র অতি উন্নত প্রাণী মায়রাদের একটি দল একবার অঁহকদের লক্ষ্য করে আণবিক ব্লাস্টার, লেজার-নিও ব্লাস্টার এবং পজিট্রন ব্লাস্টার নিক্ষেপ করে। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তৈরি হয়। এর উত্তরে অঁহকরা তাদের যাত্রাপথ থেকে সরে যায় এবং তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তায় বলা হয়—

ধ্বংসে আনন্দ নেই।

আনন্দ সৃষ্টিতে।

অঁহকদের মোট সংখ্যা, তাদের জীবনকাল কিংবা বাসস্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। খুব সম্ভব তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। তাদের শরীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া এবং জৈব রসায়ন বিষয়ক কোন কিছুই জানা যায় নি। স্পেকট্রোগ্রাফিতে প্রাপ্ত সামান্য তথ্যে অনুমান করা হয় তারা মেঘ সদৃশ প্রাণী। তাদের বলয় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে গামা রশ্মি এবং এক্স রশ্মির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণ অনিয়মিত বলেই তাদের উপস্থিতি আগেই বোঝা যায় না।

গ্যালাকটোপিডিয়াতে অঁহকদের সম্পর্কে খারাপ কিছু নেই। মহাবিশ্বের অন্যসব বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গেই তাদের যুক্ত করা হয়েছে। তবে তাদের স্থান হয়েছে রেড বুকে। রেড বুকে নাম ওঠার অর্থ এদের কাছে যাওয়া অতি বিপজ্জনক।

স্পেসশিপ 'লি-২০১' একটি সাধারণ ফেরি শিপ। এর কাজ সৌরমণ্ডলের ভেতরের গ্রহ এবং উপগ্রহ থেকে খনিজ দ্রব্য মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাওয়া। খনিজ দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সব বড় বড় কল-কারখানাই মঙ্গল গ্রহে করা হয়েছে।

স্পেসশিপ লি-২০১-এর মাল বহনের ক্ষমতা অসাধারণ। এর ইঞ্জিন ইলেকট্রন এমিশন ইঞ্জিন। পুরনো ধরনের ইঞ্জিন হলেও ভারি ইঞ্জিন এবং কার্যকর ইঞ্জিন। সাধারণত .2c [c আলোর গতিবেগ] গতিতে চলে। প্রয়োজনে এই গতিবেগ বাড়িয়ে .6c পর্যন্ত যাওয়া যায়।

লি সিরিজের স্পেসশিপ পরিচালনার জন্যে কোন মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ এনারবিক রোবট কম্পিউটারের সাহায্যে এই কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে।

তবে লি সিরিজের দু'শর উপরের নাম্বার শিপে অবশ্যই একজন মহাকাশ নাবিক লাগে। কারণ এই সিরিজ তৈরি করা হয়েছিল মিল্কিওয়ে গ্যালিয়াম ভেতরের মাইনিং-এর জন্যে। ইলেকট্রন এমিশন টেকনোলজি ছাড়াও এই জাতীয় মহাকাশযানে হাইপার স্পেস জাম্পের ব্যবস্থা আছে। দু'শ সিরিজের এটি দ্বিতীয় মহাশূন্যযান। প্রথমটি লি-২০০ মহাশূন্যে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিধ্বস্ত হবার

কোন কারণ জানা যায় নি। ধারণা করা হয় কোন বিচিত্র কারণে মহাশূন্যযানটি হাইপার স্পেসে জাম্প দেয়। সেট কোঅর্ডিনেট না থাকায় সেটা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়।

এক হাজার টন গ্যালিয়াম ধাতু নিয়ে মহাকাশযান লি ২০১ বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ থেকে মঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে। কনট্রোল প্যানেলে যে বসে আছে তার নাম নিম। বয়স মাত্র ২৭। মেয়েটি তিন মাস আগে মহাকাশ যান পরিচালনার সার্টিফিকেট পেয়েছে। তবে ট্রেনিং পিরিয়ড এখনো শেষ হয় নি। তাকে এক হাজার ঘণ্টার একা ফ্লাইং টাইম সংগ্রহ করতে হবে। নিম এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে দু'শ একুশ ঘণ্টা। আজকের ফ্লাইট শেষ হলে আরো এগারো ঘণ্টা যুক্ত হবে।

নিমের চোখ কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তাকিয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। অটো পাইলট এ দেয়া আছে। আর মাত্র আটত্রিশ মিনিট এগারো সেকেন্ডে সে পৌঁছে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ডিমোসের পাশে। ফিক্সড অরবিট নিয়ে অপেক্ষা করবে মঙ্গল অবতরণ অনুমতির জন্যে। সেখানেও কিছু করতে হবে না। সবই অটো পদ্ধতিতে হবে। এই কাজের জন্যে মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানের একজন এনারবিক রোবটই যথেষ্ট। নিমের পাশের আসনে যে রোবটটি বসে আছে সে সাধারণ মানের নয়। যে কোন মহাকাশযান সে চালাতে পারে। অতি আধুনিক হাইপার ডাইভার চালনার দক্ষতাও তার আছে। এই এনারোবিক রোবটের নাম দৃস। এরা S^2 টাইপ রোবট বলেই তাদেরকে মানুষের মতো আলাদা আলাদা নাম দিয়ে সম্মান দেখানো হয়।

দৃস নিমের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বলল, মিস ক্যাপ্টেন আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি?

নিম বলল, নিশ্চয়ই পার।

দৃস বলল, আপনি কি কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন?

অস্বাভাবিকতাটা কী ধরনের?

আমাদের এই মহাকাশযানের গতি .2c থাকার কথা। প্রোগ্রাম সে রকমই করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় না গতি বাড়ছে?

নিম বিরক্ত গলায় বলল, সে রকম মনে হয় না। পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখ গতি দেখানো আছে।

দৃস বলল, আপনি কি দয়া করে ভিউ ফাইন্ডারের দিকে তাকাবেন। যে কোন দুটি উজ্জ্বল তারার দিকে তাকালেই লক্ষ করবেন আমাদের মহাকাশ যানের গতি .4c র কাছাকাছি।

এটা হতেই পারে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন এটা হতে পারে না। কিন্তু ফুয়েল কনজামশান রেটের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন আমি যা বলছি তা ঠিক।

নিম অতি দ্রুত কয়েকটি রিডিং নিল। রিডিং থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ফুয়েল কনজামশান রিডিং .4c গতিবেগের কথাই বলে। কিন্তু এই গতিবেগে কনট্রোল প্যানেলে লালবাতি জ্বলবে। হাইপার ডাইভ প্রক্রিয়া কার্যকর হবে।

দৃস বলল, ম্যাডাম আপনি ভীত হবেন না।

নিম বলল, আমি ভীত তোমাকে কে বলল ?

দৃস বলল, মহাকাশযানের গতি এখন .5c, ভীত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভীত না হবার জন্যে বলছি।

নিম মঙ্গলের স্পেসশিপ মনিটারিং সেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। যোগাযোগ করা গেল না। দৃস বলল, ম্যাডাম কোনো মহাকাশযানের গতিবেগ যদি .5c-র চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

এই তথ্য আমি জানি।

আপনি যদি জানেন তাহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন কেন ?

তুমি আমাকে কী করতে বলছ ?

আমি আপনাকে ভীত না হবার জন্যে বলছি।

একটু আগেই তুমি বলেছ ভীত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

দৃস বলল, আমার ধারণা যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে সমস্যা আপনার ট্রেনিং-এর অংশ।

নিম বলল, তার মানে কী ?

ট্রেইনি নাবিকদের জন্যে মাঝে মাঝে পরিকল্পিতভাবে সমস্যা তৈরি করা হয়। দেখার জন্যে এরা সমস্যার সমাধান কীভাবে করে।

তোমার এ রকম মনে হচ্ছে ?

আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাটি ট্রেনিং-এর অংশ তার সম্ভাবনা কত ?

.30।

বল কী এত কতো সম্ভাবনা ?

ত্রিশ পারসেন্ট সম্ভাবনা কম না, মিস ক্যাপ্টেন।

৭০ পারসেন্ট সম্ভাবনা যে এটা বাস্তব সমস্যা ?

আপনি যথার্থ বলেছেন। মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়েই চলেছে। ট্রেনিং-এর সময়েও গতিবেগ এত বাড়ানো হয় না। তাছাড়া এটা মাল বোঝাই ফেরি শিপ।

এখন করণীয় কী ?

আপনি খুব ভাল করেই জানেন এখন করণীয়।

তারপরেও তুমি আমাকে সাহায্য করো।

আপনি যদি কূলকিনারা না পান তাহলে ইমার্জেন্সি ব্লু বাটন টিপবেন। ইমার্জেন্সি বাটন টেপার পর আপনার কিছুই করার থাকবে না। কম্পিউটার মিডিসি আপনার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ছোট্ট সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে মিস ক্যাপ্টেন।

সমস্যা কী ?

যে সব ট্রেইনি নাবিক ব্লু বাটন টেপে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। তারা আর কখনো আকাশে উড়তে পারবে না।

আমার কী করা উচিত ?

আপনার ইমার্জেন্সি বাটন টেপা উচিত।

নিম ইমার্জেন্সি বাটনে চাপ দিল। প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কম্পিউটার মিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল।

কম্পিউটার মিডিসি বলছি। আমি মহাকাশযানের কম্পিউটারের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আমরা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগুচ্ছি। অতি দ্রুত ত্বরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। সেটা করা যাচ্ছে না। আয়ন ইঞ্জিনের যে ত্রুটি ধরতে পেরেছি সেই ত্রুটি সারানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

নিম বলল, ত্রুটি কেন দেখা গেল ?

এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে সময় নেই।

তুমি এখন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ ?

কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। খুব অল্প সময়েই এই মহাকাশযান বিধ্বস্ত হবে। কারণ এটি একটি মাল বোঝাই কার্গো। .6c-র গতিবেগ এ নিতে পারবে না।

আমাদের হাতে কত সময় আছে ?

তিন মিনিটেরও কম।

আমার কি কিছু করণীয় আছে ?

না। আপনি পেন্টাথেল থ্রি ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। মৃত্যু হবে ঘুমের মধ্যে।

নিম ঠাণ্ডা গলায় বলল, অতি সুন্দর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।

নিমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হল। ভয়াবহ বিস্ফোরণ।

অঁহকদের ছোট্ট একটা দল দ্রুত কাজ করছে। তাদের কাজ যিনি তদারক করছেন তাকে তারা মহান শিক্ষক নামে ডাকছে। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তারা

মহান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে। এমনও হচ্ছে এক সঙ্গে সবাই কথা বলছে। মহান শিক্ষক একই সঙ্গে সবার কথার জবাব দিচ্ছেন।

মহান শিক্ষক বললেন, তোমরা কি আনন্দ পাচ্ছ ?

একসঙ্গে সবাই বলল, আমরা খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

আমরা কেন বেঁচে আছি ?

আনন্দের জন্যে বেঁচে আছি।

আমরা কেন বেঁচে থাকব ?

আনন্দের জন্যে বেঁচে থাকব।

মৃত্যু কী ?

আনন্দের সমাপ্তি।

তোমরা যে মেয়েটির শরীরবৃত্তিয় ক্ষতি ঠিকঠাক করছ সে কোন্ সম্প্রদায়ের তা কি জানো ?

জানি মহান শিক্ষক। সে মানবসম্প্রদায়ের।

মানবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কী ?

বৈশিষ্ট্যহীন একটি সম্প্রদায়। যাদের শরীরবৃত্তিয় কর্মকাণ্ড অতি দুর্বল।

দুর্বল বলছ কেন ?

এরা অক্সিজেন নির্ভর একটি প্রাণী। অক্সিজেন একটি ভারি গ্যাস। ভারি গ্যাস নির্ভর প্রাণী দুর্বল হয়। হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম নির্ভর প্রাণীরা সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিমান। যেমন আমরা হাইড্রোজেন নির্ভর।

এর বাইরে কী আছে ?

এরা অতি নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধিহীন প্রাণীদের মতোই খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই তারা চিন্তা বা শিক্ষার সময় পায় না। তারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য পরিপাক এবং খাদ্য বর্জনে।

ভাল বলেছ, এদের আর কী ত্রুটি আছে ?

এদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এরা আমাদের মতো যন্ত্রমুক্ত না। মহান শিক্ষক আপনি বলেছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা নিম্নমানের সভ্যতা।

যে কোন বস্তুর উপর নির্ভর সভ্যতাই নিম্ন সভ্যতা। এই সত্যটি সব সময় মনে রাখবে।

মহান শিক্ষক আমরা মনে রাখব।

তোমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বলো।

মেয়েটি যে যন্ত্রযানে করে এসেছে সেটি সম্পূর্ণ ঠিক করা হয়েছে। যন্ত্রযানের মূল ডিজাইনে একটি ত্রুটি ছিল। আমরা সেই ত্রুটিও ঠিক করে দিয়েছি।

কাজটা করে কি আনন্দ পেয়েছ ?

মহান শিক্ষক খুবই আনন্দ পেয়েছি।

মেয়েটির অবস্থা কী ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মেয়েটির শরীরের যে অংশ অক্সিজেনবাহী তরল পরিশুদ্ধ করে সেই অংশই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সামান্য বেশি সময় আমরা নিয়েছি। তার জন্যে আমরা দুঃখিত মহান শিক্ষক।

কাজটা করে কি তোমরা আনন্দ পেয়েছ ?

আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। এখন আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

কী নির্দেশ ?

মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পাবার পর যেন অত্যন্ত আনন্দ পায় তার জন্যে কিছু কি করব ? তার শরীরের কিছু পরিবর্তন ? তার জন্যে মঙ্গলময় হয় এমন কিছু পরিবর্তন ?

অবশ্যই করবে। আমরা উপকারী সম্প্রদায়। আমাদের কাজ দুর্বল সম্প্রদায়ের উপকার করা। তাদের ত্রুটি দূর করা। অতি দুর্বল বুদ্ধিমত্তার প্রাণীরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারে না। মেয়েটির কোন্ কোন্ ত্রুটি সারাবার কথা ভাবছ ?

সে মহাকাশযান চালক। মাত্র দু'টি হাতে এই জটিল মহাকাশযানের সমস্ত বোতাম এবং চক্রের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমরা তাকে আরো বাড়তি দুটা হাত দিতে চাচ্ছি।

অতি উত্তম প্রস্তাব। দাও।

হাতের আঙুলের সংখ্যা পাঁচটির জায়গায় দশটি করে করতে চাচ্ছি।

এটিও ভাল প্রস্তাব। করে দাও।

মানবসম্প্রদায়ের পেছনে কোন চোখ নেই। পেছনে চোখ না থাকার কারণে সে পেছনে দেখতে পারে না। পেছনে দেখার জন্যে তাকে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হয়। আমরা ভাবছি তার পেছনে একটি চোখ দিয়ে দেব।

জায়গাটা ঠিক করেছ ?

ঘাড়ে দিতে চাচ্ছি।

দাও ঘাড়েই দাও। তবে ঘাড়ে একটি চোখ না দিয়ে দু'টা চোখ দাও। মানবসম্প্রদায় সব সময় দু'টা চোখ ব্যবহার করে এসেছে। সেখানে হঠাৎ করে পেছনে একটা চোখ তার পছন্দ নাও হতে পারে।

ঠিক আছে মহান শিক্ষক, আমরা পেছনেও দু'টা চোখ দিয়ে দেব।

আর কিছু কী ভাবছ ?

আপনার অনুমতি পেলে আরেকটি ছোট্ট পরিবর্তন করা যায়।

বলো কী পরিবর্তন ?

মানবসম্প্রদায়ের গায়ের চামড়া সবচে' দুর্বল। আমরা কি একটি ধাতব আবরণ দিয়ে দেব।

না। তার প্রয়োজন দেখি না। চামড়া দুর্বল হলেও সে স্পেস স্যুট পরে। এটি যথেষ্ট মজবুত। গায়ের চামড়া ছাড়া বাকি পরিবর্তনগুলি করে দাও।

মহান শিক্ষক।

বলো।

মেয়েটি যখন তার শরীরের পরিবর্তনগুলি দেখবে তখন সে খুবই আনন্দ পাবে।

অবশ্যই আনন্দ পাবে।

মেয়েটির আনন্দের কথা ভেবেই আমাদের আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ মানেই বেঁচে থাকা। আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের সবার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

ধন্যবাদ মহান শিক্ষক।

নিমের মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। সে হতভম্ব হয়ে তার চারটি হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দৃস।

নিম চোখ তুলে ছায়ার দিকে তাকাল।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ভয়ংকর অঁহকদের হাতে পড়েছিলাম।

নিমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে এখনো জানে না তার ঘাড়েও দুটা চোখ আছে। সেই চোখ দিয়েও পানি পড়ছে।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন কাঁদবেন না। আপনার জন্যে একটি ভাল সংবাদ আছে।

নিম ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভাল সংবাদটি কী ?

দৃস বলল, আপনার ঘাড়ে যে দু'টি চোখ আছে, সেই চোখ দু'টা আসল চোখের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর।

জাদুকর

আজ হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার অংক খাতা দিয়েছে।

বাবলু পেয়েছে সাড়ে আট। শুধু তাই নয়, খাতার উপর লাল পেনসিল দিয়ে ধীরেন স্যার বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন, 'গরু'। কী সর্বনাশ !

বাবলু খাতা উল্টে রাখল। যাতে 'গরু' লেখাটা কারো চোখে না পড়ে। কিন্তু ধীরেন স্যার মেঘস্বরে বললেন, 'এই, বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়া।'

বাবুল বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল।

'তোর অংক খাতায় কী লিখে দিয়েছি সবাইকে দেখা।'

সে মুখ কালো করে সবাইকে দেখাল খাতাটা। ফার্স্ট বেঞ্চে বসা কয়েকজন ভ্যাকভ্যাক করে হেসে ফেলল। ধীরেন স্যার গর্জন করে উঠলেন। 'এ্যাই, কে হাসে ! মুখ সেলাই করে দেব।'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ধীরেন স্যারকে সবাই যমের মতো ভয় করে। আড়ালে ডাকে 'যম স্যার'। ফার্স্ট বেঞ্চে আবার একটু খিকখিক শব্দ হল। ধীরেন স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন। 'আরেকবার হাসির শব্দ শুনলে চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব। নাট্যশালা নাকি ? এ্যাঁ ?'

ক্লাস পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। ধীরেন স্যার থমথমে গলায় বললেন, 'এ্যাই বাবলু, তুই ঘন্টা না পড়া পর্যন্ত বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকবি।'

বাবলু উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বেঞ্চির উপর এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা তেমন কিছু না। কিন্তু বাসায় ফিরে বাবাকে কী বলবে এই ভেবেই বাবলুর গায়ে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। বাবা মোটেই সহজ পাত্র নন। ধীরেন স্যারের মতো মাস্টারও তাঁর কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাড়িতে আজ ভূমিকম্প হয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য। বাবলু এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও কুলকুল করে ঘামতে লাগল।

বাবলু ভেবে পেল না অংকের মতো একটা ভয়াবহ জিনিস কী করে পড়াশুনার মধ্যে ঢুকে গেল। কী হয় অংক শিখে ? তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বাঁদরের উঠবার দরকারটা কী ? আচ্ছা ঠিক আছে, উঠছে উঠে পড়ুক। কিন্তু প্রথম মিনিটে উঠে দ্বিতীয় মিনিটে আবার পিছলে পড়বার প্রয়োজনটা কী ? বাবলু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

স্কুল ছুটি হল পাঁচটায়। বাবলু বাড়ি না গিয়ে স্কুলের বারান্দায় মুখ কালো করে বসে রইল। স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বলল, 'বাড়িত যাও ছোট ভাই।'

বাবলু বলল, 'আমি আজকে এইখানেই থাকব।'

'কও কী ভাই ! বিষয় কী ?'

'বিষয় কিছু না। তুমি ভাগো।'

আনিস মিয়া একগাল হেসে বলল, 'পরীক্ষায় ফেইল করছ, কেমন ? বাড়িত থাইক্যা নিতে না আসলে যাইতা না। ঠিক না ?'

আনিস মিয়া দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বাবলু স্কুল থেকে ছুটে বাইরে চলে আসল। সরকার বাড়ির জামগাছের নিচে বসে রইল একা একা।

জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। বাবলুকে ভয় দেখানোর জন্যেই হয়ত অসংখ্য ঝিঁঝি এক সঙ্গে ডাকতে লাগল। বিলের দিক থেকে শব্দ আসতে লাগল, 'হুঅ হুঅ'। ডানপাশের ঝোপ কেমন যেন নড়ে উঠল। বাবলু শার্টের লম্বা হাতায় ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল।

'এই ছেলে, কাঁদছ কেন ?'

অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাবলুর মনে হল লম্বামত একজন লোক ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে ভারি একটা ব্যাগ জাতীয় কিছু। পিঠেও এরকম একটা বোঁচকা ফিতা দিয়ে বাঁধা।

'এই খোকা, কী হয়েছে ?'

বাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি অংকে সাড়ে আট পেয়েছি।'

'তাই নাকি ?'

'জ্বি। আর ধীরেন স্যার আমার খাতার উপর লিখেছেন—গরু।'

বাবলু খাতাটা বের করে লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লোকটি এগিয়ে এসে খাতাটি নিল। সে বেশ লম্বা। এই অন্ধকারেও প্রকাণ্ড বড় একটা চশমা পরা থাকায় প্রায় সমস্তটা মুখ ঢাকা পড়ে আছে।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, 'খাতার উপর গরু লেখাটা অন্যায় হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির উপর সরাসরি কটাক্ষ করা হয়েছে। তার উপর এত বড় বড় করে লেখার প্রয়োজনই বা কী ? ছোট করে লিখলেই হত।'

বাবলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

'উহুঁ, কাঁদবে না। কাঁদার সময় নয়। কী করা যায় এখন তাই নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।'

বাবলু ধরা গলায় বলল, 'আমি স্কুলেও যাব না। বাসায়ও ফিরে যাব না। বাকি জীবনটা জামগাছের নিচে বসে কাটাব। না, জাহাজের খালাসি হয়ে বিলাত চলে যাব।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না। কিন্তু চট করে কিছু-একটা করা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তোমার নাম তো জানা হল না।'

'আমার নাম বাবলু। ক্লাস সেভেনে পড়ি। আপনি কে ?'

'ইয়ে আমার নাম হল গিয়ে হইয়েৎসুঁন।'

'কী বললেন ?'

'আমার নামটা একটু অদ্ভুত, আমি বিদেশী কি না !'

'কী করেন আপনি ?'

'আমি একজন পর্যটক। আমি ঘুরে বেড়াই।'

বাবলু কৌতূহলী হয়ে বলল, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

'আসো, তোমাকে দেখাচ্ছি।'

হইয়েৎসুঁন আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ঐ যে দেখছ ছায়া ছায়া, ওইটা হচ্ছে ছায়াপথ। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। স্প্রিংয়ের মতো। এর মাঝামাঝি একটি সৌরমণ্ডল আছে। আমরা তাকে বলি 'নয়ুঁততিনি' তার ন'নম্বর গ্রহটিতে আমি থাকতাম।'

বাবলু একটু সরে বসল। পাগল নাকি লোকটা ! কথা বলছে দিব্যি ভাল মানুষের মতো।

'বুঝলে বাবলু, বলতে গেলে আমরা বেশ কাছাকাছি থাকি। পৃথিবীও কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে পড়েছে। হা হা হা।'

'আপনারাও বুঝি বাংলায় কথা বলেন ?'

'উঁহু। তোমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি কারণ আমার সঙ্গে একটি অনুবাদক যন্ত্র আছে।'

সে ইশারা করে গোলাকৃতি একটি বাক্স দেখাল। বাক্সটি তার কাঁধের কাছে ঝুলছে। মশার আওয়াজের মতো পিনপিন একটি শব্দ আসছে সেখান থেকে।

'এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং সে ভাষায় কথা বলা যায়। প্রাণীদের মস্তিষ্কের নিওরোনে বিভিন্ন ধ্বনির যে লাইব্রেরি আছে এবং শব্দবিন্যাসের যে সমস্ত ধারা তা এই যন্ত্রটি ধরতে পারে।'

বাবলুর একটু ভয় ভয় লাগল। লোকটি বলল, 'এই যে চারদিকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে এরা কী বলছে তা তুমি বুঝতে পারবে যদি যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেই, দেব ?'

বাবলু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দিন, কিন্তু ব্যথা লাগবে না তো ?'

'উঁহু। মাথা খানিকটা ভোঁ-ভোঁ করবে হয়ত। দিয়েই দেখ।'

হইয়েৎসুঁন যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধে বসিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, ঝিঁঝি পোকাগুলো কথা বলছে।

'পোকা চাই। খাবারের জন্যে পোকা চাই।'

এ লোক দু'টি যাচ্ছে না কেন ? কী করছে, কী করছে ?'

'এরা দুজন কী করছে ?'

'পোকা চাই। পোকা চাই। পোকা চাই।'

বাবলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকটি বলল, 'মানুষ যেভাবে কথা বলে এরা কিন্তু সেভাবে কথা বলে না। ডানার সঙ্গে ডানা ঘসে শব্দ করে। ভাবের আদান-প্রদানের কত অদ্ভুত ব্যবস্থাই না প্রাণিজগতে আছে !

বাবলু তার কথায় কান দিচ্ছিল না। কারণ, সে পরিষ্কার শুনতে পেল জামগাছের একটি পাখির বাসা থেকে ফিসফিস করে কথাবার্তা হচ্ছে।

'আহা, এই লোক দু'টি কি বকবক শুরু করেছে? ঘুমুতে দেবে না নাকি?'

'ঠিক বলেছ। মানুষদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এগুলো মহাবোকা।'

বলতে বলতে পাখিগুলো খিকখিক করে হাসতে লাগল।

লোকটি বলল, 'বাবলু যন্ত্রটি এবার খুলে ফেলা যাক। তোমার অভ্যাস নেই তো, মাথা ধরে যাবে।'

বাবলু বলল, 'আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে কথা বলি ওরা আমার কথা বুঝতে পারবে?'

'দু' একটা কথা বুঝতে পারে। তবে বেশির ভাগই বুঝবে না। ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। অবশ্যি সবার না। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। যেমন ধরো তিমি মাছ।'

'তিমি মাছ বুদ্ধিমান?'

'অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুধু হাত নেই বলে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে না। ডলফিনও খুব বুদ্ধিমান। ওদের যদি হাত থাকত তাহলে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত।'

'ওদের হাত নেই কেন?'

'প্রকৃতির খেয়াল। প্রকৃতির খেয়ালিপনার জন্যে তিমি এবং ডলফিনের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদেরও পশুর মতো জীবনযাপন করতে হচ্ছে।'

হইয়েৎসুঁন একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধ থেকে নিয়ে নিল।

'এবার তোমার ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। কী ঠিক করলে? জাহাজের খালাসি হবে?'

'না।'

'তবে কি? অন্ধকারে জামগাছের নিচে বসে থাকবে?'

'উঁহু। আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি।'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের চলাফেরার জন্যে রকেট বা স্পেসশিপ নেই। আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই সরাসরি বস্তু স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়। তোমাকে দিয়ে তা হবে না। তাছাড়া আমি এখন যাব তোমাদের বৃহস্পতি গ্রহের একটি চাঁদে। তার নাম হচ্ছে টিটান। সেখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে টিটানে যাব।'

'একেবারেই অসম্ভব। সে জায়গাটা বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসে ভরপুর। তার উপর আছে সালফার ডাই-অক্সাইড। আমার তাতে কিছু হবে না। কিন্তু তুমি মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

বাবলু মুখ কালো করে চুপ করে রইল। লোকটি শান্তস্বরে বলল, 'তুমি বরং ভালমতো পড়াশোনা শুরু করো। কারণ, তোমাদের এখানে অনেক কিছুই শেখার আছে। অংকে সাড়ে আট পেলে হবে না।'

বাবলু কোন উত্তর দিল না। লোকটি বলল, 'মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। ইচ্ছে করলেই এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।'

বাবলু মুখ কালো করে বলল, 'আমি অংক-টংক কিছু শিখতে চাই না।'

হইয়েৎসুঁন হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'মানুষেরা প্রাণী হিসেবে কিন্তু খুব অদ্ভুত। এরা প্রায় সময়ই যা ভাবে তা বলে না। মুখে এক কথা বলে কিন্তু মনের কথা ভিন্ন। তুমি মনে মনে ভাবছ এখন থেকে খুব মন দিয়ে অংক শিখবে যাতে ও ধরনের যন্ত্র বানাতে পার কিন্তু মুখে বলছ অন্য কথা। ঠিক না?'

বাবলু থেমে থেমে বলল, 'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'আমার কাছে ছোটখাটো একটা কমুনিকেটর যন্ত্র আছে। তা দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীরা কী ভাবছে তা অনেক দূর থেকে টের পাওয়া যায়। যেমন ধরো, যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার বাবা এবং তোমার ধীরেন স্যার এই মুহূর্তে কী ভাবছেন। তাঁরা দু'জনেই হারিকেন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তোমাদের স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বাসায় গিয়ে খবর দেয়ার পর থেকেই তোমার বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। তোমার বাবার মনের অবস্থাটা বুঝতে চাও?'

বাবলু মাথা নাড়ল, সে বুঝতে চায়। লোকটি যন্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, বাবা মনে মনে বলছেন, আমার পাগলা ছেলেটা কোন্ অন্ধকারে একা একা বসে আছে কে জানে!

সাড়ে আট পেয়েছে তো কী হয়েছে? আহা বেচারা! আমার ভয়ে বাড়িও আসতে পারছে না। নাহ্ আর কোনদিন রাগারাগি করব না। ভাবতে ভাবতে বাবা চোখ মুছলেন।

ধীরেন স্যারও ঠিক একই রকম কথা ভাবছে। আহারে বাচ্চা ছেলেটা কোথায় না কোথায় বসে আছে অন্ধকারে। খাতায় গরু লেখাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। সেই লজ্জাতেই বাড়ি যাচ্ছে না। নাহ্, ছাত্রদের সঙ্গে আরেকটু ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। আর এই রকম রাগারাগি করব না। বাবলুটাকে রোজ এক ঘণ্টা করে অংক শেখাব।

হইয়েৎসুঁন হাসতে হাসতে বলল, 'কী, শুনলে তাদের মনের কথা?'

'হুঁ।'

'জাহাজের খালাসি হবার পরিকল্পনা এখনো আছে?'

'জ্বি না।'

'ভাল। খুব ভাল। তা বাবলু সাহেব, আমার তো এখন যেতে হয়।'

'আরেকটু বসুন।'

'না, আর বসা যাচ্ছে না। তোমার বাবা আর তোমার স্যার এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখলে ব্যাপারটা ভাল হবে না। যাই তাহলে, কেমন?'

তার কথা শেষ হবার আগেই বাবাকে এবং ধীরেন স্যারকে দেখা গেল। দপ্তরি আনিস মিয়া একটি হারিকেন হাতে আগে আগে আসছে। বাবলু ভিন গ্রহের লোকটিকে আর দেখতে পেল না।

বাবা এসেই প্রচণ্ড একটা চড় বসালেন। রাগী গলায় বললেন, 'এই বয়সে বাঁদরামি শিখেছিস। বাড়ি না গিয়ে গাছের নিচে বসে ধ্যান করা হচ্ছে। তোর পিঠের ছাল তুলব আজকে।'

ধীরেন স্যার থমথমে স্বরে বললেন, 'খারাপ পরীক্ষা হয়েছে—কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসবি তা না, সাপখোপের আড্ডার মধ্যে এসে বসা। আগামীকাল তুই সারা পিরিয়ড আমার ক্লাসে নিলডাউন হয়ে থাকবি। গরু কি আর সাধে লিখেছি?'

বাবলু এঁদের কথায় একটুও রাগ করল না। কারণ, এখন সে নিশ্চিত জানে এসব তাদের মনের কথা নয়। তাছাড়া সে হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখল বাবার চোখ ভেজা। কাঁদতে কাঁদতেই তাকে খুঁজছিলেন।

কুদ্দুসের একদিন

মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস পত্রিকা অফিসে কাজ করে।

বড় কাজ না, ছোট কাজ—চা বানানো, সম্পাদক সাহেবের জন্যে সিগারেট এনে দেয়া। ড্রাইভার গাড়িতে তেল নেবে সঙ্গে যাওয়া, যাতে তেল চুরি করতে না পারে। এই ধরনের টালটু-ফালটু কাজ।

কুদ্দুসের বয়স বাহান্ন। বাহান্ন থেকে ষোল বাদ দিলে থাকে ছত্রিশ। ষোল বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর (পুরো পরীক্ষা দিতে পারে নি, ইংরেজি প্রথম পত্র পর্যন্ত দিয়েছিল) গত ছত্রিশ বছর ধরে সে নানান ধরনের চাকরি করেছে। সবই টালটু-ফালটু চাকরি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কিছুদিন সে একটা চোরের এ্যাসিসট্যান্টও ছিল। নিতান্ত ভদ্র ধরনের চোর। সুন্দর চেহারা। স্যুট পরে ঘুরে বেড়াতো। শান্তিনিকেতনি ভাষায় কথা বলতো। বোঝার কোন উপায়ই নেই লোকটা বিরাট চোর। কুদ্দুস যেদিন বুঝতে পেরেছে সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে গিয়ে মসজিদের খতিবের মাধ্যমে তওবা করেছে। চোরের সঙ্গে বাস করে চারশ টাকার মতো জমিয়েছিল, তার অর্ধেক মসজিদের দানবাক্সে ফেলে দিয়েছে। ইচ্ছা ছিল পুরোটাই দিয়ে দেবে, না খেয়ে থাকতে হবে বলে দিতে পারে নি।

গত ছত্রিশ বছরে যে সব চাকরি কুদ্দুস করেছে তার তুলনায় পত্রিকা অফিসের চাকরিটা শুধু ভাল না, অসম্ভব ভাল। দেশ-বিদেশের টাটকা খবরের সঙ্গে যুক্ত থাকার মতো সৌভাগ্য বাংলাদেশের ক'টা মানুষের আছে? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পড়া যাচ্ছে। এই সৌভাগ্য তো সহজ সৌভাগ্য না, জটিল সৌভাগ্য।

প্রতিদিন সকাল বেলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে নিজের সৌভাগ্যে কুদ্দুস নিজেকেই ঈর্ষা করে। যুবক বয়সে সে একবার গণক দিয়ে হাত দেখিয়েছিল। গণক বলেছিল—শেষ বয়সটা আপনার মহাসুখে কাটবে। বিরাট সম্মান পাবেন। পত্রিকা অফিসে কাজটা পাবার পর কুদ্দুসের ধারণা গণক মোটামুটি সত্যি কথাই বলেছে। শুধু বিরাট সম্মানের জায়গায় একটু ভুল করেছে। তা কিছু ভুল-ত্রুটি তো হবেই।

কুদ্দুস রাতে পত্রিকা অফিসেই ঘুমায়। কোন এক কোনা-কানা খুঁজে নিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ফেললে মশার হাত থেকে মুক্তি। মেস করে থাকতে হচ্ছে না বলে বেশ কিছু টাকা বেঁচে যাচ্ছে। বেতন যা পাওয়া যায় তাতে আলাদা ঘর ভাড়া করে বা মেস করে থাকা সম্ভব না। তার দরকারই বা কী? সে একা মানুষ। এত শৌখিনতার তার দরকার কী?

পত্রিকা অফিসে কাজ করতে এসে তার গত তিন বছরে দশ হাজার পাঁচশ' টাকা জমে গেছে। অকল্পনীয় একটা ব্যাপার। টাকাটা পত্রিকার সম্পাদক মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছে জমা আছে। চাইলেই উনি দেন। কুদ্দুসের টাকার কোন দরকার নেই, তবু মাঝে মাঝে মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে টাকাগুলি চেয়ে আনে। সারাদিন হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা ফেরত দিয়ে আসে। টাকা হাতে নিরিবিলি বসে থাকতে তার ভাল লাগে। নিজেকে রাজা-বাদশার মতো মনে হয়।

আজ সকালে তেমন কোন কারণ ছাড়াই কুদ্দুসের নিজেকে রাজা-বাদশার মতো মনে হতে লাগল। সে চায়ের কাপ এবং পত্রিকা হাতে বসেছে। পা নাচাতে নাচাতে কাগজ পড়ছে। মজার মজার খবরে আজ কাগজ ভর্তি। খবরগুলি পড়ে ফেললেই তো মজা শেষ হয়ে গেল, কাজেই কুদ্দুস প্রথমে শুধু হেড লাইনে চোখ বুলাবে। ভেতরের ব্যাপারগুলি ধীরেসুস্থে পড়া যাবে। তাড়া কিছু নেই। সম্পাদক সাহেব চলে এসেছেন। তাঁকে প্রথম দফায় চা দেয়া হয়েছে, তিনি ঘণ্টাখানিকের ভেতর আর ডাকবেন না। কুদ্দুস শিস দিয়ে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করতে লাগল—পাগল মন...। গানটা খুব হিট করেছে।

কুদ্দুস পত্রিকার তিন নাম্বার পাতাটা খুলল। "আজকের দিনটি কেমন যাবে" তিন নম্বর পাতায় ছাপা হয়। কুদ্দুস এই অংশটা প্রথম পড়ে। তার ধনু রাশি। তার ব্যাপারে 'আজকের দিনটি কেমন যাবে'তে যা লেখা হয় সব মিলে যায়। একবার লেখা হল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। সেদিন অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুড়ো আঙুলের নখের অর্ধেকটা ভেঙে গেল।

আজকের রাশিফলে লেখা—

ধনু রাশির জন্যে আজ যাত্রা শুভ। ভ্রমণের যোগ আছে।

কিঞ্চিত অর্থনাশের আশঙ্কা। শত্রুপক্ষের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর কারণে সম্মানহানির আশঙ্কা।

সম্মানহানির আশংকায় কুদ্দুস খানিকটা চিন্তিত বোধ করছে। সম্মান বলতে গেলে কিছুই নেই। যা আছে তাও যদি চলে যায় তো মুশকিল। পত্রিকার সব হেড লাইন শেষ করবার আগেই কুদ্দুসের ডাক পড়ল। মতিয়ুর রহমান সাহেবের ইলেকট্রিক বেল ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। কুদ্দুস এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে তার কাপ থেকে চা পুরোটা ছলকে গায়ে পড়ে গেল। শার্টটা নতুন কেনা। আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার পরা হয়েছে। সাদা কাপড়ের চায়ের রঙ

সহজে ওঠে না। এক্ষুণি ধুয়ে ফেলতে পারলে হত। সেটা সম্ভব না। মতিয়ুর রহমান স্যার ডেকেছেন। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা যাবে না। কুদ্দুস প্রায় ছুটে সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকল।

মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, তোর খবর কী রে কুদ্দুস ?

কুদ্দুস বিনয়ে মাথা নিচু করে বলল, খবর ভাল স্যার।

'একটা কাজ করে দে তো—এই চিঠিটা নিয়ে যা। নাম-ঠিকানা লেখা আছে। হাতে হাতে দিয়ে আসবি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'জাভেদ সাহেব ইস্টার্ন প্লাজার নয় তলায় থাকেন। ইস্টার্ন প্লাজা চিনিস তো ?'

'জ্বি স্যার, চিনি।'

'খুবই জরুরি চিঠি। হাতে হাতে দিবি। উনাকে বলবি আমাকে টেলিফোন করতে। আমি অফিসেই থাকব। নে টাকাটা নে, রিকশা করে চলে যা।'

মতিয়ুর রহমান সাহেব কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে কুদ্দুসের হাতে দিলেন। কুদ্দুস টাকা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হল। রওনা হবার আগে শার্টটা পানি দিয়ে একবার ধুয়ে ফেলতে হবে। কতক্ষণের মামলা ? কুদ্দুস বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, আবার মতিয়ুর রহমান সাহেবের বেল বেজে উঠল। আবারও কুদ্দুস ছুটে গিয়ে ঢুকল। সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকলে কুদ্দুসের মাথা ঠিক থাকে না।

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'রিকশায় যাওয়ার দরকার নেই, দেরি হবে। তুই এক কাজ কর, আমার গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'রিকশা ভাড়ার টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কুদ্দুস কুড়ি টাকার নোটটা বের করল। মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, টাকা ফেরত দিতে হবে না। তুই দেরি করিস না। চলে যা।

শার্ট না ধুয়েই কুদ্দুস গাড়িতে উঠল। তার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। শার্টের এই রঙ তো আর উঠবে না। নতুন শার্ট। মাত্র তিনবার পরা হয়েছে। গাড়িতে উঠে তার আরেকটু মন খারাপ হল—আবার একটা ভুল করা হয়েছে। পত্রিকাটা সাথে নিয়ে এলে হত। গাড়িতে যেতে যেতে কাগজ পড়ার আলাদা

একটা মজা আছে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনার গরম খবর আছে। আজকের দিনটা ভুল দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকের তারিখটা কত যেন ? ১৪ এপ্রিল ১৯৯৬, তারিখটা তার জন্যে শুভ না।

লিফটে কুদ্দুস একা। লিফটম্যান তাকে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে বলেছে—আট তলায় গিয়ে থামবে। নেমে যাবেন। পারবেন না ? কুদ্দুস বলেছে, পারব। তার কথা শেষ হবার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। লিফট চলছে না। স্থির হয়ে আছে। একটা লালবাতি জ্বলছে আর নিভছে। মাথার উপর শাঁশাঁ শব্দে ফ্যান ঘুরছে। অদ্ভুত ফ্যান। গায়ে কোন বাতাস লাগছে না। লিফটের ভেতর বিরাট একটা আয়না লাগানো। আয়নার দিকে তাকিয়ে কুদ্দুসের মন খারাপ হয়ে গেল। শার্টের দাগ বিশ্রীভাবে দেখা যাচ্ছে। এখন লন্ড্রিতে দিয়েও লাভ হবে না। টাকা খরচ হবে অথচ দাগ উঠবে না। আচ্ছা, লিফট্টা চলছে না, ব্যাপারটা কী ? লিফটম্যান মনে হয় শুধু দরজা বন্ধ করার বোতাম টিপেছে, ওপরে উঠার বোতাম টিপতে ভুলে গেছে। সে কি সাত লেখা বোতামটা টিপবে ? কুদ্দুস মনস্থির করতে পারছে না। এ কী বিপদে পড়া গেল ! আগে জানলে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে যেত। আট তলায় ওঠা এমন কোন ব্যাপার না।

পাগল মন গানটার প্রথম লাইনটা কুদ্দুস মনে মনে কয়েকবার গাইল। ইচ্ছে করলে শব্দ করেও গাইতে পারে। লিফটে সে একা। লিফটের ভেতরে গান গাইলে কি বাইরে থেকে শোনা যায় ?

হোঁস করে একটা শব্দ হয়ে লিফটের ভেতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি কি চলে গেল ? কুদ্দুসের বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। ঢাকা শহরে কারেন্টের কোন ঠিকঠিকানা নেই। একবার চলে গেলে কখন আসবে কে জানে। লিফটের ভেতর কতক্ষণ থাকতে হবে ? লিফটম্যান যে গেছে তারও ফেরার নাম নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজ-খবর করবে না ? এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাল না। মতিয়ুর রহমান স্যারের হাতে পড়ত—এক প্যাঁচে ঠিক করে দিত।

কুদ্দুস খুব সাবধানে লিফটের দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিতে সাহসে কুলুচ্ছে না। কল-কবজার কারবার—কী থেকে কী হয় কে জানে ? গরম লাগছে। আবার দমবন্ধও লাগছে। কুদ্দুস বেশ উঁচু গলায় ডাকল, লিফটম্যান ব্রাদার, হ্যালো ! হ্যালো !

কতক্ষণ পার হয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। কুদ্দুসের মনে হল ঘণ্টাখানেকের কম না। বেশিও হতে পারে। সারাদিনে যদি কারেন্ট না আসে

তাহলে কী হবে ? লিফটের ভেতর থাকতে হবে ? কুদ্দুস লিফটের দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিল আর তাতেই লিফট চলতে শুরু করল। কারেন্ট ছাড়াই কি চলছে ? লিফটের ভেতরটা ঘোর অন্ধকার। কারেন্ট এলে তো বাতি-ফাতি জ্বলত। কিছুই জ্বলেনি। কুদ্দুস মনে মনে বলল, চলুক, কারেন্ট ছাড়াই চলুক। চলা দিয়ে হচ্ছে কথা।

শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। কুদ্দুসের শরীর কাঁপছে। লিফট কি এত দ্রুত ওঠে ? এ তো মনে হচ্ছে বাড়িঘর ফুঁড়ে আসমানে উঠে যাবে। এত দ্রুত লিফট উঠছে যে কুদ্দুসের পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। যে ভাবে উঠছে তাতে ১০০ তলা ছাড়িয়ে যাবার কথা। এটা মাত্র বার তলা বিল্ডিং। কুদ্দুস আসহাবে কাহাফের আটটা নাম মনে করার চেষ্টা করছে। এদের নাম পড়ে বুকে ফুঁ দিলে মহা বিপদ দূর হয়। বহু পরীক্ষিত। এরা আটজন দাকিয়ানুস বাদশাহর সময়ে পর্বতের গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এরা ঘুমন্ত থাকবে। এদের সাতজন মানুষ, একটা কুকুর। সাতজন মানুষের নাম মনে পড়ছে, কুকুরটার নাম মনে পড়ছে না।

মাকসেলাইনিয়া
মাসলিনিয়া
ইয়ামলিখা
মারনুশ
দাবারনুশ
শযনুষ
কাফশাততাইউশ

কুকুরটার নাম কী ?

কুকুরের নাম মনে করতে না পারলে কোন লাভ হবে না। কুকুরের নামশুদ্ধ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। কুদ্দুস প্রাণপণে কুকুরটার নাম মনে করার চেষ্টা করছে। চরম বিপদে কিছুই মনে পড়ে না।

শোঁ শোঁ শব্দ বাড়ছেই। শব্দটা এখন কানের পর্দার ভেতরে হচ্ছে। কুদ্দুসের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে লিফটের মেঝেতে বসে পড়ল। আর তখনই কুকুরটার নাম মনে পড়ল—কিতমীর !

●

কিতমীর নাম পড়ার পরপরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে লিফট থেমে গেল। লিফটের দরজা খুলতে শুরু করল। দরজা পুরোপুরি খোলার জন্যে কুদ্দুস

অপেক্ষা করল না। সে বসা অবস্থা থেকেই ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়ল। বের হয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। সে কোথায় এসেছে ? ব্যাপারটা কী ? লিফট থেকে বের হওয়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। যে ভাবে লাফ দিয়ে সে লিফট থেকে বের হয়েছে তার উচিত ঠিক একইভাবে লাফ দিয়ে আবার লিফটে ঢুকে যাওয়া। সে পেছনে তাকালো। পেছনে লিফট নেই। লিফট কেন কোন কিছুই নেই, চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। সে নিজেও বসে আছে শূন্যের উপর। মাথার উপর আকাশ থাকার কথা। আকাশ-ফাকাশ কিচ্ছু নেই। তার চারপাশে কুয়াশার মতো হালকা ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার রঙ ঈষৎ গোলাপি। কুদ্দুস মনে মনে বলল, ইয়া গাফুরুর রাহিম। এ কী বিপদে পড়লাম ! ও আল্লাহপাক, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো। হে গাফুরুর রাহিম ! একবার যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাই তাহলে শুক্রবারে তারা মসজিদে সিন্নি দেব। এবং বাকি জীবনে আর লিফটে চড়ব না। দরকার হলে ৫০০ তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠব। আমার উপর দয়া করো আল্লাহপাক।

কুদ্দুস চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে তিনবার কুলহুআল্লাহ পড়ে বুকে ফুঁ দেবে। তারপর চোখ খুলবে। তাতে যদি কিছু হয়। কোন দোয়াই প্রথম চোটে মনে পড়ছে না। হায়, এ কেমন বিপদ !

২

কুদ্দুস চোখ খুলল। অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে চারপাশে ছিল গোলাপি রঙের ধোঁয়া, এখন বেগুনি ধোঁয়া। আগে কোন শব্দ ছিল না। এখন একটু পর পর সাপের শিসের মতো তীব্র শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শরীরের ভেতরে ঢুকে কলজে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এরচে' তো আগেই ভাল ছিল। কুদ্দুস ভেবে পাচ্ছে না সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলবে কি না। চোখ বন্ধ রাখা আর খোলা তো একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে সে মারা গেছে? হার্টফেল করে লিফটের ভেতরই তার মৃত্যু হয়েছে? সে যে জগতে আছে সেটা আর কিছুই না, মৃত্যুর পরের জগৎ। এ রকম তো হয়। কিছু বোঝার আগেই কত মানুষ মারা যায়। সেও মারা গেছে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জিন্দা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর মানকের-নেকের আসবে, তাকে সোয়াল-জোয়াব শুরু করবে—"তোমার ধর্ম কী?" "তোমার নবী কে?" এইসব জিজ্ঞেস করবে। এ কী বিপদ!

'তুমি কে?'

কুদ্দুস চমকে চারদিকে তাকালো, কাউকে সে দেখতে পেল না। প্রশ্নটা সে পরিষ্কার শুনলো। তাকেই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে। কেমন গম্ভীর ভারি গলা। শুনলেই ভয় লাগে।

'এই, তুমি কে?'

কুদ্দুস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্যার, আমার নাম কুদ্দুস।

'তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না। লিফটের ভিতরে ছিলাম। লাফ দিয়ে বের হয়েছি। বাইর হওয়া উচিত হয় নাই। আপনে স্যার এখন একটা ব্যবস্থা করেন। গরিবের একটা রিকোয়েস্ট।'

'আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি এখানে এলে কী করে?' ●

'স্যার আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন। কোথায় আসছি নিজেও জানি না। কীভাবে আসছি তাও জানি না। লিফটের দরজা ভালমত খোলার আগেই

লাফ দিয়েছিলাম। এটা স্যার অন্যায় হয়েছে। আর কোনদিন করব না। সত্যি কথা বলতে কী—আর কোনদিন লিফটেও চড়ব না। এখন স্যার ফেরত পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করেন। আমি খাস দিলে আল্লাহপাকের কাছে আপনার জন্যে দোয়া করব।'

'তোমার কোন কিছুই তো আমরা বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হল—মাত্রা কী করে ভাঙলে ? মাত্রা ভেঙে এখানে এলে কীভাবে ?'

'স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কোন কিছুই ভাঙি নাই। যদি কিছু ভেঙে থাকে আপনা আপনি ভাঙছে। তার জন্যে স্যার আমি ক্ষমা চাই। যদি বলেন, পায়ে ধরব। কোন অসুবিধা নাই।'

'তুমি তো বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছ। তুমি কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী ঘটেছে ?'

'জ্বি না।'

'তুমি ত্রি-মাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করেছ। এই কাণ্ডটা কীভাবে করেছ আমরা জানি না। আমরা জানার চেষ্টা করছি।'

'স্যার, ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

'তোমার কথাবার্তাও তো আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। গোলাম হয়ে থাকব মানে কী ?'

কুদ্দুস ব্যাকুল গলায় বলল, স্যার, গোলাম হয়ে থাকব মানে হল স্যার আপনার সার্ভেন্ট হয়ে থাকব। আমি মুখ দেখতে পারছি না। মুখ দেখতে পারলে ভয়টা একটু কমতো।'

'আমরা ইচ্ছা করেই তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি না। মুখ দেখালে ভয় আরো বেড়ে যেতে পারে।'

'স্যার, যে ভয় লিফটের ভিতর পেয়েছি, এরপর আর কোন কিছুতেই কোন ভয় পাব না। রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার ভেতর ঢুকে রয়েল বেঙ্গলকে চুমু খেয়ে আসব। তার লেজ দিয়ে কান চুলকাব, তাতেও স্যার ভয় লাগবে না।'

'তোমার নাম যেন কী বললে—কুদ্দুস ?'

'জ্বি স্যার, কুদ্দুস।'

'একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করো—তুমি হচ্ছ ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ। তোমাদের জগতের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটি মাত্রা আছে। এই দেখে তোমরা অভ্যস্ত। আমরা চার মাত্রার প্রাণী। চার মাত্রার প্রাণী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই।'

'স্যার, আপনি আমার মতো বাংলা ভাষায় কথা বলতেছেন, এইটা শুনেই মনে আনন্দ পাচ্ছি। আপনার চেহারা যদি খারাপও হয়, কোন অসুবিধা নাই, চেহারার উপর তো স্যার আমাদের হাত নাই। এটা হল বিধির বিধান।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে দেখ।'

কুদ্দুসের শরীরে হালকা একটা কাঁপুনি লাগল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে যে রকম লাগে, সে রকম। তারপরই মনে হতে লাগলো তার চারপাশে যত বেগুনি রঙ আছে সব তার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আবার চোখের ভেতর থেকে কিছু কিছু রঙ বের হয়ে আসছে। এ কী নতুন মুসিবত হল।

আচমকা রঙের আসা-যাওয়া বন্ধ হল। কুদ্দুস তার চোখের সামনে কী একটা যেন দেখল। মানুষের মতোই মুখ তবে স্বচ্ছ কাচের তৈরি। একটা মুখের ভেতর আরেকটা, সেই মুখের ভেতর আরেকটা—এই রকম চলেই গিয়েছে। মুখটার চোখ দু'টাও কাচের। সেই চোখের যে কোন একটার দিকে তাকালে তার ভেতরে আর একটা চোখ দেখা যায়, সেই চোখের ভেতর আবার আরেকটা...ঘটনা এই শেষ হলে হত, ঘটনা এইখানে শেষ না। কুদ্দুসের কখনো মনে হচ্ছে ভয়ংকর সে এই মানুষটার ভিতরে আছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ভয়ংকর এই মানুষটা তার ভেতরে বসে আছে। এই কুৎসিত জিনিসটাকে মানুষ বলার কোন কারণ নেই, মানুষ ছাড়া কুদ্দুস তাকে আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'জ্বি না, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন—একটু পেসাব করব, পেসাবের বেগ হয়েছে।'

'কী করবে?'

'প্রস্রাব করব। আপনাদের বাথরুমটা কোন্ দিকে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না—কী করতে চাও?'

'স্যার, একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন। তুমি তো আমাদের মহা সমস্যায় ফেললে। আমাদের এখানে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই।'

'বলেন কী স্যার!'

'আমরা দেহধারী প্রাণী নই। দেহধারী প্রাণীদের মতো আমাদের খাদ্যের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি টয়লেটেরও প্রয়োজন নেই। এখন তুমি টয়লেটে যেতে চাচ্ছ, আমাদের ধারণা কিছুক্ষণ পর তুমি বলবে খিদে পেয়েছে।'

'সত্যি কথা বলতে কী স্যার, খিদে পেয়েছে। সকাল বেলা নাশতা করি নাই। মারাত্মক খিদে লেগেছে। চক্ষুলজ্জার জন্যে বলতে পারি নাই। সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়েক চুমুক চা শুধু খেয়েছি, পত্রিকাও পড়া হয় নাই—আপনাদের এখানে পত্রিকা আছে স্যার?'

'না, পত্রিকা নেই।'

'জায়গা তো তাহলে খুব সুবিধার না।'

'আমাদের জায়গা আমাদের মতো, তোমাদের জায়গা তোমাদের মতো।'

'আপনাদের তাহলে 'ইয়ে' হয় না?'

'ইয়ে মানে কী?'

'পেসাব-পায়খানার কথা বলতেছি—বর্জ্য পদার্থ।'

'না, আমাদের এই সমস্যা নেই। তোমাকে তো একবার বলা হয়েছে আমরা তোমাদের মতো দেহধারী না। শুধু দেহধারীদেরই খাদ্য লাগে। খাদ্যের প্রশ্ন যখন আসে তখনই চলে আসে বর্জ্য পদার্থের ব্যাপার।'

'তবু স্যার, আমার মনে হয় বাইরের গেস্টদের জন্য দুই-তিনটা টয়লেট বানিয়ে রাখা ভাল।'

'দেহধারী কোন অতিথির আমাদের এখানে আসার উপায় নেই।'

'আপনি তো স্যার একটা মিসটেক কথা বললেন। আমি চলে এসেছি না?'

'হ্যাঁ, তুমি চলে এসেছ। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কীভাবে এসেছ সেই রহস্য এখনো ভেদ করা সম্ভব হয় নি।'

'স্যার বিশ্বাস করেন, নিজের ইচ্ছায় আসি নাই। যে দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই, পেসাব-পায়খানার উপায় নাই, সেই দেশে খামাখা কি জন্যে আসব বলেন? তাও যদি দেখার কিছু থাকত, একটা কথা ছিল। দেখারও কিছু নাই। স্যার, আপনাদের সমুদ্র আছে?'

'হ্যাঁ আছে। তবে সে সমুদ্র তোমাদের সমুদ্রের মতো না। আমরা সময়ের সমুদ্রে বাস করি। তোমাদের কাছে সময় হচ্ছে নদীর মতো বয়ে যাওয়া। আমাদের সময় নদীর মতো প্রবহমান নয়, সমুদ্রের মতো স্থির।'

'মনে কিছু নেবেন না স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারি নাই।'

'সময় সম্পর্কিত এই ধারণা ত্রি-মাত্রিক জগতের প্রাণীদের পক্ষে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। অংক এবং পদার্থবিদ্যায় তোমার ভাল জ্ঞান থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'এটা বলে স্যার আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি খুবই মূর্খ। অবশ্য স্যার মূর্খ হবার সুবিধাও আছে। মূর্খদের সবাই স্নেহ করে। বুদ্ধিমানদের কেউ স্নেহ

করে না। ভয় পায়। মতিয়ুর রহমান স্যার যে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে তার কারণ একটাই—আমি মূর্খ। বিরাট মূর্খ।'

'ও আচ্ছা।'

'উনার স্ত্রীও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। গত ঈদে আমাকে পায়জামা আর পাঞ্জাবি দিলেন। পাঞ্জাবি সিল্কের। এই রকম সিল্ক সচরাচর পাওয়া যায় না, অতি মিহি—এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সিল্ক। যা তৈরি হয় সবই বিদেশে চলে যায়। উনাদের কানেকশন ভাল বলে এইসব জিনিস যোগাড় করতে পারে। যাই হোক, পাঞ্জাবি সাইজে ছোট হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর উনাকে বলি নাই, মনে কষ্ট পাবেন। শখ করে একটা জিনিস কিনেছেন।'

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে।'

'এই যে স্যার বললাম—মূর্খদের সবাই পছন্দ করে। আপনারা বেশি জ্ঞানী, কেউ আপনাদের পছন্দ করবে না। সত্যি কথা বলতে কী স্যার, আপনাদের ভয়ে আমি অস্থির। আপনাদের দিকে তাকাতেও ভয় লাগতেছে।'

'ভয়ের কিছু নেই আমরা তোমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।'

'আপনাদের পা থাকলে স্যার ভাল হত। আপনাদের পা ছুঁয়ে সালাম করতাম।'

'তোমার প্রতি আমাদের মমতা হয়েছে যে কারণে আমরা এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার নিজের জায়গায় যখন ফিরবে তখন তোমার জীবন আনন্দময় হবে।'

'বললে হয়তো স্যার আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি খুব আনন্দে আছি।'

'আনন্দে থাকলেও তোমার জীবন মোটামুটিভাবে অর্থহীন এটা বলা যায়। জীবন কাটাচ্ছ অন্যের জন্যে চা বানিয়ে।'

'কী করব স্যার বলেন, পড়াশোনা হয় নাই, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে বাবাকে সাপে কাটল। চোখের সামনে ধড়ফড় করতে করতে মৃত্যু।'

'আমরা কী করছি মন দিয়ে শোনো, তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে। তুমি সেখান থেকে জীবন শুরু করবে। বাবাকে যাতে সাপে না কাটে সেই ব্যবস্থা করবে।'

'সেটা স্যার কী করে সম্ভব?'

'সময় আমাদের কাছে স্থির। আমরা তা পারি। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন এখানকার স্মৃতি তোমার থাকবে না। তবে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে এই ব্যাপারটা তোমার মনে থাকবে। এটা যাতে মনে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। নতুন জীবন তোমার শুরু হচ্ছে। সেখানে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে না। তোমার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু উন্নত করে দিচ্ছি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেবে !'

'অংকটা নিয়ে স্যার সমস্যা। অংকটা পারি না। খুব বেড়াছেড়া লাগে।'

'আর বেড়াছেড়া লাগবে না।'

'এখন কি স্যার আমি চলে যাচ্ছি ?'

'কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছ।'

'ম্যাডামকে আমার সালাম দিয়ে দেবেন। উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।'

'ম্যাডামকে তোমার সালাম পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে আগে একবার বলেছি আমরা দেহধারী নই। আমাদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন ব্যাপার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা। না থাকলে কী আর করা ! সবই আল্লাহ্‌র হুকুম। একটু দোয়া রাখবেন স্যার। এই বিপদ থেকে কোনদিন উদ্ধার পাব চিন্তা করি নাই।'

কুদ্দুস হঠাৎ তার বুকে একটা ধাক্কার মতো অনুভব করল। গভীর ঘুমে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হচ্ছে সে যেন অতল কোন সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই সমুদ্রের পানি সিসার মতো ভারি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পানির রঙ গাঢ় গালাপি। সে তলিয়েই যাচ্ছে। তলিয়েই যাচ্ছে। এই সমুদ্রের কি কোন তলা নেই ? না-কি এখন সে মারা যাচ্ছে ?

কুদ্দুসের ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না। অথচ তার ইচ্ছা জেগে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার কী হচ্ছে দেখে।

●

৩

কুদ্দুসের ঘুম ভেঙেছে।

সে তার গ্রামের বাড়িতে চৌকির উপর বই-খাতা মেলে পড়তে বসেছিল। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী সর্বনাশের কথা। কাল ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা। রচনা এখনো দেখা হয় নি। অ্যা জার্নি বাই বোট এই বছর আসার কথা। গত বছর আসে নি। কুদ্দুস রচনা বই নিল। আর তখন মনে হল তাকে একটা সাপ মারতে হবে। সাপটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে। ভয়ংকর বিষধর একটা সাপ। এ রকম মনে হবার কী কারণ কুদ্দুস বুঝতে পারল না। তারপরও সে হ্যারিকেন হাতে নেমে এল। একটা মোটা লাঠি দরকার। লাঠি হাতে এক্ষুণি তাকে তার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হাতে একটুও সময় নেই।

কেউ একজন তাকে বলছে—তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। সেই কেউ একজনটা কে ? কুদ্দুস জানে না। শুধু জানে এক্ষুণি একটা সাপ তার বাবাকে ছোবল দিতে আসবে। তার দায়িত্ব সাপটাকে মারা। যদি মারতে পারে তবেই তার জীবন হবে অন্য রকম।

কুদ্দুস তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ঐ তো সাপটা। শঙ্খচূড় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সম্পর্ক

মোবারক হোসেন ভাত খেতে বসে তরকারির বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কী ? তাঁর গলার স্বরে অদূরবর্তী ঝড়ের আভাস। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবে।

মনোয়ারা অদূরবর্তী ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে ?

'এটা কিসের তরকারি ?'

'কৈ মাছের ঝোল।'

'কৈ মাছের ঝোলে তরকারি কী ?'

'চোখে দেখতে পাচ্ছ না কী দিয়েছি ! ফুলকপি, সিম।'

'তোমাকে কতবার বলেছি—ফুলকপির সঙ্গে সিম দেবে না। ফুলকপির এক স্বাদ, সিমের আলাদা স্বাদ। আমার তো দু'টা জিভ না যে একটায় সিম খাব আর অন্যটায় ফুলকপি ?'

মনোয়ারা হাই তুলতে তুলতে বললেন, যে তরকারি খেতে ইচ্ছা করে সেটা নিয়ে খেলেই হয়। খেতে বসে খামাখা চিৎকার করছ কেন ?'

'এই তরকারি তো আমি মরে গেলেও খাব না।'

'না খেলে না খেয়ো। ডাল আছে ডাল খাও।'

'শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাব ?'

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এটা তো হোটেল না যে চৌদ্দ পদের রান্না আছে।

মোবারক হোসেনের প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে তরকারির বাটি ছুড়ে মেঝেয় ফেলে দিতে। এই কাজটা করতে পারলে রাগটা ভালো দেখানো হয়। এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। মনোয়ারা সহজ পাত্রী না। তার চীনামাটির বাটি ভাঙবে আর সে চুপ করে থাকবে এটা হবার না। মোবারক হোসেন কৈ মাছের ঝোলের বাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কাটা হিসাব করে দিলেন, যেন তরকারি পড়ে যায় আবার বাটিটাও না ভাঙে।

মনোয়ারা বললেন, কী হল ? খাবে না ?

মোবারক হোসেন কিছু না বলে ভাতের থালায় হাত ধুয়ে ফেললেন। থালায় ভাত বাড়া ছিল। কিছু ভাত নষ্ট হল। হাত ধোয়ার দরকার ছিল না। তার হাত পরিষ্কার—খাওয়া শুরুর আগেই গণ্ডগোল বেধে গেল। ●

মনোয়ারা বললেন, ভাত খাবে না ?

মোবারক হোসেন বললেন, না। তোমার ভাতে আমি 'ইয়ে' করে দেই।

বাক্যটা খুব কঠিন হয়ে গেল। রাগের সময় হিসাব করে কথা বলা যায় না। তবে কঠিন বাক্যেও কিছু হল না। মনোয়ারা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তরকারির বাটি, ডালের বাটি তুলে ফেলতে শুরু করলেন। যেন কিছুই হয় নি। মোবারক হোসেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। পরিবারের প্রধান মানুষটা রাগ করে বলছে—ভাত খাবে না, তাকে সাধাসাধি করার একটা ব্যাপার আছে না ? মনোয়ারা কি বলতে পারত না—ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনো সিম আর ফুলকপি একসঙ্গে রাঁধা হবে না। কিংবা বলতে পারত—দু'মিনিট বোসো চট করে একটা ডিম ভেজে দেই। শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজ কচলে মরিচের ভর্তা বানিয়ে দেই। মরিচের ভর্তা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই জিনিসটা বানাতে কতক্ষণ লাগে ? তা-না, ভাত তরকারি তুলে ফেলছে ! ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের এই হল ফসল।

মোবারক হোসেনের তীব্র ইচ্ছা হল বাড়িঘর ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের মতো বের হয়ে পড়েন। এ রকম ইচ্ছা তাঁর প্রায়ই হয়। বাড়ি থেকে বেরও হন। রেলস্টেশনে গিয়ে ঘন্টখানেক বসে থাকেন। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তাঁর রেলস্টেশন পর্যন্ত। মোবারক হোসেন নান্দাইল রোড রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার। রাত ন'টায় একটা আপ ট্রেন ছেড়ে দিয়ে খেতে এসেছিলেন। খেতে এসে এই বিপত্তি—সিম আর ফুলকপির ঘোঁট বানিয়ে বসে আছে।

মোবারক হোসেন মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে শুরু করলেন। এটা হল তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার সংকেত। অতি সহজে তাঁর কানে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে সব সময় মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে হয়। আর এ বছর তুন্দ্রা অঞ্চলের শীত পড়ছে। আগুনের উপর বসে থাকলেও শীত মানে না।

মনোয়ারা বললেন, যাচ্ছ কোথায় ?

তিনি জবাব না দিয়ে গায়ে চাদর জড়ালেন।

'স্টেশনে যাচ্ছ ?'

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। হাতমোজা পরতে লাগলেন। হাতমোজা পরা ঠিক হচ্ছে না। মনোয়ারা মাত্র কিছুদিন আগে হাতমোজা বুনে দিয়েছেন। তার উচিত হাতমোজা জোড়া নর্দমায় ফেলে দেয়া—কিন্তু বাইরে মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীত। খোলা মাঠের উপর রেলস্টেশন। শীত সহ্য হবে না। গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে না থেকে যদি নান্দাইল রোডে থাকতেন এবং মাঘ মাসে গৃহত্যাগ করতেন তা হলে তিনিও হাতমোজা পরতেন। গলায় মাফলার বাঁধতেন।

'রাতে ফিরবে ? না ফিরলে বলে যাও। দরজা লাগিয়ে দেব।'

'যা ইচ্ছা করো।'

'আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে ফিরে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে না।'

'তোর বাপের দরজা ? সরকারি বাড়ির সরকারি দরজা। আমার যখন ইচ্ছা ধাক্কাধাক্কি করব।'

'তুই তোকারি করবে না। আমি তোমার ইয়ার বন্ধু না।'

'চুপ। একদম চুপ। No talk.'

মোবারক হোসেন অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির অর্থ—তুমি জাহান্নামে যাও। তিনি ঘরের কোনায় রাখা ছাতা হাতে বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করার ঝপাং শব্দ হল। মোবারক হোসেন ফিরে এসে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড লাথি বসালেন। এতে তাঁর রাগ সামান্য কমল। তিনি রেলস্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

রাত নিশুতি। ভয়াবহ ঠাণ্ডা পড়েছে। রক্ত-মাংস ভেদ করে শীত হাড়ের মজ্জায় চলে যাচ্ছে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। অথচ শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ আছে। মোবারক হোসেনের পকেটে দুই ব্যাটারির টর্চও আছে। টর্চ জ্বালাতে হলে চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করতে হয়। তিনি তাঁর প্রয়োজন বোধ করছেন না। গত দশ বছর তিনি এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন। চোখ বেঁধে দিলেও চলে আসতে পারবেন।

রেলস্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। পয়েন্টসম্যান হেদায়েত স্টেশনেই ঘুমায়। সে মনে হয় আছে। আজ তার বোনের বাড়িতে যাবার কথা। মনে হয় যায় নি। যে শীত নেমেছে যাবে কোথায় ? মোবারক হোসেন স্টেশনের বাতি দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন। হেদায়েত থাকলে তাকে দিয়ে চিড়া-মুড়ি কিছু আনানো যাবে। খিদেয় তিনি অস্থির হয়েছেন। উপোস অবস্থায় রাত পার করা যাবে না। বিকেলেও কিছু খান নি। বিকেলে নাশতা হিসেবে মুড়ি এবং নারিকেলকোরা দিয়েছিল। এমন গাধা মেয়েছেলে ! নারিকেলকোরা হল ভেজা ন্যাতন্যাতা একটা জিনিস। মুড়িকে সেই জিনিস মিইয়ে দেবে এটা তো দুধের শিশুও জানে। দুই মুঠ মুখে দিয়ে তিনি আর খান নি। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে ন্যাতন্যাতা মুড়িই তিনি এক গামলা খেয়ে ফেলতে পারবেন। তবে শীতের রাতের আসল খাওয়া হল আগুন গরম গরুর গোশত তার সঙ্গে চালের আটার রুটি। এই গরুর গোশত ভুনা হলে চলবে না। প্রচুর ঝোল থাকতে হবে।

মনোয়ারাকে বললে সে ইচ্ছা করে করে ঝোল শুকিয়ে ভুনা করে ফেলবে। চালের আটার রুটি না করে আটার রুটি করবে এবং পরে বলবে...

মোবারক হোসেনের চিন্তার সূত্র হঠাৎ জট পাকিয়ে গেল। কারণ তার চোখে ধক করে সবুজ আলো এসে পড়ল। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। আলোটা এসেছে স্টেশনঘর থেকে। কেউ মনে হয় টর্চ ফেলেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বা এ রকম কিছু। হঠাৎ চোখে পড়েছে বলে সবুজ রং মনে হয়েছে। টর্চের আলো সবুজ হবার কোনো কারণ নেই।

নান্দাইল রোড রেলস্টেশনটা এই অঞ্চলের মতোই দরিদ্র। একটি ঘর। সেই ঘরে জানালা নেই। টিকিট দেয়ার জন্যে যে ফাঁকটা আছে তাকে জানালা বলার কোনো কারণ নেই। মোবারক হোসেন যখন এই ঘরে বসে টিকিট দেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি কবরের ভেতর বসে আছেন। মানকের নেকের তাঁর সওয়াল জওয়াব করবে। সওয়াল জবাবের ফাঁকে ফাঁকে তিনি টিকিট দিচ্ছেন। সব স্টেশনে একটা টিউবওয়েল থাকে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পানি খায়। ফ্লাস্ক ভরতি করে পানি নিয়ে ট্রেনে ওঠে। এই স্টেশনে কোনো টিউবওয়েল নেই। যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বছর তিনেক আগে দুটা প্রকাণ্ড রেইনট্রি গাছ ছিল। গাছ দুটার জন্য স্টেশনটা সুন্দর লাগত। আগের স্টেশনমাস্টার গাছ কাটিয়ে এগার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এতে পরে তার সমস্যা হয়েছিল—তাকে বদলি করে দেয়া হয়, তার জায়গায় আসেন মোবারক হোসেন। তাঁর চাকরি এখন শেষের দিকে। এই সময় কপালে কোনো ভালো স্টেশন জুটল না। জুটল ধ্যাদ্দাড়া নান্দাইল রোড। স্টেশনের লাগোয়া কোনো চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছা হলে কেরামতকে পাঠাতে হয় ধোয়াইল বাজার। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডা পানি। মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিতে হয়। রেলস্টেশনের সঙ্গে চায়ের দোকান থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। এর আগে তিনি যে স্টেশনে ছিলেন সেখানে দু'টা চায়ের দোকান ছিল। হিন্দু টি স্টল, মুসলিম টি স্টল। দু'টা চায়ের দোকানের মালিকই অবিশ্যি মুসলমান।

মোবারক হোসেন স্টেশনঘরের মাথায় এসে দাঁড়ালেন। চারদিক ধু-ধু করছে। জনমানব নেই। স্টেশনঘরের সামনে থেকে তাঁর চোখে যে আলো ফেলেছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন লোকটাকে দু-একটা কঠিন কথা বলবেন—'মানুষের চোখে টর্চ ফেলা অসম্ভব বেয়াদবি। মহারানী ভিক্টোরিয়াও যদি কারো চোখে টর্চ ফেলেন সেটাও বেয়াদবি।'

স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছিল বলে তিনি দূর থেকে দেখেছেন। এটা সত্যি না। স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছে না। হেদায়েত নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি চলে গেছে। মোবারক হোসেন তালা খুলে স্টেশনঘরে ঢুকলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঘরটা বাইরের মতো হিমশীতল না। উত্তুরে বাতাস তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। বাতাসের হাত থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি হারিকেন জ্বালালেন। তাঁর ভয় ছিল হারিকেনে তেল থাকবে না। দেখা গেল তেল আছে। সারা রাত জ্বলার মতোই আছে।

স্টেশনঘরে তাঁর বিছানা আছে। তোশক, লেপ, চাদর, বালিশ। খাওয়া এবং ঘুমানোর ব্যাপারে তার কিছু শৌখিনতা আছে বলে লেপ-তোশক ভালো। বিছানার চাদরটাও ভালো। যদিও মোবারক হোসেনের ধারণা মাঝে মধ্যে হেদায়েত নিজের বিছানা রেখে তার বিছানায় শুয়ে থাকে। কারণ তিনি হঠাৎ হঠাৎ বিছানা চাদরে উৎকট বিড়ির গন্ধ পান। হেদায়েতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে চোখ কপালে তুলে বলেছে—'আমার কি বিছানার অভাব হইছে ?' ব্যাটাকে একদিন হাতেনাতে ধরতে হবে।

মোবারক হোসেন বিছানা করতে শুরু করলেন। শীত যেভাবে পড়ছে অতি দ্রুত লেপের ভেতর ঢুকে যেতে হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম আসবে না—কী আর করা ! নিজের বোকামির উপর তাঁর এখন প্রচণ্ড রাগ লাগছে। রাগ করে ভাত না খাওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। তারচেয়েও অন্যায় হয়েছে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসা। তিনি কেন বাড়ি ছাড়বেন ? এককাপ গরম চা পাওয়া গেলে এই ভয়ঙ্কর রাতটা পার করে দেয়া যেত। মোবারক হোসেন ঠিক করে ফেললেন—এবারের বেতন পেয়েই একটা কেরোসিনের চুলা কিনবেন। একটা সসপেন, চা-পাতা, চিনি। যখন ইচ্ছা হল নিজের চা বানিয়ে খেলেন। মুড়ির টিনে কিছু মুড়ি থাকল। মুড়ির সঙ্গে খেজুর গুড়। শীতের রাতে মুড়ি আর খেজুর গুড় হল বেহেশতি খানা। ডিম থাকলে সসপেনে পানি ফুটিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ করে ফেলা। গরম ভাপ ওঠা ডিমসিদ্ধ লবণের ছিটা দিয়ে খাওয়া...উফ ! মোবারক হোসেনের জিভে পানি এসে গেল।

মোবারক হোসেনের খাদ্যসংক্রান্ত চিন্তার সূত্রটি আবারো জট পাকিয়ে গেল। আবারো তার চোখে সবুজ আলো ঝলসে উঠল। এমন কড়া আলো যে আলো নিভলে চারদিকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারে ডুবে যায়। হারিকেনের আলো সেই অন্ধকার দূর করতে পারে না। চিকাদের কিচমিচ জাতীয় কিছু শব্দ শুনলেন। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ছায়ামূর্তির মতো কিছু একটা

দরজায় দাঁড়িয়ে। সবুজ আলোর ঝলক চোখ থেকে না গেলে ছায়ামূর্তির ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ভূতপ্রেত না তো ? আয়াতুল কুরসিটা পড়া দরকার। সমস্যা হচ্ছে এই সুরাটা তাঁর মুখস্থ নাই। মনোয়ারার আছে। সে কারণে অকারণে আয়াতুল কুরসি পড়ে। কে জানে এখনো হয়তো পড়ছে। খালি বাড়ি মেয়েছেলে একা আছে। ভয় পাবারই কথা। শীতকালে আবার ভূতপ্রেতের আনাগোনা একটু বেশি থাকে।

মোবারক হোসেনের চোখে আলো সয়ে এসেছে। তিনি হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিকার কিচকিচ শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দরজা ধরে একজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিচকিচ শব্দটা সেই করছে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর যাই হোক ভূতপ্রেত না। ভূতপ্রেত হলে টর্চলাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভূতের পায়ে বুটজুতা থাকবে না। মাথায় হ্যাটজাতীয় জিনিসও থাকবে না। চোখে রোদচশমাও থাকবে না। মোবারক হোসেন বিড়বিড় করে বললেন, আপনার পরিচয় ?

বলেই মোবারক হোসেন মেয়েটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর ভয় হতে লাগল মেয়েটি বলে বসবে আমি মানুষ না, অন্য কিছু। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ভূতপ্রেতের হাতে টর্চলাইট থাকতেও পারে। এটা বিচিত্র কিছু না। একবার তিনি একটা গল্পে শুনেছেন, রাতে এক ভূত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাইকেলের চাকা রাস্তায় ছিল না। রাস্তা থেকে আধা ফুটের মতো উপরে ছিল। ভূত যদি সাইকেল চালাতে পারে তা হলে টর্চলাইটও হাতে নিতে পারে। চোখে রোদচমশাও পরতে পারে। চিকার মতো কিচকিচও করতে পারে।

'আমার নাম এলা। আপনি কি আমার কথা এখন বুঝতে পারছেন ?'

মোবারক হোসেন আবারো বিড়বিড় করে বললেন, জ্বি।

'পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি। বাংলা ভাষায় কথা বলছেন বুঝব না কেন ?'

'না, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি না। আমি আসলে কোনো ভাষাতেই কথা বলছি না। আমার চিন্তাগুলো সরাসরি আপনার মাথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষাও আমি বুঝতে পারছি না, তবে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা বুঝতে পারছি।'

মোবারক হোসেন ক্ষীণ স্বরে বললেন, জ্বি আচ্ছা। ধন্যবাদ।

'আপনি এই ক্ষমতাকে দয়া করে কোনো টেলিপ্যাথিক বিদ্যা ভাববেন না। এই ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই কাজটার জন্যে ছোট্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করছি। যন্ত্রটার নাম এল জি ৯০০০।'

মোবারক হোসেন আবারো যন্ত্রের মতো বললেন, জ্বি আচ্ছা, ধন্যবাদ।

'আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'জ্বি না।'

'আয়াতুল কুরসি ব্যাপারটা কী? আপনি মনে মনে সারাক্ষণ আয়াতুল কুরসির কথা ভাবছেন। সে কে?'

'এটা একটা দোয়া। আল্লাহপাকের পাক কালাম। এই দোয়া পাঠ করলে মন থেকে ভয় দূর হয়। জিনভূতের আশ্রয় থেকে আল্লাহপাক মানবজাতিকে রক্ষা করেন।'

'তার মানে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

মোবারক হোসেন শুকনো গলায় বললেন, জ্বি না।

'ভয় না পেলে ভয় কাটানোর দোয়া পড়ছেন কেন?'

মোবারক হোসেন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং বেশ ভালো ভয় পাচ্ছেন। মেয়েটা কথা বলছে, কিন্তু তার ঠোঁট নাড়ছে না। ভয় পাবার জন্যে এইটাই যথেষ্ট। তার উপর এমন রূপবতী মেয়েও তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। পরীস্থানের কোনো পরী না তো? নির্জন রাতে পরীরা মাঝে মাঝে পুরুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পরীস্থানে নিয়ে যায়। নানান কুকর্ম করে পুরুষদের ছিবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এই জাতীয় গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। তবে পরীরা যুবক এবং সুদর্শন অবিবাহিত ছেলেদেরই নিয়ে যায়। তার মতো আধবুড়োকে নেয় না। তাকে ছিবড়া বানাবার কিছু নেই। তিনি ছিবড়া হয়েই আছেন।

'মোবারক হোসেন।'

'জ্বি।'

'আমি আপনাকে আমাদের দেশে নিতে পারব না। ইচ্ছা থাকলেও পারব না। আমার সেই ক্ষমতা নেই। আমি এসেছি ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে, পরীস্থান থেকে নয়। আপনাকে ছিবড়া বানানোরও কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'সিস্টার আপনার কথা শুনে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক য়্যু।'

'আজকের তারিখ কত দয়া করে বলবেন?'

'মাঘ মাসের ১২ তারিখ।'

'ইংরেজিটা বলুন, কোন সন?'

'জানুয়ারি ৩, ১৯৯৭।'

'আমি আসছি ৩০০১ সন থেকে।'

'আসার জন্য ধন্যবাদ। সিস্টার ভিতরে এসে বসুন। দরজা বন্ধ করে দেই। বাইরে অত্যধিক ঠাণ্ডা।'

মেয়েটি ভেতরে এসে দাঁড়াল। মোবারক হোসেন দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হয় নি। দরজা খোলা রাখা দরকার ছিল, যাতে প্রয়োজনে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। মনোয়ারার সঙ্গে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দরজা বন্ধ করার পর এলা টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। মোবারক হোসেন চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এলা বসতে বসতে বলল, মনোয়ারা কে ? আপনি সারাক্ষণ এই নামটি মনে করছেন।

'জ্বি, আমার স্ত্রী।'

এলা বিস্মিত হয়ে বলল, স্ত্রী ? আপনার স্ত্রী আছে ! কী আশ্চর্য !

মোবারক হোসেন তাকিয়ে আছেন। তার স্ত্রী থাকা এমন কী বিস্ময়কর ঘটনা যে মেয়েটা চোখ কপালে তুলল ! রাস্তায় ভিক্ষা করে যে ফকির, তারও একটা ফকিরনী থাকে। তিনি রেলে কাজ করেন। ছোট চাকরি হলেও সরকারি চাকরি। কোয়ার্টার আছে।

'স্ত্রীর উপর কি কোনো কারণে আপনি বিরক্ত হয়ে আছেন ?'

'ইয়েস সিস্টার। তার উপর রাগ করেছি বলেই স্টেশনে এসে একা একা বসে আছি।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এল জি ৯০০০ এই পয়েন্ট নোট করছে। বিজ্ঞান কাউন্সিলে আমরা আপনার কথা বলব। র‍্যানডম স্যাম্পলের আপনি সদস্য হচ্ছেন। আশা করি আপনার বা আপনার স্ত্রীর এই বিষয়ে কোনো আপত্তি হবে না।'

কোনো কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন খুবই বিনীত গলায় বললেন, জ্বি না ম্যাডাম।

'এতক্ষণ সিস্টার বলছিলেন এখন ম্যাডাম বলা শুরু করলেন।'

'সিস্টার ডেকে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সিস্টার ডাকের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ আছে। হাসপাতাল মানেই অসুখবিসুখ। সেই তুলনায় ম্যাডাম ডাকটা ভালো।'

'স্ত্রীর উপর যখন রাগ করেন তখন আপনি স্টেশনে থাকার জন্যে চলে আসেন। আর যখন স্টেশনে আসেন না তখন স্ত্রীর প্রতি থাকে আপনার ভালবাসা ?'

'জ্বি না। রাগ করেও অনেক সময় বাসায় থাকি। গতকাল রাগ করেছিলাম, তারপরেও বাসায় ছিলাম।'

'কী কারণে রাগ করেছেন বলতে কি কোনো বাধা আছে ?'

'জ্বি না ম্যাডাম। বলতে বাধা নেই।'

'তা হলে বলুন।'

'আজ রাগ করেছি—কারণ, আজ সে ফুলকপি আর সিম একসঙ্গে দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রান্না করেছে।'

'এটা কি বড় ধরনের কোনো অন্যায় ?'

'সিম এবং ফুলকপি একসঙ্গে রান্না করা যায়। অনেকে পছন্দ করে। আমি করি না। অনেককে দেখবেন সব তরকারির সঙ্গে ডাল নিচ্ছে। মাছ ভাজা নিয়েছে, তার সঙ্গেও ডাল। মাছ ভাজার এক রকম টেস্ট, ডালের আরেক রকম টেস্ট। দুটাকে কি মেশানো যায় ? তা হলে দুধ দিয়ে আর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে মাখিয়ে খেলেই তো হত ! আমার পয়েন্টটা কি সিস্টার ধরতে পারলেন ?'

'ধরার চেষ্টা করছি। আপনি আমাকে একেক সময় একেকটা ডাকছেন—কখনো সিস্টার, কখনো ম্যাডাম। আপনি সরাসরি আমাকে এলা ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

'রাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গতকাল কী নিয়ে রাগ করেছেন ?'

'চা দিতে বলেছি। চুমুক দিয়ে দেখি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাই যদি খাই তা হলে চা খাবার দরকার কী ? শরবত খেলেই হয় ! শুধু ঠাণ্ডা হলেও কথা ছিল। দেখি এলাচের গন্ধ। চা কি পায়েস নাকি যে এলাচ দিতে হবে ? ম্যাডাম ঠিক বলেছি না ?'

'আমি বলতে পারছি না। কারণ, চা নামক বস্তুটি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।'

'শীতের সময় খুবই উপকারী। নেক্সট টাইম আসেন ইনশাল্লাহ আপনাকে চা খাওয়াব। চা-চিনি-দুধ-সব থাকবে।'

'আর কখনো আসব বলে মনে হচ্ছে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আর যেসব কারণে রাগারাগি হয় সেটা কি বলবেন ? আপনাদের সব রাগারাগির উৎস কি খাদ্যদ্রব্য ?'

'জ্বি না ম্যাডাম। ওর খাসিলত খারাপ। সবকিছুর মধ্যে উল্টা কথা বলবে। আমি যদি দক্ষিণ বলি—আমার বলাটা যদি তার অপছন্দও হয় দক্ষিণ না বলে তার বলা উচিত পূর্ব বা পশ্চিম—তা বলবে না। সে সোজা বলবে উত্তর।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন বিপরীত ?'

'একশ দশ ভাগ বিপরীত।'

'একশ দশ ভাগ বিপরীত মানে কী? একশ ভাগের বেশি তো কিছু হতে পারে না।'

'আপা কথার কথা।'

'আপা বলছেন কেন?'

'আপনাকে বড় বোনের মতো লাগছে এই জন্যে আপা বলেছি। দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থী।'

'দোষ-ত্রুটি না, আপনার কথাবার্তা সামান্য এলোমেলো লাগছে। যাই হোক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই—আপনার এবং আপনার স্ত্রীর সম্পর্ক তা হলে ভালো না।

'আপনিই বলুন ম্যাডাম ভালো হবার কোনো কারণ আছে?'

'আপনারা কি একে অন্যকে কোনো গিফট দেন?'

'একেবারে যে দেই না তা না—ঈদে চান্দে দেই। না দেওয়াই উচিত। তারপরেও দেই এবং তার জন্যে যেসব কথা শুনতে হয়—উফ্!'

'একটা বলুন শুনি।'

'ঘরের কিচ্ছা বাইরে বলা ঠিক না। তারপরেও জানতে চাচ্ছেন যখন বলি—গত রোজার ঈদে আমি নিজে শখ করে একটা শাড়ি কিনে আনলাম। হালকা সবুজের উপর লাল ফুল। বড় ফুল না, ছোট ছোট ফুল। সে শাড়ি দেখে মুখ বাঁকা করে বলল, 'তোমাকে শাড়ি কে কিনতে বলেছে! লাল শাড়ি আমি পরি! আমি লম্বা মানুষ। বহরে ছোট জাকাতের শাড়ি একটা কিনে নিয়ে এসেছ!'

'জাকাতের শাড়ি ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'গরিব-দুঃখীকে দানের জন্যে দেয়া শাড়ি। শাড়ি বলা ঠিক না। বড় সাইজের গামছা।'

'শেষ প্রশ্ন করি—আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার এখন তা হলে কোনো ভালবাসা নেই?'

'ভালবাসা থাকবে কেন বলুন। ভালবাসা থাকলে এই শীতের রাতে আমি স্টেশনে পড়ে থাকি?'

এলা নামের মহিলা হাতের টর্চলাইট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চারদিক সবুজ আলোয় ছয়লাব করে আবার বাতিটা নেভাল। মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি স্টেশনে থাকতে আসায় আমার জন্যে খুব লাভ হয়েছে।

'কী লাভ ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপনার মতামত পেয়েছি। মতামত রেকর্ড করা থাকবে।'

'ম্যাডাম কি এখন চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ চলে যাব।'

'তেমন খাতির-যত্ন করতে পারলাম না, দয়া করে কিছু মনে নেবেন না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

'খাতির-যত্ন যথেষ্টই করেছেন এবং আমি আপনার ভদ্রতায় মুগ্ধ। আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এই সুসংবাদ শোনার অধিকার আপনার আছে।'

'জ্বি ম্যাডাম সুসংবাদটা বলেন। দুঃসংবাদ শুনে শুনে কান ঝালাপালা। একটা সুসংবাদ শুনে দেখি কেমন লাগে।'

'আপনার ভালো লাগবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী, যেখানে থেকে আমি এসেছি সেই পৃথিবীতে পুরুষ সম্প্রদায় নেই। শুধুই নারী।'

মোবারক হোসেনের মুখ হা হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পুরুষ নেই ! শুধুই নারী ! এর মধ্যে সুসংবাদটা কোথায় মোবারক হোসেন ধরতে পারলেন না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শুধুই পুরুষ, নারী নেই এটা শুনলেও একটা কথা ছিল।

এলা বলল, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার শতকরা আশি ভাগ ছিল নারী-পুরুষঘটিত সমস্যা। প্রেমঘটিত সমস্যা। একসঙ্গে জীবনযাপনের সমস্যা। ইতিহাসে এমনও আছে যে শুধু একটি নারীর জন্যে একটি নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে না ?

'জ্বি আছে। ট্রয় নগরী।'

'গ্যালাকটিক ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে সংঘটিত অপরাধের শতকরা ৫৩ ভাগ নারীঘটিত।'

মোবারক হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—খাঁটি কথা বলেছেন। ধর্ষণ, এসিড মারা, নাবালিকা হত্যা—পত্রিকা খুললেই এই জিনিস। আল্লাহপাক দয়া করেছেন, এখানে পত্রিকা আসে না।

এলা বলল, মানুষকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিজ্ঞান কাউন্সিল একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—পৃথিবীতে পুরুষ এবং মহিলা বলে দু'ধরনের মানবসম্প্রদায় থাকবে না। হয় থাকবে শুধু পুরুষ অথবা শুধু মহিলা। যুক্তিসঙ্গত কারণেই শুধু মহিলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কারণ মহিলাদের ভেতরই দু'রকমের ক্রমোজোম 'x' এবং 'y' আছে। বুঝতে পারছেন তো ?

কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন বললেন, জ্বি। আপনার কথাবার্তা পানির মতো পরিষ্কার। দুধের শিশুও বুঝবে।

'বংশবৃদ্ধির জন্যে একসময় পুরুষ এবং রমণীর প্রয়োজন ছিল। এখন সেই প্রয়োজন নেই। মানবসম্প্রদায়ের বংশ বৃদ্ধি এখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে না। ল্যাবরেটরিতে হচ্ছে। শিশুপালনের যন্ত্রণা থেকেও মানবসম্প্রদায়কে মুক্তি দেয়া হয়েছে।'

'ও।'

এলা বলল, বর্তমান পৃথিবী সুন্দরভাবে চলছে। সমস্যাহীন জীবনযাত্রা। তারপরেও বিজ্ঞান কাউন্সিলে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—পুরুষশূন্য পৃথিবীর এই ধারণায় কোনো ত্রুটি আছে কি না। তখনই তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রাচীন পৃথিবীতে স্কাউট পাঠানো হয়। আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। আমাদের পাঠানো তথ্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে—পুরুষশূন্য পৃথিবী আদর্শ পৃথিবী।

মোবারক হোসেন ভয়ে ভয়ে বললেন, আমরা পুরুষরা কি খারাপ ?

'আলাদাভাবে খারাপ না, তবে পুরুষ যখন মহিলার পাশে থাকে তখন খারাপ।'

সবুজ আলো আবারো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আলো নিভে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোবারক হোসেন চোখে কিছু দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পর তিনি দেখলেন—ঘরে আর কেউ নেই। তিনি একা। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হলেন এতক্ষণ যা দেখেছেন সবই চোখের ধান্দা। মন মেজাজ ছিল খারাপ, শীতও পড়েছে ভয়াবহ। সব মিলিয়ে চোখে ধান্দা দেখেছেন। একা একটা স্টেশনে থাকা ঠিক না। আবারো চোখে ধান্দা লাগতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে বের হয়ে এসে আবার ফিরে যাওয়াটাও অত্যন্ত অপমানকর। কিন্তু কী আর করা। মানুষ হয়ে জন্ম নিলে বারবার অপমানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাসায় ফিরে গেলেও খাওয়াদাওয়া করা যাবে না। কিছুটা রাগ তাতে দেখানো হবে।

মোবারক হোসেন বাড়িতে ফিরলেন। মনোয়ারা বলামাত্র হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। মনোয়ারা এর মধ্যেই ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল করেছেন। এবং সেই ঝোল এত সুস্বাদু হয়েছে যা বলার না ! রান্নাবান্নার কোনো ইতিহাসের বই থাকলে কৈ মাছের এই ঝোলের কথা স্বর্ণাক্ষরে সেই বইয়ে লেখা

থাকার কথা। মোবারক হোসেনের খুব ইচ্ছা করছে এই কথাটা স্ত্রীকে বলা। শুনলে বেচারি খুশি হবে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ মনোয়ারার চোখ লাল এবং ফোলা। সে এতক্ষণ কাঁদছিল। মোবারক হোসেন যতবারই রাগ করে বাইরে চলে যান ততবারই মনোয়ারা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেন। এই তথ্যটা মোবারক হোসেনের মনে থাকে না। মোবারক হোসেন নরম গলায় বললেন—বউ ভাত খেয়েছ?

মনোয়ারা ভেজা গলায় বললেন, না।

মোবারক হোসেন ভাত মাখিয়ে নলা করে স্ত্রীর মুখের দিকে এগিয়ে বললেন, দেখি হা করো তো।

মনোয়ারা বললেন, ঢং করবে না তো। তোমার ঢং অসহ্য লাগে।

অসহ্য লাগলেও এ ধরনের ঢং মোবারক হোসেন প্রায়ই করেন। এলা নামের মেয়েটাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয় নি।

মোবারক হোসেন মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, কই খাও! ভাত হাতে কতক্ষণ বসে থাকব!

মনোয়ারা বললেন, বুড়ো বয়সে মুখে ভাত! ছিঃ!

ছিঃ বললেও তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখভরতি লজ্জামাখা হাসি।